মুহাম্মদ ‘আবদুহ: সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক

(Muhammad Abduh: Litterateur and social reformer)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

গবেষক

মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান

রেজি: নং-০৭

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

অধ্যাপক, আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

[মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.)]

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ০৭/২০১৭-২০১৮) কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **"মুহাম্মদ 'আবদুহ: সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক** (Muhammad Abduh: Litterateur and social reformer)" শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি অমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে জমাদানের জন্য অনুমোদন করছি।

(অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"মুহাম্মদ 'আবদুহ: সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক (Muhammad Abduh: Litterateur and social reformer)"** শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। এটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ অথবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন কিংবা প্রকাশ করিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করছি। আমি এ মর্মে আরও অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে কোনো Plagiarism (অন্যের লেখা আমার নিজের বলে চালানো) নেই।

গবেষক

(মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান)
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ০৭/২০১৭-২০১৮
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

অনু.	:	অনুবাদ
ই.ফা.বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ
খ্রি.পূ.	:	খ্রিষ্টপূর্ব
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
তাং.	:	তারিখ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
স.	:	সংখ্যা
সং	:	সংস্করণ
সম্পাঃ	:	সম্পাদনা/সম্পাদিত
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি.	:	হিজরি সন
বাং.	:	বাংলা সন
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু আনহু
র.	:	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
‘আবদুহ্	:	মুহাম্মদ ‘আবদুহ্
আফগানী	:	জামাল উদ্দীন আফগানী
(আ.)	:	আলাইহিস সালাম
p.	:	Page
Vol.	:	Volume
Pub.	:	Publisher
Ed.	:	Edited by
Ibid	:	In the same place
Trs.	:	Translation

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা

('আরবি বর্ণসমূহের বাংলায় প্রতিবর্ণায়ন)

বাংলা ভাষায় 'আরবি শব্দের প্রতিবর্ণায়নে অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বহুল প্রচলিত 'আরবি শব্দসমূহের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ হয়নি। এছাড়া যেসব 'আরবি শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا	(উর্ধ্ব কমা) অ	ز	য	ق	ক/ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ/স	ل	ল
ث	ছ/স	ص	ছ/স	م	ম
ج	জ	ض	দ, দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত, ত্ব	و	ও/ব
خ	খ	ظ	জ/ য	ه	ত/হ
د	দ	ع	(উল্টা কমা)	ء	(উর্ধ্ব কমা) অ
ذ	জ/য	غ	গ	ي	ই/য়
ر	র	ف	ফ	ى	ইয়ে/ য়ে

সারসংক্ষেপ (Abstract)

মুসলিম মনীষার স্বর্ণোজ্জল ইতিহাসে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন মুহাম্মদ 'আবদুহ তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে একজন সাহিত্যিক, ধর্মতাত্ত্বিক পণ্ডিত, মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ মুফতি, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক, 'প্যান-ইসলামী' আদর্শের অন্যতম শিষ্য এবং আধুনিক মিশরের অগ্রদূত। তাঁর শক্তিশালী লেখনী মিশরীয় জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মিশরবাসীকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাছাড়া তাঁর অনবদ্য রচনা ও লৈখিক চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতিকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববন্ধন, ঐক্য ও সংহতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ঔপনিবেশিক মিশরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা মুহাম্মদ 'আবদুহ্ (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.) ইসলামী চিন্তার উন্মেষ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে মৌলিক অবদানের ক্ষেত্রে এক বিরল ব্যক্তিত্ব। এ মহান ব্যক্তি আজীবন সমাজ, ধর্ম, দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিবেদিত ছিলেন। ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়কালে মিশরবাসীকে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং ইসলামের সঠিক পথনির্দেশনায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। যুগ-সমস্যার মোকাবেলায় তিনি গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে একজন মুজতাহিদ ও দেশপ্রেমিকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অনবদ্য রচনা ও বিপ্লবী চিন্তাধারা শুধু মিশরবাসীকেই নয় বরং বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতিকে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববন্ধন, ঐক্য-সংহতি, দেশপ্রেম, দেশাত্ববোধ ও জাতীয়াবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর জাগরণি সাহিত্য মিশরীয় জাতির চিন্তা-চেতনা,অধিকার-স্বাধিকার, মুক্তি আন্দোলন ও আধুনিক জাগরণে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি মিশরবাসীসহ সমগ্র মুসলিম জাতির অগ্রগতি, উন্নতি, সামগ্রিক মুক্তি তথা পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। এজন্য ইতিহাসে তাকে 'আধুনিক মিশরের স্বপ্নদ্রষ্টা'ও বলা হয়। অভিসন্দর্ভে মাতৃভূমির প্রতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর গভীর দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং মমত্ববোধের চিত্র ফুটে উঠে; যা একজন মানুষকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক, যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং সর্বাগ্রে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা অর্জনে বদ্ধপরিকর হতে অনুপ্রাণিত করবে।

আধুনিক মিশরীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে 'আবদুহ এর অবদান অপরিসীম। শুধু মিশর কিংবা মধ্যপ্রাচ্যই নয় তিনি ছিলেন বিশ্বব্যাপী 'ইসলামী আধুনিকতাবাদ' এর পুরোধা এবং 'আধুনিক মিশরের জনক'। ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণকে তিনি তাঁর জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন। পশ্চিমা শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে ইউরোপের সম্পদ ও শক্তির মাপকাঠি মনে করে তিনি মিশরসহ সমগ্র মুসলিম দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এর অধ্যয়ন, অনুশীলন, গবেষণা ও প্রয়োগের জোরালো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 'আবদুহ এর সকল আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক

ইসলামী চিন্তাধারা ও দর্শনের প্রচার-প্রসারে যে জিনিসটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল সেটি হলো তাঁর শক্তিশালী সাহিত্যকর্ম। তাঁর আধুনিক ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদী সাহিত্যকর্ম, শিক্ষা ও সংস্কারমূলক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ইত্যাদি তাঁকে আধুনিক মুসলিম বিশ্বে মুক্তবুদ্ধি, প্রথাবিরোধী ও যুক্তিবাদের একজন মহান প্রবর্তক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ সকল কারণেই এ মহান মনীষীর উপর গবেষণাকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে।

মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও ইসলামী সংস্কার আন্দোলনে মৌলিক অবদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। আধুনিক যুগ-সমস্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি ধর্মীয় সংস্কারকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অনবদ্য রচনা, চিন্তা-দর্শন ও সংস্কার আন্দোলন মুসলিম জাতির চিন্তাধারা, সৃজনশীলতা ও আধুনিক জাগরণে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তিনি ধর্মকে মানুষের নিকট জীবন ঘনিষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং এর মধ্যেই তিনি জীবন-সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেন। সর্বদা তিনি ইসলামের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে তিনি মুসলমানদেরকে উৎসাহ দিতেন; আর এক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তিনি মুসলিম জাতির পার্থিব অগ্রগতি, উন্নতি এবং পরকালীন মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। তিনি শিক্ষা ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনকে সমাজ পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন। মূলত উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভে একজন সাহিত্যিক হিসেবে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অবদান, সমাজ সংস্কারক হিসেবে মুসলমানদের জীবন গঠনে তাঁর সংস্কারধর্মী সময়োপযোগী চিন্তাধারা ইত্যাদি বিবৃত হয়েছে; যা একজন মুসলমানকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক, আদর্শ মানুষ এবং যোগ্য বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করবে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য রাজনৈতিক বিপ্লবকে গ্রহণ না করে; তিনি সাহিত্য চর্চা ও সংস্কার আন্দোলনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন। তাই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে ইসলামী আইন, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে বেশি গুরুত্বারোপ করেন। যাতে করে শিক্ষার আলোয় মুসলিম সমাজে একটি দৃশ্যমান বিপ্লব সাধিত হয়। পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর গভীর জ্ঞান এবং দেশ-বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপ সফরের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর মেধা-মনন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও দর্শনের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে; যা পরবর্তীতে তাকে সংস্কারপন্থী ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর উপর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা করা জ্ঞানপিপাসুদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দাঁড়ায়।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ একজন বিচারক, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সংস্কারক ও খ্যতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইসলামের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান এবং নব যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধানকল্পে তাঁর মতামত ছিল যথাযথ। অনেক জটিল জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁর নিকট ছুটে আসতেন। আর তিনি সে সকল সমস্যার সহজ সমাধান দিতেন। মানুষের কাছে আধুনিক যুগের এ মুসলিম মনীষীকে তুলে ধরাই অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য।

সর্বোপরি আধুনিক 'আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব । তাঁর রচনা ও গবেষণা, চিন্তা ও মননশীল সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাঁর যুক্তিবাদী রচনাবলি, বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনা ও সংস্কারমূলক চিন্তাধারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে তাঁর তাফসির সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও সাংবাদিকতা সাহিত্য 'আরবি ভাষাকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করে এবং মুসলিম জাতির সৃজনশীল চেতনা ও আধুনিক জাগরণে উত্তাল ঢেউ তোলে। এজন্য তাঁকে একজন ধর্মীয় পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক ও 'ইসলামী আধুনিকতার' প্রর্বতক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ ও তাফসির সাহিত্য পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর শক্তিশালী লেখনী, রচনার আধুনিক স্টাইল, ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থাবলি ইত্যাদি 'আরবি সাহিত্যকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। তাই তাঁর সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করাও এ গবেষণার একটি উদ্দেশ্য। সুতরাং আধুনিক যুগের এ মুসলিম পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সম্পর্কে জানা এবং তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মের বিশ্লেষণ আজ সময়ের দাবি। কেননা নতুন প্রজন্মের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তিনি একজন আলোকবর্তিকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা পরম করুণাময় ও সীমাহীন জ্ঞানের আধার মহান রাব্বুল 'আলামীনের জন্য, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। দুরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত, শান্তির শ্বেত পায়রা, রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, ইমামুল মুরসালীন মুহাম্মদ (সা.) এর উপর।

আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উপস্থাপিত গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ এর প্রতি; যিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার অভিসন্দর্ভের আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। অভিসন্দর্ভের বিন্যাস-পুনর্বিন্যাস, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংযোজন-বিয়োজন, নানা বিষয়ে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও তিনি আমার অভিসন্দর্ভটি সমৃদ্ধ করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা ও যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা চিরস্মরণীয়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের সম্মানিত সকল শিক্ষকবৃন্দের প্রতি। বিশেষ করে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ড. মুহা: মিজানুর রহমান, ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রূফ ও ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী সহ অন্যান্য সকল শিক্ষক মহোদয়কে। এছাড়াও উক্ত গবেষণাকর্ম সম্পাদনে আমাকে নিরন্তন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দিকনির্দেশনা দিয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আরবী বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু বকর সিদ্দিক ও অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী। তাছাড়া আমার দু'জন সহপাঠী অত্র বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন এবং আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষক মো: শামসুল করিম আমার গবেষণাকর্মে সর্বদা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সিলেট ও পাবনা ক্যাডেট কলেজের সকল সহকর্মীদের প্রতি আমি চির ঋণী; যাদের আন্তরিক পরামর্শ, সহযোগিতা আমাকে সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ মোতালিব খানকে; যিনি একজন বিদ্যোৎসাহী, সমাজসেবী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। মাতা শ্রদ্ধেয়া রোকেয়া খানম; যার আন্তরিক দু'আ ও অকৃত্রিম ভালবাসা আমার চলার পথে সর্বদা আলোকবর্তিকা হিসেবে দেদীপ্যমান ছিল। তাঁদের দু'আ ও সহযোগিতা ছাড়া এত দূর আসা কখনোই সম্ভব হতোনা। একই সাথে আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা রইল আমার প্রিয়তমা স্ত্রী মোছাঃ আছিয়া পারভীন, প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পাবনা ক্যাডেট কলেজের প্রতি; যিনি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু এবং আমার একজন বড়ো সমর্থক। যিনি আমাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দিয়ে গবেষণায় উদ্দীপ্ত রেখেছেন এবং আমার মনোযোগ নিবেদনে সাহায্য করেছেন। সবশেষে বলতে হয় তাদের কথা; যাদের কৃতজ্ঞতার পরশে আমি সার্বক্ষণিক আবদ্ধ; তারা হলো আমার ক্ষুদে সোনামণি আবরার ইউসুফ খান রাইন, আরশান ইউসুফ খান রাইদ এবং আরহান ইউসুফ খান রাহমি। এ কাজে

আস্থা ও বিশ্বাস রেখে সর্বদা সমর্থন দেয়ার জন্য আমার ভাই-বোনদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের এ সমর্থন সত্যিই আমার জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা।

গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাকে দ্বারস্থ হতে হয়েছে বহু লাইব্রেরি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংস্থার নিকট। এসবের মধ্যে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের প্রফেসর আ ন ম আবদুল মান্নান খান লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, সিলেট ক্যাডেট কলেজ লাইব্রেরি, পাবনা ক্যাডেট কলেজ লাইব্রেরি, মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগরে অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আন্তরিকতায় অভিভূত। আমি তাদের সফল ও কল্যাণময় জীবন কামনা করছি। উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং এ গবেষণা কর্মকে কবুল করে নিন। আমীন।

সূচিপত্র

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
		▣ **প্রত্যয়নপত্র**	III
		▣ **ঘোষণাপত্র**	IV
		▣ **শব্দ সংক্ষেপ**	V
		▣ **প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা**	VI
		▣ **সারসংক্ষেপ (Abstract)**	VII-IX
		▣ **কৃতজ্ঞতা স্বীকার**	X-XI
		▣ **ভূমিকা**	**১-৩**
প্রথম অধ্যায়	:	**মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি**	**৪-৪৮**
১ম পরিচ্ছেদ	:	মুহাম্মদ 'আবদুহ্: মিশরের সমকালীন প্রেক্ষাপট	৫
২য় পরিচ্ছেদ	:	জন্ম, মৃত্যু ও বংশ পরিচয়	২০
৩য় পরিচ্ছেদ	:	'আবদুহ্ এর শোকগাঁথায় হাফিজ ইব্রাহীম	২৫
৪র্থ পরিচ্ছেদ	:	'আবদুহ্ এর শিক্ষা জীবন	৩৫
৫ম পরিচ্ছেদ	:	'আবদুহ্ এর কর্মজীবন	৪২
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	**সাহিত্যিক মুহাম্মদ 'আবদুহ্**	**৪৯-৯৫**
১ম পরিচ্ছেদ	:	মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর রচনাবলি	৫০
২য় পরিচ্ছেদ	:	রিসালাত আত্-তাওহিদ এর বিষয়বস্তু, ভাব ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ	৬০
৩য় পরিচ্ছেদ	:	আধুনিক 'আরবি গদ্য সাহিত্যের গতিধারা নিরূপণে 'আবদুহ্ এর ভূমিকা	৬৩
৪র্থ পরিচ্ছেদ	:	জাগরণি সাহিত্যে 'আবদুহ্ এর অবদান	৭৩
৫ম পরিচ্ছেদ	:	সাংবাদিকতা সাহিত্যে 'আবদুহ্ এর অবদান	৭৭
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	তাফসির সাহিত্যে 'আবদুহ্ এর অবদান	৮৪
তৃতীয় অধ্যায়	:	**মিশরীয় জাতীয়তাবাদ ও মুহাম্মদ 'আবদুহ্**	**৯৬-১২৫**
১ম পরিচ্ছেদ	:	জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায়	৯৭
২য় পরিচ্ছেদ	:	জাতীয়তাবাদের উন্মেষ	১০১
৩য় পরিচ্ছেদ	:	ঔপনিবেশিক মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট	১০৭
৪র্থ পরিচ্ছেদ	:	মিশরে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর ভূমিকা	১১৬

চতুর্থ অধ্যায়	:	**মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সমাজ সংস্কার আন্দোলন**	**১২৬-১৬৮**
১ম পরিচ্ছেদ	:	চিন্তার মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস	১২৭
২য় পরিচ্ছেদ	:	ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন	১৩৯
৩য় পরিচ্ছেদ	:	তাকলিদ সম্পর্কে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর চিন্তাধারা	১৪৪
৪র্থ পরিচ্ছেদ	:	পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে তাকলিদের যৌক্তিকতা	১৪৮
৫ম পরিচ্ছেদ	:	শারী'য়াহ্ 'আদালতের সংস্কার	১৫৫
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	নারী অধিকার আন্দোলন	১৫৯
৭ম পরিচ্ছেদ	:	পবিত্র কোরআন ও হাদিসে হিযাবের যৌক্তিকতা	১৬৪
পঞ্চম অধ্যায়	**:**	**সমাজ সংস্কারে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর শিক্ষা আন্দোলন**	**১৬৯-২০০**
১ম পরিচ্ছেদ	:	মিশরে শিক্ষা সংস্কার ও সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট	১৭০
২য় পরিচ্ছেদ	:	আল-আযহার ও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সংস্কার আন্দোলন	১৭৬
৩য় পরিচ্ছেদ	:	বিজ্ঞান শিক্ষা চর্চায় মুহাম্মদ 'আবদুহ্	১৮৯
		▣ **উপসংহার**	**২০১-২০৪**
		▣ **গ্রন্থপঞ্জি**	**২০৫-২১৭**

ভূমিকা

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.) আধুনিক যুগে মুসলিম জাগরণের একজন অন্যতম পথিকৃৎ, ধর্মপ্রচারক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বাগ্মী, শিক্ষাব্রতী, আইনজ্ঞ, বিশ্বব্যাপী মুসলিম ঐক্যকেন্দ্রিক (Pan-Islamism) আন্দোলনের অন্যতম অনুসারী, ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কারক। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন 'আরবি পত্রিকায় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শক্তিশালী লেখনী মিশরীয় জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে মিশরবাসীকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাছাড়া তাঁর অনবদ্য রচনা ও লৈখিক চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতিকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও এক কেন্দ্রিক ঐক্য ও সংহতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশেষ করে তাঁর তাফসির সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও সাংবাদিকতা সাহিত্য 'আরবি ভাষাকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছে এবং মুসলিম জাতির মেধা-মনন, চিন্তা-চেতনা, সৃজনশীলতা ও আধুনিক জাগরণে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। এজন্য তাঁকে একজন ধর্মীয় পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক ও 'ইসলামী আধুনিকতার' প্রবর্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে এ মহান পণ্ডিত ও সাহিত্যিক 'আরবি সাহিত্যের আকাশে এক উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় এখনো আলো ছড়াচ্ছেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে মিশরের ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য প্যান-ইসলামিজমের প্রবক্তা জামালুদ্দীন আফগানীর (১৮৩৮-১৮৯৭) পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর গতিশীল ব্যক্তিত্ব ও উৎসাহ প্রদান 'আবদুহ্কে ইসলামের অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। যদিও তাঁর মূল লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে আফগানীর রাজনৈতিক বিপ্লবকে গ্রহণ না করে তিনি শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনকে গ্রহণ করেন। তাই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে ইসলামী আইন ও শিক্ষা সংস্কারে বেশি গুরুত্বারোপ করেন। যাতে করে শিক্ষার আলোয় মুসলিম সমাজে একটি দৃশ্যমান বিপ্লব সাধিত হয়। পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর গভীর জ্ঞান এবং দেশ-বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপ সফরের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর মেধা-মনন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও দর্শনের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে; যা পরবর্তীতে তাকে একজন সংস্কারপন্থী ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করে।

বিখ্যাত আলিম, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাবিদ এবং মিশরের ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা মুহাম্মদ 'আবদুহ্ (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.) ইসলামী চিন্তার উন্মেষ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে মৌলিক অবদানের ক্ষেত্রে এক বিরল ব্যক্তিত্ব। এ মহান ব্যক্তি

আজীবন সমাজ, ধর্ম, দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিবেদিত ছিলেন। তিনি ইসলামের আধুনিক ও বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তার উন্মেষ, মুক্তবুদ্ধি চর্চা এবং একজন যুগশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সংস্কারক হিসেবে মুসলিম বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুদয়কালে মিশরবাসীকে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং ইসলামের সঠিক পথ নির্দেশনায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। যুগ-সমস্যার মোকাবেলায় তিনি গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে একজন মুজতাহিদ ও দেশ প্রেমিকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অনবদ্য রচনা ও বিপ্লবী চিন্তাধারা শুধু মিশরবাসীকেই নয় বরং বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতিকে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববন্ধন, ঐক্য-সংহতি, দেশপ্রেম, দেশাত্ববোধ ও জাতীয়াবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর জাগরণি সাহিত্য মিশরীয় জাতির চিন্তা-চেতনা,অধিকার-স্বাধিকার, মুক্তি আন্দোলন ও আধুনিক জাগরণে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি মিশরবাসীসহ সমগ্র মুসলিম জাতির অগ্রগতি, উন্নতি, সামগ্রিক মুক্তি তথা পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। এজন্য ইতিহাসে তাঁকে আধুনিক মিশরের স্বপ্নদ্রষ্টাও বলা হয়। অভিসন্দর্ভে মাতৃভূমির প্রতি 'আবদুহ্ এর গভীর দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং মমত্ববোধের চিত্র ফুটে উঠে; যা একজন মানুষকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং সর্বাগ্রে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা অর্জনে বদ্ধপরিকর হতে অনুপ্রাণিত করবে।

মুক্তবুদ্ধি চর্চা এবং ইসলামী সংস্কার আন্দোলনে মৌলিক অবদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। আধুনিক যুগ-সমস্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি ধর্মীয় সংস্কারকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অনবদ্য রচনা, চিন্তা-দর্শন ও সংস্কার আন্দোলন মুসলিম জাতির মেধা-মনন, সৃজনশীলতা ও আধুনিক জাগরণে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তিনি ধর্মকে মানুষের নিকট জীবন ঘনিষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যেই তিনি জীবন-সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সর্বদা তিনি ইসলামের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। মুসলমানদের ওপর পশ্চিমা বিশ্বের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব কোনোটিই তিনি পছন্দ করতেন না। বরঞ্চ তিনি মৌলিক ইসলামী নীতিমালা ও ঈমান-আক্বিদা ঠিক রেখে পশ্চিমাদের ভাল দিকগুলো যেমন: পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে মুসলমানদেরকে উৎসাহ দিতেন; আর এক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তিনি মুসলিম জাতির পার্থিব অগ্রগতি, উন্নতি এবং পরকালীন মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। তিনি শিক্ষা ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনকে সমাজ পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন। এ জন্যই ইসলামের

ইতিহাসে তাকে 'ইসলামী আধুনিকতার প্রবর্তক' বলা হয়। মূলত আলোচ্য অভিসন্দর্ভে সাহিত্যিক হিসেবে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অবদান এবং সমাজ সংস্কারক হিসেবে মুসলমানদের জীবন গঠনে তাঁর সংস্কারধর্মী সময়োপযোগী চিন্তাধারা বিবৃত হয়েছে; যা একজন মুসলমানকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও আদর্শ বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করবে।

"মুহাম্মদ 'আবদুহ: সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিতে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সাহিত্য ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত অভিসন্দর্ভটি ৫ (পাঁচ)টি অধ্যায় ও ২৫ (পঁচিশ)টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: এ অধ্যায়ে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সমকালীন প্রেক্ষাপট, সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা, জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষা জীবন ও বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে সাহিত্যিক হিসেবে মুহাম্মদ আবদুহ্-এর অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে মুহাম্মদ আবদুহ্ এর রচনাবলি, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিসালাত-আল-তাওহিদ' এর বিষয়বস্তু, ভাব ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ, আধুনিক গদ্য সাহিত্যের গতিধারা নিরূপণে 'আবদুহ্ এর ভূমিকা, জাগরণি, সাংবাদিকতা ও তাফসির সাহিত্যে তাঁর অবদান বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: মিশরীয় জাতীয়তাবাদ ও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ শীর্ষক অধ্যায়ে জাতীয়বাদের পরিচয় ও উন্মেষ, ঔপনিবেশিক মিশরে জাতীয়বাদী আন্দোলন, জাতীয়বাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে মুহাম্মদ আবদুহ্ এর ভূমিকা এবং প্যান-ইসলামীজম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: এ অধ্যায়ে মুহাম্মদ আবদুহ্ এর সমাজ সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতে চিন্তার মুক্তি আন্দোলন ও ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন, তাকলিদ সম্পর্কে আবদুহ্ এর চিন্তাধারা, শারী'য়াহ্ 'আদালতের সংস্কারে ও নারী অধিকার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়াবলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: এ অধ্যায়ে সমাজ সংস্কারে মুহাম্মদ আবদুহ্ এর শিক্ষা আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করছে। এতে মিশরের শিক্ষা সংস্কার ও সামাজিক উন্নয়ন, মুহাম্মদ আবদুহ্ এর শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন, বিজ্ঞান চর্চায় তাঁর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়াবলি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ এর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি

১ম পরিচ্ছেদ

মুহাম্মদ ‘আবদুহ্: মিশরের সমকালীন প্রেক্ষাপট

২য় পরিচ্ছেদ

জন্ম, মৃত্যু ও বংশ পরিচয়

৩য় পরিচ্ছেদ

‘আবদুহ্ এর শোকগাঁথায় হাফিজ ইব্রাহীম

৪র্থ পরিচ্ছেদ

‘আবদুহ্ এর শিক্ষা জীবন

৫ম পরিচ্ছেদ

‘আবদুহ্ এর কর্মজীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ
মুহাম্মদ 'আবদুহ্ : মিশরের সমকালীন প্রেক্ষাপট

'আরব দেশগুলো সর্বদাই পশ্চিমা দেশগুলোর সংস্পর্শে ছিল। ইউরোপীয় ও পশ্চিমা শক্তির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক একটি নতুন মাত্রা উনিশ শতকে পূর্ণ উদ্যমে গতি পেয়েছিল; যা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। এ সময় মিশর[১] ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশ্ব অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে পরিচিতি লাভ করে। তাছাড়া সরকারি বিদ্যালয়ের মৌলিক স্তরগুলোতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বহির্বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি চলমান থাকে। 'আবদুহ্ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য আসন্ন ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হিসেবে দেখেছিলেন। মুসলমানরা, শিক্ষা-দীক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ বিদ্যমান বৈশ্বিক উৎপাদন ও উপযোগিতার প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাদের থেকে অনেকাংশেই পিছিয়ে পড়েছিল। কেননা মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা এবং প্রচলিত ধর্মীয় প্রায়োগিক দিকগুলো এ পরিস্থিতির জন্য অনেকটাই দায়ী ছিল।

ব্রিটিশদের উপস্থিতি সমসাময়িক মিশরকে আদর্শগত এবং কালানুক্রমিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের দিকে ধাবিত করেছিল। ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও প্রভাব মিশরীয় সভ্যতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং সেখানে তা নির্বিঘ্নে গৃহীত ও প্রচারিত হয়েছিল। ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে মিশর অটোম্যান সাম্রাজ্যের সামন্তযুগীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে একটি পরাধীন রাষ্ট্র ছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের[২] অধীনে ফরাসিরা ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশর দখল করে।

---

১ মিশর: আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত একটি দেশের নাম। এর পশ্চিমে লিবিয়া, দক্ষিণে সুদান, পূর্বে লোহিত সাগর এবং উত্তরে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। মিশর দেশটি প্রায় তিন হাজার বছর ধরে তাহযিব-তমুদ্দন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির সূতিকাগার ছিল। মিশরের প্রাচীন যুগকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। (ক) প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং (খ) ঐতিহাসিক যুগ। ঐতিহাসিক যুগকে রাজবংশীয় যুগ (Dynastic Period) নামে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন সময়ে ত্রিশটি রাজ বংশ মিশরে রাজত্ব করেছে। তায়্যিবিয় রাজবংশের শাসনকর্তা প্রথম মুন্‌ফতা এর রাজত্বকালে হযরত মুসা (আ.) নুবুওয়াত লাভ করেন এবং বনু ইসরাঈলকে মিশর হতে ফিলিস্তিনে নিয়ে আসেন। রাজবংশীয় যুগের চতুর্থ ও পঞ্চম সম্রাটের রাজত্বকালে মিশরে পিরামিডসমূহ. বিশাল মন্দির ও বিরাটাকৃতির প্রস্তর মূর্তি নির্মিত হয়। খ্রি. পূ. ৩৪৩ সালে ত্রিশতম রাজবংশের রাজত্বকালের অবসান ঘটে।'ইখামেনশীয় (Achaemenes) রাজবংশের শাসনামলে ইরানিগণ মিশর অধিকার করে মন্দির ও উপাসনালয়সমূহকে বিধ্বস্ত করে দেয় এবং এর অধিবাসীদের উপর চরম নির্যাতন চালায়। এ কারণেই খ্রি.পূ. ৩৩২ সালে সম্রাট আলেকজান্ডার গ্রিক সৈন্য সমভিব্যাহারে মিশর আক্রমণ করেন। মিশরবাসীরা তাঁকে সহজে মেনে নেয়। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। [সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.), ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২০১-২০২।]

২ দিগ্বীজয়ী সেনানায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১১৮৩-১২৩৭ হি./১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) 'করসিকার' এ্যাজ্যাকসিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ফ্রান্সে লেখা-পড়া শেষ করে সেনাবাহিনীর অফিসার পদে ১২০০ হি./১৭৮৫ খ্রি. সালে

পরবর্তীকালে ফ্রান্স ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে আলজেরিয়া আক্রমণ করে এবং ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসিয়া দখল করে নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা মিশরে অভিযান চালায়। তারও অনেক পূর্বে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমকালীন এ প্রেক্ষাপট মুসলমানদেরকে কমপক্ষে তিনটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছিল; যা মুসলমানদেরকে তাদের চিরায়ত ঐতিহ্যের পুনর্বিবেচনা করতে এবং এর উপায় অন্বেষণে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রথম চ্যালেঞ্জটি এসেছিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং উন্নত প্রযুক্তির বিষয়ে; দ্বিতীয়টি ছিল যৌক্তিকতা ও যুক্তিবাদ এবং তৃতীয়টি ছিল রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ।[৩]

এ বিষয়গুলি তৎকালীন মুসলমানদের নিকট এক আকস্মিক ও অজানা বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জামাল উদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৭ খ্রি.) এবং মুহাম্মদ 'আবদুহ্ (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.) ইসলামের প্রতি মুসলমানদের পশ্চাদপদতা নয়; বরঞ্চ ইসলামের প্রতি মুসলমানদের ভুল বোঝাবুঝি ও প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি জানিয়েছিলেন।[৪] তাঁরা উভয়েই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, ইসলামকে যদি সঠিকভাবে বোঝা যায় এবং সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়; যেমনটি ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে ঘটেছিল, তাহলে মুসলমানরা এতো সহজে পরাজিত হতোনা এবং ইউরোপীয় শক্তি তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারতোনা।[৫]

আধুনিক যুগের মুখোমুখি হওয়া এ সময়টিতে এসে মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের বিবিধ মৌলিক প্রশ্নের উদ্রেক হতো যেমন: আধুনিকতার সাথে ইসলামের সামঞ্জস্যতা কতটুকু? একজন বিশ্বাসী

যোগদান করেন। তাঁকে ১২০৮ হি./১৭৯৩ খ্রি. সালে বিগ্রেডিয়ার পদে উন্নীত করা হয়। তিনি ১২১০ হি./১৭৯৫ খ্রি. সালে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন এবং ইতালির বিভিন্ন সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ফরাসি বিপ্লবে ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক গগনে নেপোলিয়নের বিরাট ভূমিকা ছিল। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো (১২১৩-১২১৪ হি./১৭৯৮-১৭৯৯ খ্রি.) সালে মিশর জয়। তাঁর মিশর বিজয়রে ফলে মিশরের জাতীয় জীবেন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হয়। তাঁর হস্তে মামূলক শক্তির বিলুপ্তি হয়। তাঁর আগমনে নব চেতনার উন্মেষ, জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, রাজনীতি ও সমারকি ক্ষেত্রে পরিবতর্ন, জনহিতকর কার্যাবলির সূচনা ও জনমনে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তাঁর প্রচষ্টায় কৃষি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন, মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। (দ্র. William Benton, *The New Encyclopaedia Britannica,* Volume vii, (1974),c,. 189; David Thomson. *Book Since Napoleon,* (England: penguin Group. 1990) c,. P.55, 86-87)

৩ Nasr Abu Zayd, *Reformation of Islamic thought,* Amsterdam University press, Amsterdam: 2006, p.22

৪ Keddie. N. (1983) *An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani* (Berkeley: University of California Press, Matthee. R. (1989) *'Jamal al-Din al-Afghani and the Egyptian National Debate'* in: International Journal of Middle East Studies, vol. 21, p. 151-169; Kedourie, E. (1966) *Afghani and Abduh. An Essay on Religious Unbelief and Political Activism Modern Islam,* London: Cass.

৫ Nasr Abu Zayd, Ibid, p. 23

মুসলিম একজন মুসলিম হিসেবে কীভাবে তাঁর পরিচয় না হারিয়ে আধুনিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারবে? ইসলাম কি বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে আদৌ সমন্বয় সাধন করে? কিংবা সমন্বয় বিধান করতে সক্ষম? এ সকল প্রশ্ন ছাড়াও আরও একটি জিজ্ঞাসা তৎকালীন মুসলমানদের মনে দাঁনা বেধেছিল। আল্লাহ্‌র আইন বা শারী'য়াহ্ আইন বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় গতানুগতিক সমাজ গঠনের সামঞ্জস্যতার প্রশ্নে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনে কোনো ইতিবাচক ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে কি না? একইভাবে ঔপনিবেশিক দখলের অধীনে বেশির ভাগ মুসলিম দেশগুলিতে রাজনৈতিক ইসলামের বিষয়টি বারংবার উত্থাপিত হয়েছিল।

উনিশ শতকে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ যখন মিশরে বসবাস করছিলেন তখন গোটা মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ করে মিশরের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল চরম সংকটাপন্ন। এই সময়ে 'উলামাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অনেকটাই বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছিল। আর এ বিতর্ক ক্রমে ক্রমেই সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং অমুসলিমদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলিতে ইউরোপের প্রভাব যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ততই এতদঅঞ্চলে মুসলিম শাসক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছিল। অটোম্যান সাম্রাজ্যের 'তানজিমাত সংস্কার'[৬] (১৮৩৯-১৮৭৬) এর মধ্য দিয়ে মূলত এই অঞ্চলে আধুনিকীকরণের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সরকারি ও আইনী এ সংস্কারগুলো ইউরোপীয় ধারণা ও মূল্যবোধ গ্রহণের সাথে সাথে সাম্রাজ্যের আধুনিকায়নও শুরু করে। সাম্রাজ্যে অটোম্যান সরকারি অফিসিয়ালরা ইউরোপীয় নীতিমালার ভিত্তিতে অনুরূপ পদ্ধতি চালু করেছিলেন; যার মধ্যে রয়েছে সার্বভৌমত্ব, সংবিধানবাদ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা।[৭]

তৎকালীন শাসকগণ কর্তৃক মিশরকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা এবং উদীয়মান নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণির আবির্ভাবের ফলে মিশরের অনেক গোঁড়াপন্থী 'উলামাদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া

---

৬ **তানজিমাত:** ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান প্রথম আবদুল মজিদ তুরস্কে যে সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন মূলত তাকেই তানজিমাত (Tanzimat) বলা হয়। তানজিমাত অর্থ সংস্কার, পুনর্গঠন, নীতিমালা ইত্যাদি। মধ্যযুগীয় আর্থ-সমাজিক ব্যবস্থা থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে তানজিমাত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বার্নাড লুইস বলেন, রশীদ পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে মহান সংস্কারের নীতিমালা প্রবর্তিত হয় তাকেই তানজিমাত বলা হয়। [অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব*, (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, আগস্ট ২০১০ খ্রি.), তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭১।]

৭ Voll, John Obert, *Islam: Continuity and Change the Modern World* (Boulder, Co: West View Press, 1982), P. 319

দেখা দেয়। তাঁরা শিক্ষা ও আইনের আধুনিকায়ন প্রচেষ্টাকে তাঁদের চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের চিহ্ন হিসেবে দেখছিল এবং তাঁরা মনে করছিল যে, এ আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিবে। 'উলামাদের ঐতিহ্যগত দায়িত্বের মধ্যে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, বিচারক, লিপিকার এবং সরকারি কর্মকর্তা সংস্থান করা।[৮] এই সময়ে কোনো কোনো রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং 'উলামারা মাদরাসা কিংবা ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলোতে আধুনিকায়নের এ পরিবর্তনকে প্রতিহত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাছাড়া উনিশ শতকের এ সময়টাতে মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের ক্রমবর্ধমান স্বৈরতান্ত্রিকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং চলমান বিদেশি প্রভাব ও নির্ভরতার মাত্রা জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই সময়ে রাজনৈতিক মুক্তি কিংবা উদারীকরণকে বিদেশি প্রভাব এবং দেশীয় স্বৈরাচারী শাসক উভয় থেকেই স্বাধীনতা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সহ নতুন উদীয়মান বুদ্ধিজীবীরা তৎকালীন মিশরের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নাগরিক মর্যাদায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই 'আবদুহ্ ইসলামের আধুনিক ও কল্যাণকর বিষয়গুলো ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সচেতনভাবে ইউরোপীয় ধারণাসমূহকে ইসলামী চিরায়ত ঐতিহ্যের সাথে সমন্বয় করতে আগ্রহী ছিলেন। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের স্থবিরতা ও নিধনকে তিনি 'উলামাদের নিকট অভিযোগ হিসেবে উপস্থাপন করেন। একইভাবে তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত বৌদ্ধিক পদ্ধতি এবং পুরাতন রূপগুলোতে তাঁদের অনমনীয় অবস্থান ও কঠোর আসক্তিকে অভিযুক্ত করেন।

'আবদুহ্‌র দৃষ্টিতে 'উলামারা আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অক্ষম ছিলেন। 'আবদুহ্ 'উলামায়ে কেরামের এ অবস্থার ঘনিষ্ঠ স্বাক্ষী ছিলেন এবং তান্তা ও কায়রোতে ছাত্র অবস্থায় তিনি তাঁদের কর্মসূচি ও উদ্যোগে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। 'আবদুহ্ এর লক্ষ্য ছিল, একটি নতুন ধরনের ধর্মীয় বৃত্তি তৈরি করা; যার ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসটি প্রাচীন এবং আধুনিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।[৯] 'আবদুহ্ আধুনিক যুগের মুসলিম সম্প্রদায় ও ইসলামের জন্য আসন্ন সম্ভাব্য

---

৮ Scharbrodt, *Islam and the Baha' i Faith : A comparative study of Muhammad 'Abduh and Abdul-Baha' Abbas* (London: Routledge, 2008), P. 3

৯ Haddad, Yvonne Y. Pioneers of Islamic Revival. Edited by 'Ali Rahnema, *Muhammad 'Abduh: pioneer of Islamic Reform* (London : Zed, 1994), p. 49

চ্যালেঞ্জ, বিদ্যমান আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক হুমকি সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, চলমান উপনিবেশবাদ[১০], ভবিষ্যত সাম্রাজ্যবাদ[১১] এবং বাহিরের প্রভাবগুলোর সাথে মোকাবেলা করেই মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে হবে এবং তাঁদের ন্যায্য অধিকারের সুরক্ষা করতে হবে। কেননা হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর সময় থেকেই মুসলমানরা বিশ্ব সভ্যতায় নিজেদেরকে এভাবেই টিকিয়ে রেখেছিল। এমনকি বিশ্বসভ্যতায় অগ্রণী ভূমিকা রাখার কারণে পশ্চিমাদের নিকটেও তাঁরা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। 'আবদুহ্ মনে করতেন যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানরা যদিও একটা দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত

---

১০ **উপনিবেশবাদ:** উপনিবেশবাদ বা Colonialism বলতে একটি দেশ কর্তৃক অন্য একটি দেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নেয়াকে বোঝায়। সাধারণত উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে ঔপনিবেশিক অঞ্চলে অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই মূল উদ্দেশ্য থাকে। উপনিবেশবাদের মাধ্যমে শক্তিশালী দেশ অন্য দেশের ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং সে দেশের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। প্রাচীনকাল থেকে বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত শক্তিশালী দেশগুলো ঔপনিবেশিক শাসন-শোষনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। উপনিবেশ এমন একটি অঞ্চল, যে অঞ্চল এবং তার জনগণ অন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসনাধীন এবং শোষণাধীনও বটে; অথচ সেই রাষ্ট্রের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। উপনিবেশে অনেক সময় স্বায়ত্তশাসন বা গণপ্রতিনিধিত্বশীল পার্লামেন্ট-মন্ত্রিসভা ইত্যাদিও থাকতে পারে। কিন্তু উপনিবেশবাদী শক্তি উপনিবেশের পার্লামেন্ট বা সরকারের যে কোনো সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে উপনিবেশের কোনো স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব থাকে না। উপনিবেশের উৎপত্তির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক জলপথসমূহ আবিষ্কারের পর তৎকালীন উন্নত দেশসমূহের ব্যবসায়ীরাই স্ব-স্ব রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বস্তুত ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকেই উপনিবেশসমূহের উদ্ভব। পরবর্তীকালে ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট উপনিবেশের শাসনভার গ্রহণ করে। ইউরেপীয় ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড প্রমুখ রাষ্ট্র এবং এশিয়ার জাপান এশিয়া, অফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় স্ব-স্ব উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। (দ্র. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. পৃ. ৯৬)

১১ **সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism):** মার্কসীয় মতে, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ, একচেটিয়া ও সর্বশেষ স্তর। এর উদ্ভব ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' শীর্ষক গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন: ১. উৎপাদন ও পুঁজির পুঞ্জীভবন এমন এক স্তরে পৌঁছেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে একচেটিয়া বা মনোপলির এবং এ মনোপলিগুলোই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করছে। ২. ব্যাংক পুঁজি ও শিল্পপুঁজির সম্মিলনের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে ধনকুবেরদের লগ্নিপুঁজি এবং তারা বিশ্বটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ৩. পুঁজি রফতানি। ৪. পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংঘ। ৫. মুষ্টিময়ে বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তির মধ্যে পৃথিবীটার আঞ্চলিক বণ্টন সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বস্তুত অর্থনৈতিকভাবে পৃথিবীটা এদের মধ্যে অনেকটা ভাগ হয়ে গেলেও পরস্পরের বাজার দখলে জন্য এদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বও বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে পুঁজিবাদী একচেটিয়াসমূহের শক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি সম্মিলিতভাবে ব্যাপকতর ভিত্তিতে অনুন্নত বিশ্বের উপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং একচেটিয়াসমূহ দিনে দিনে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরেও বাড়ছে অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব ইত্যাদি সমস্যা। এর সমাধান করতে গিয়ে তারা ক্রমবর্ধমান হারে জড়িয়ে পড়ছে ঠান্ডা লড়াইয়ে, সমরবাদে, আশ্রয় নিচ্ছে বিভিন্ন অপকৌশল ও সংস্কারমূলক ব্যবস্থার। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও স্বার্থের পটভূমিতেই গড়ে উঠছে আঞ্চলিক উত্তেজনা, স্থানীয় যুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রায় অনুপস্থিতিতে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা আসলে তাদের পরস্পরেরই বিরুদ্ধে। কিন্তু তাই বলে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে পড়ে বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ কায়েম হওয়ার লক্ষণ এ যাবৎ আদৌ প্রকট হয়ে উঠেনি। (দ্র. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৬)

করছে; তার মানে এই নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা আবারও সমৃদ্ধ ইতিহাস গড়তে অক্ষম। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলাম যৌক্তিকতাকে উৎসাহিত করে এবং মানবিক বুদ্ধির যৌক্তিকতাকে সমর্থন করে।

'আবদুহ্ এর দৃষ্টিতে সমকালীন প্রেক্ষাপটে মুসলমানরা যেহেতু একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছিল, তাই এর সমাধানকল্পে তিনি ইসলামী রীতিনীতির সাথে বিজ্ঞান ও আধুনিক মূল্যবোধের একীকরণ চেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর এ সময়টাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা ছিল ক্রমশ বিকাশমান। অনুরূপভাবে জ্ঞানও যুক্তিবিজ্ঞানের প্রায় সমকক্ষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল; ফলে এর সুনাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য যে কোনো শাখার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলনা। তাই সমকালীন এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 'আবদুহ্ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানের সাথে ধর্ম বেমানান হওয়ার যে অতি সাধারণ অমূলক ধারণা, সেই অসত্য ধারণাটিকে খণ্ডন করা। তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও উদারতা প্রদর্শনে কার্যকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং এমন ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, বিজ্ঞানের সাথে বিরোধপূর্ণ হতে পারে অন্য এমন যে কোনো ধর্মের তুলনায় ইসলাম কখনও উন্নয়ন ও প্রগতির ধারণা এবং উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আবদুহ্ উল্লেখ করেছেন যে, ইউরোপের সংস্কার কেবল একটি আংশিক সাফল্য ছিল। আর এই আংশিক সাফল্য শুধু বিজ্ঞানেরই পক্ষে ছিল, কেননা এটি বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে বিভাজনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'আবদুহ্ এ ধরনের বিভাজনের বিরুদ্ধে ছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মীয় বিজ্ঞান যখন প্রসন্ন হবে তখন পার্থিব বিজ্ঞানগুলোও তাদের অবিচ্ছেদ্য স্বভাব বা প্রকৃতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই উন্নতি লাভ করবে।[১২] 'আবদুহ্ আরও যোগ করে বলেন যে, বিশেষত ফরাসি বিপ্লবোত্তর সময়টাতে বিজ্ঞানকে সামাজিক শৃঙ্খলার সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখার পরিণতি এমন এক দর্শন তৈরি করেছিল; যা সুচিন্তিতভাবেই ধর্মীয় চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল।[১৩] 'আবদুহ্ এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁর যুক্তিকে আরও চূড়ান্ত ও সুসংহত করেন। আর তিনি মনে করেন, ইসলাম হলো এমন একধর্ম যা পার্থিব বিজ্ঞান ও ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ও গভীরভাবে পুনর্মিলিত করে।[১৪]

---

১২ Elshakry, Marwa, *Reading Darwin in Arabic, 1860-1950* (The University of Chicago press, Chicago: USA, 2013), p. 170-171

১৩ মুহাম্মদ 'আবদুহ্, *আল-ইসলাম ওয়া-আল-নাসরানিয়্যাহ্ মা'আল 'ইলম ওয়া আল-মাদানিয়্যাহ্* (বৈরূত: ১৯৮৩ খ্রি.), ২য় সং., পৃ ১৬০-১৬১।

১৪ *প্রাগুক্ত*।

উনিশ শতকে ইসলামের ঐক্য এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিম ভ্রাতৃত্ব দৃঢ় ও সুসংহত করার লক্ষ্যেই প্যান-ইসলামী আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে। এই সময়ে মূলত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদকে রুখে দাঁড়াতে প্যান-ইসলামী আন্দোলন এক শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। মুসলমানদের এক ধর্মগ্রন্থ, এক কিবলা, সকলে একই নবির অনুসারী এবং একই পবিত্র জীবনাদর্শ ধারণ করে। তাই এ সকল অনুঘটক ও কার্যকারণকে পুঁজি করে মুসলমানরা একই খলিফা বা খিলাফতের[১৫] অধীনে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস পান। ইসলামকে ভিত্তি করে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্য কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনই হচ্ছে প্যান-ইসলাম। ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনাই হচ্ছে এর মূল ভিত্তি। ধর্মকেন্দ্রিক পরিচয়কেই এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 'আরবিতে বলা হয় الوحدة الإسلامية। সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানরা একটি একক রাষ্ট্র বা খিলাফতের অধীনে সংঘবদ্ধ থাকবে এটাই হচ্ছে এই আন্দোলনের মূলকথা। প্যান-ইসলামকে একটি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বললেও অত্যুক্তি হবেনা। প্যান-ইসলাম হলো মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলনের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামক শক্তি। এ মতবাদের উপর ভিত্তি করে বিশ শতকে মুসলমানরা পুনর্জাগরিত এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়া শুরু করেছিল।

আধুনিককালে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিমান পুরুষ জামাল উদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৭খ্রি.) প্যান-ইসলামী আন্দোলনে বিশেষ গতি সঞ্চার করেন। এ আন্দোলনের সাথে তাঁর নাম বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। আফগানীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে দেখায় যে, বিশ শতকে মুসলমানদের মধ্যে প্যান-ইসলামের ধারণা ব্যাপকভাবে দানা বাধতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাবাশালী আন্দোলন সমূহের মধ্যে প্যান-ইসলামী আন্দোলন অন্যতম। উনিশ শতকের শেষ দিকে যখন মুসলমানদের সর্বশেষ খিলাফত উসমানী সাম্রাজ্য পতনের দ্বার প্রান্তে চলে আসে, তখন খিলাফত ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে এবং

---

১৫ **খিলাফত:** ইসলাম ধর্মানুযায়ী আল্লাহই যেহেতু সার্বভৌমত্ব ও আদেশ-নিষেধের একমাত্র মালিক, সেহেতু কোনো মানুষ প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম শাসক হতে পারে না। মানুষ শুধু পারে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে কার্যকর করতে। সুতরাং খিলাফত হচ্ছে আল্লাহ ও রাসুল (সা.) এর প্রতিনিধিত্ব করা এবং এর মূল কথা হচ্ছে ১. খলিফা আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর প্রতিনিধি মাত্র। ২. খলিফার কাজ হচ্ছে কোররআন-সুন্নায় বিধৃত আদেশ-নিষেধকে কার্যকর করা। ৩. খলিফা হবেন নির্বাচিত; বংশানুক্রমিক নয়। ৪. খলিফা আল্লাহর রবুবিয়াত বা প্রতিপালকত্বের ভিত্তিতে সমগ্র জনগণের সুষ্ঠু ও সুষম প্রতিপালন সুনিশ্চিত করবেন ৫. খলিফা আল্লাহ ও রাসুল (সা.) এর পক্ষে বিশ্বাসীদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সুষ্ঠু নেতৃত্বের নিশ্চয়তা বিধান করবেন। বস্তুত, খিলাফত আল্লাহ নির্দেশিত 'তৌহিদ' এরই ফলশ্রুতি মাত্র। (দ্র. [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪)

ঔপনিবেশিক আধিপত্য রুখতে বিশ্ব মুসলিমের নিকট আফগানী প্যান-ইসলামের ধারণা উপস্থাপন করেন। তিনি মুসলিম বিশ্বকে ধর্মীয় ঐক্য ও সংহতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

তিনি পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, ইরানের শাহ্ তুরস্কের সুলতানকে খলিফা[১৬] হিসেবে মেনে নিবেন। একই সাথে তুর্কি সুলতান পারস্যের স্বাধীনতাকে বরণকরে নিবেন। জামাল উদ্দীন আফগানীর একজন অনুসারী হিসেবে তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ প্যান-ইসলামী আদর্শকে অকপটে মেনে নেন। সুলতান পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি এবং সম্প্রসারণবাদী উগ্র ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্যান-ইসলাম কেন্দ্রিক ঐক্য গড়ে তোলার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। প্যান-ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ নীতি থেকে বিশ্ব মুসলিম জাতিকে মুক্ত করা। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করণে প্যান-ইসলামী চেতনা এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে। এ আন্দোলন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যর্থ হলেও এর সুদূর প্রসারী ফলাফল রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'আরব জাতীয়তাবাদের উত্থানের ফলে প্যান-ইসলামীজম কিছুটা আড়াল হয়ে যায়। এয়োদশ শতাব্দীতে আব্বাসী বংশের পতনের পর মুসলিম সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগে ইউরোপীয় শক্তি ধীরে ধীরে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র তাদের করতলে নিয়ে আসে। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রই ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হয়। আফগানী প্যান-ইসলামের মূলমন্ত্রে উজ্জীবীত হয়ে মুসলিম জাতির একতা ও সংহতির জন্য আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনিমুসলিম দেশে দেশে ঔপনিবেশিক আধিপত্য রুখে দেয়ারলক্ষ্যে প্যান-ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এজন্য

---

১৬ **খলিফা:** খলিফা শব্দের শাব্দিক অর্থ উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি। এ শব্দটি মহানবি (সা.) এর প্রতিনিধি অর্থে মুসলমানদের রাষ্ট্রনেতার পদবিরূপেও ব্যবহৃত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। তারপর হযরত উমর (রা.) বিনয়াবশত নিজেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যথার্থ প্রতিনিধি হওয়ার অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন এবং খলিফার বদলে 'আমিরুল মুমিনিন' বা 'বিশ্বাসীদের নেতা' এ পদবি ব্যবহার করেন। অবশ্য এ সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলি (রা.) সত্যিকার চার খলিফা বা খোলাফায়ে রাশেদা নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে আব্বাসীয় ও অন্যান্য শাসকরাও এ উপাধি ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন পীর-মাশায়েখদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীদেরকেও 'খলিফা' বলে অভিহিত করা হয়। [হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. পৃ. ১৪২]

তিনি কখনও কোনো সাংবিধানিক সরকারের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেননি।[১৭] তাঁর লক্ষ্য ছিল বিদেশি আজ্ঞাবাহী শাসকদের স্থলে যোগ্য দেশপ্রেমিক শাসক নিযুক্ত করা এবং তিনি মনে করতেন যে, সুশাসনের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। তাই তাঁর লেখনীতে তিনি প্রচলিত গণতন্ত্র কিংবা সংসদীয় ব্যবস্থার অনুকূলে কোনো কিছুই তুলে ধরেননি।[১৮]

সর্বোপরি আফগানী ছিলেন উনিশ শতকের একজন সত্যিকার ইসলামী আদর্শবাদী মানুষ, ইসলামী আধুনিকতাবাদের অন্যতম জনক এবং প্যান-ইসলাম ভিত্তিক ঐক্য ও সংহতির এক মহান পুরোধা।[১৯] ধর্মতত্ত্বের চেয়ে পাশ্চাত্য চাপের বিপরীতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতি তিনি বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন।[২০] অনেকেই ধারণা পোষণ করেন যে, আফগানীর এ অর্জনের নেপথ্যে মিশরের মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অবদান সবচেয়ে বেশি এবং 'আবদুহ্ই তাঁর এ চিন্তাধারাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[২১] কেননা প্যান-ইসলামী আন্দোলনের শুরুর দিকে আফগানীমূলত মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর বিশেষ সহযোগিতায় মিশর ও ফ্রান্স কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা শুরু করেন এবং তাঁদের এ সকল লেখনীই ছিল প্যান-ইসলামী আন্দোলনের একমাত্র প্রাণশক্তি; যা বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ হতে নিরন্তর প্রেরণা যোগায়।

আফগানী প্রধানত দু'টি বিষয়ের অভাব বোধ করেন। প্রথমটি হলো অনৈক্য। তিনি বলেন, আজ বিদেশি শক্তি আমাদের অনৈক্যের সুযোগে মুসলিম রাষ্ট্রে ঢুকে পড়েছে। আর দ্বিতীয়টি হলো নেতৃত্ব। তাঁর দৃষ্টিতে, মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্বের সংকট তৈরি হয়েছে এবং দৃঢ় কোনো নেতৃত্ব নেই।তিনি মনে করেন, ঐক্য ও নেতৃত্ব ইসলামের সুউচ্চ প্রাসাদের দু'টি প্রধান ভিত্তি। এগুলোকে দৃঢ় ও সুসংহত রাখার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেক

---

১৭ Wilfrid Scawen Blunt, *Secret History of the English Occupation of Egypt* (London: Unwin, 1907) p. 100.

১৮ Nikki R. Keddie, *Sayyid Jamal ad-Din al-afgani: A political Biography* (Berkeley: University of California press, 1972), P. 226

১৯ *Jamal Al-din al-Afgani*, Jewish Virtual Library, www.jewishvirtuallibrary.org/jamal-al-din-al-afgani

২০ Vali Nasr, *The Sunni Revival: How Conflicts within Islam will shape the future* (New York: Norton, 2006), P. 103

২১ Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age (Cambridge: Cambridge University press, 1983), P. 131-132

ব্যক্তির জন্য আবশ্যক।[২২] বস্তুত আফগানী ছিলেন তাঁর সময়ের উদারনৈতিক ও সাংবিধানিক আন্দোলনের এক মস্তবড় প্রেরণাশক্তি। ইউরোপীয় প্রভাব ও শোষণ থেকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মুক্তি, উদারনৈতিক[২৩] সরকার প্রতিষ্ঠা এবং শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলিম রাষ্ট্রের একতা প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়।[২৪] প্যান-ইসলামী আন্দোলন ছিল বিশ্বব্যাপী মুসলিম ভূখণ্ড গ্রাসের ইউরোপীয় লোলুপ-নির্লজ্জ প্রয়াসের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া। এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮৭৭-৭৮ খ্রিষ্টাব্দের তুরস্ক-রাশিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। এ যুদ্ধের বাস্তবায়নের পর বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রান্তের মুসলিমদের মনে যে ভীতি জন্মেছিল; তা হলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের ফলে ইসলামের সীমানা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে উঠবে।[২৫]

এ সময়ে তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরাও প্যান-ইসলামী চেতনায় প্রভাবিত হয়। এতদ অঞ্চলের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্যান-ইসলামী ধারণার পক্ষে প্রচারণা চালায়। এ সকল সংবাদপত্রে একদিকে তুরস্কের সমর্থনে লেখালেখি চলতে থাকে। আর অন্যদিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও দ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটে। এতে প্যান-ইসলামী চিন্তাধারার একটি জোরালো পরিস্ফুটন পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, অত্র অঞ্চলে প্যান-ইসলামী আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও ব্রিটিশ বিরোধী শক্তিশালী প্লাটফর্ম গঠনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। একইভাবে প্যান-ইসলামী আন্দোলন এ জনপদের অধিবাসীদেরকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

তুরস্ক যখন যুদ্ধে বিজড়িত হয়ে পড়ে তখন বাংলার মুসলিমরা অর্থ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে তুরস্কের সহায়তাদানেই ক্ষান্ত থাকেনি, তুরস্কের সাফল্য কামনায় তারা অভূতপূর্ব জয়োল্লাসের বহিঃপ্রকাশ

---

২২ Ervand Abrahamian, *Iran between two Revolutions*(Princeton: princeton University press, 1982, P. 63

২৩ **উদারনীতি:** উদারনীতি বা উদারতাবাদ (Liberalism) হচ্ছে রক্ষণশীলতা বিরোধী সংস্কারপন্থি মতবাদ। এ মতবাদীরা রক্ষণশীলতার যেমন বিরোধী, তেমনি গোঁড়ামিবাদেরও বিরোধী। এরা সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের নীতি অনুসরণ করে এবং উদারনৈতিক পথ অবলম্বন করে । [দ্র. হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪]

২৪ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ খ্রি.), ১ম সং., পৃ. ৫৫।

২৫ দে অমলেন্দু, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৭৭।

ঘটিয়েছিল।[২৬] তুরস্ক ছিল তৎকালীন মুসলিমদের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। তাদের মনে এ ধরনের একটি ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ইসলামকে রক্ষা করতে হলে তুরস্ককে রক্ষা করতে হবে; এরূপ ধারণা ভারতীয় তথা বাঙালী মুসলিমদের মনে বদ্ধমূল ছিল সুদৃঢ়ভাবে। স্বভাবতই মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্যান-ইসলামী আদর্শকে সামনে রেখে তুরস্কের সমর্থনে অবতীর্ণ হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে।[২৭] প্যান-ইসলামী চিন্তাধারাকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে বাংলার সংবাদপত্রগুলি অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিল। মুসলিম নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলি উক্ত সময়কালে যে বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ভীতি প্রদর্শনের ফলে ইসলাম ধর্মের পরিসর কতখানি সংকীর্ণতর হয়ে উঠছে তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা।[২৮] ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার উর্দুভাষী প্যান-ইসলামিস্ট বুদ্ধিজীবীরা বেশ কিছু সংখ্যক উর্দু দৈনিক ও প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ইকদাম, তারজুমান, রিসালাত, নাকস্-সাদাকাত, আল-হিলাল, জামহুর, মিল্লাত, ওয়া আল-বিলাদাহ্ এবং হাবলু আল-মাতিন। এগুলি ছিল ব্রিটিশ বিরোধী এবং তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রচার মাধ্যম। এদের এক ও অন্যতম লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহানুভূতিকে যে কোনো মূল্যে তুলে ধরা।[২৯] এভাবে এ উপমহাদেশেও মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য জনসাধারণের নিকট তুলে ধরেন। আর তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল অত্র অঞ্চলে প্যান-ইসলামী আন্দোলনকে তরান্বিত করা।

এ আন্দোলন কোনো ভূইফোড় আন্দোলন হিসেবে দেখা দেয়নি বরং মুসলিম বিশ্বের মহাসংকট কালের এক সম্ভাবনা ও মুক্তির বার্তা নিয়েই এর আবির্ভাব ঘটে। প্যান-ইসলামীজমের মৌলিক ধারণা মুহাম্মদ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশিদুনের খিলাফতের সময় থেকেই উৎসারিত হয়। তাই প্যান-ইসলামী চেতনা ইসলামের নতুন কোনো মতাদর্শ নয়। কেননা রাসুল (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশিদুনের সময়ও মুসলিম বিশ্ব একটি একক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে কার্যকর ছিল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও খোলাফায়ে রাশিদুনের জীবনকাল পর্যন্ত মুসলিম অধ্যুষিত

---

২৬ *প্রাগুক্ত*।

২৭ Ahmed Sufia, *Muslim Community in Bengal 1884-1912*(Dacca: Dacca University, 1974), P. 204

২৮ Sanyal Usha, *Deoband Islam and politics in British India* (Bombay: Oxford University press, 1996), P. 287-89

২৯ দে অমলেন্দু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

এলাকা সমূহে ইসলামী নীতি কার্যকর ছিল। উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সাথে সাথে ইসলামের মৌলিক নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থেকে মুসলিম শাসকেরা কিছুটা দূরে সরে পড়ে। ইসলামী আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এবং মুসলিম শাসকদের শাসননীতি ও চরিত্রের মাধ্যকার পার্থক্য দিনে দিনে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সে সময় থেকেই ইসলাম ও মুসলিম দুটি স্বতন্ত্র চরিত্ররূপে আবিস্কৃত হয়। উভয়ের সমান্তরাল গতিধারার পার্থক্য ও ব্যবধান চূড়ান্তরূপে দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আব্বাসী শাসনামল পর্যন্ত মুসলমানরা ছয়শত বছরেরও বেশি সময় তাঁদের বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এ কারণে বিশ্ব দরবারে ইসলাম ছিল শ্রদ্ধা ও আস্থার বিষয়। ইসলামের আদর্শ ও সৌন্দর্যের জন্য বিশ্বের অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বীদের নিকট মুসলিমরা ছিল সম্মানিত।

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসী খলিফা আল-মু'তাসীম বিল্লাহ্‌র[৩০] শাসনামলে চেঙ্গীস খানের ভ্রাতুষ্পুত্র হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পর সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা বহুলাংশে লোপ পায়। পরবর্তীতে খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে উসমানী তুর্কিগণ কর্তৃক ইউরোপের পূর্বাংশ বিজিত হলে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি এ বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। উসমানী শাসকগণ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে সমর্থ হলেও কার্যত তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পার না হতেই দ্বিতীয় দশকে ইউরোপ থেকে নির্মূল হওয়ার মাধ্যমে উসমানী শাসনের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটে।

---

৩০ আল-মু'তাসিম বিল্লাহ ছিলেন একজন আব্বাসী খলিফা (২১৮-২২৭ হি./৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)। তিনি ১৭৯ হি./৭৯৫ খ্রি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খলিফা হারুনের পুত্র।আল-মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) আল-মু'তাসিম আনাতোলিয়ার একজন সুদক্ষ সেনাপতি, অধিনায়ক ও মিশরের গভর্নর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। রজব ২১৮ হি./আগষ্ট ৮৩৩ খ্রি. সালে মু'তাসিম খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর আমলে চারটি প্রধান অভিযান পরিচালিত হয়। আল-মু'তাসিম ১৮ রাবী'১ম ২২৭ হি./৫ জানুয়ারি, ৮৪২ খ্রি. সালে সামারাতে মারা যান। একজন সমারিক অধিনায়ক হিসেবে তাঁর গুণাবলি নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় এবং আব্বাসী খিলাফত তাঁর অধীনে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সমারকি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। (দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.), ২০শ খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৭।)

মুসলমানদের সকল পরাজয়, পরাধীনতা ও পতনের একটি মৌলিক কারণ ছিল বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অনৈক্য, অনাস্থা ও অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে জামাল উদ্দীন আফগানীর ন্যায় একজন মুসলিম মনীষা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অনৈক্যের বিষয়টি নতুন করে পুনঃবিবেচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস চালান। বিশ্ব মুসলিমের মধ্যকার পুনঃ ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, মুসলিম জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা, স্বীয় সম্মান, গৌরব, ঐতিহ্য ও আদর্শ নিয়ে বিশ্বসভায় যেন তাঁরা পুনরায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে এজন্য তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সম্মুখে তখন মুসলিম বিশ্বের যে চিত্র দেখা দিয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তুর্কির তথাকথিত সুলতান পদটি ইউরোপের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট জার পদের নিকট 'Sick Man of Europe' অর্থাৎ 'ইউরোপের পীড়িত ব্যক্তি' হিসেবে পরিচিত ছিল। পারস্যের শাহ্ একদিকে রাশিয়া, অপরদিকে ইংরেজদের ভয়ে ছিল কম্পিত। আর অন্যদিকে মিশরের তৎকালীন গভর্নর মুহাম্মদ আলী পাশা তুর্কি সুলতানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাদের পুতুল সরকার হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করে।

এরূপ এক সংকটকালীন পরিস্থিতিতে জামাল উদ্দীন আফগানী এর কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে, বিশ্বমুসলিমের এ কারণ দুর্দশার মূলে রয়েছে তাঁদের মধ্যকার অনৈক্য ও অসংহতি। মুসলমানদের অনৈক্যের সুযোগে ইউরোপীয় শক্তি তাঁদের উপর বারবার আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। তাই তিনি ইউরোপে অবস্থিত তুর্কি সুলতানের নিকট গিয়ে প্যান-ইসলামী আদর্শকে সফল করার জন্য যেমনি প্রচেষ্টা চালাতেন, তেমনি পারস্যের শাহ্‌ের নিকট গিয়েও তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। তাঁর একটি অতি পছন্দনীয় প্রবাদ বাক্য হলো, 'ইসলামে একজন মার্টিন লুথারের[৩১] প্রয়োজন।' ইসলামের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আশা

---

৩১ মার্টিন লুথার (Martin Luther): মার্টিন লুথার ছিলেন (১৪৮৩-১৫৪৬) খ্রিষ্টীয় ধর্মসংস্কার (Reformation) আন্দোলনের এর নেতা এবং প্রটেষ্টান্ট (Protestant) ধারার প্রতিষ্ঠাতা। ষোড়শ-সপ্তদশ শত্বাব্দীতে তাঁর মতবাদ জার্মানির আধ্যাত্মিক জগৎকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর বাইবেলের অনুবাদ জার্মান ভাষার গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। চার্চ এবং ধর্মযাজকরাই হলো ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী লুথার ক্যাথলিক পোপদের এ দাবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি বলেন যে, মানুষের মুক্তি 'ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান' ও রহস্যবাদের মধ্যে নয়, বরং মুক্তি সরল বিশ্বাসের মধ্যে। তিনি আরও বলেন যে, ধর্মীয় সত্যও পোপ বা ধর্মযাজকদের অনুশাসনের মধ্যে নয়, বরং গসপেলের মধ্যে নিহিত। মার্টিন লুথারের এ মতবাদ প্রাথমিক যুগের বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে চার্চ এবং সামন্তবাদী আদর্শের সংঘাতকে প্রকট করে তোলে। তিনি

পোষণ করতেন যে, ইরানের শাহ্ ওসমানী সুলতানকে খলিফা হিসেবে স্বীকার করুক। আফগানী সর্বত্র ইসলামের একতা প্রচার করেন এবং সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের আধিপত্য বিস্তারের বিষয়ে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন। ইসলামী বিশ্বে তিনি একজন শক্তিশালী রাজনৈতিক শাসকের সন্ধান করেন;এমন একজন শাসক যিনি ইসলামের একতা আনয়ন করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হবেন।[৩২]

১৮৭১ সালে আফগানী মিশর গমন করেন। তিনি মিশর পৌঁছালে জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বান সমাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তৎকালীন মিশর সরকার তাঁকে বার্ষিক বারো হাজার মিশরীয় টাকার বৃত্তি প্রদান করেন। জ্ঞানপিপাসু মানুষেরা দলে দলে তাঁর নিকট ভিড় জমাতে থাকেন। তিনি তাদেরকে ইসলামী দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাংবাদিকতা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে মিশরের তরুণ সমাজ দারুনভাবে প্রভাবিত হয়। ১৮৭১-১৮৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি মিশরে আট বছর অবস্থান করেন। মিশরে আট বছর অবস্থানকালীন আফগানী কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি মিশরের তরুণদের নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক, বক্তৃতা ও সভা-সেমিনারের আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মিশরে সর্বপ্রথম রাজনীতি বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর এ পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি প্যান-ইসলামী মতাদর্শ মিশরীয়দের কাছে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। আফগানী তাঁর মিশরীয় ছাত্রদেরকে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন শিক্ষা দেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের ইউরোপীয় আগ্রাসনের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে বলতেন, একমাত্র জাতীয় ঐক্য ও সংহতিই পারে এ আগ্রাসন রুখতে।[৩৩] আফগানীর জাগরণমূলক বক্তব্য ও গণসংযোগের ফলে মিশরীয় তরুণ ও ছাত্র সমাজ বিদেশীদের শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে এবংবিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণে ভূমিকা রাখতে সংকল্পবদ্ধ হয়। এই সময়ে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ও রাশিদ রিদার ন্যায় প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। আফগানী প্যান-ইসলামী

জার্মান বার্গারদের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কিত স্বার্থেরও বিরোধিতা করেন। তিনি প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বের সমালোচনা করেন এবং বুর্জোয়া মানবতা ও অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করেন। ১৫২৫ সালের কৃষক যুদ্ধের সময় তিনি শাসকশ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করেন। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৯]

৩২ ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত), *মধ্যপ্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সং.,পৃ. ২৬৩।

৩৩ Eliezer Tauber, *The Emergence of the Arab Movements* (London: Frank Cass and Co. Ltd. 1993), p. 23

আন্দোলনের মাধ্যমে এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন যা মহানবি (সা.) ও খোলাফায়ে রাশিদুনের সময় বিদ্যমান ছিল। তিনি মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। আফগানীর চিন্তাদর্শনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মিশরের শাসক গোষ্ঠীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। এজন্য ১৮৭৯ সালে তাঁকে মিশর থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু আফগানী মিশরীয় জনগণের মনে অমোচনীয় চিহ্ন রেখে যেতে সমর্থ হন। তাঁর মিশর ত্যাগ করার বিষয়টি যুব সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের উপর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাঁর আদর্শবাদে বুদ্ধিজীবি সমাজ প্রভাবিত ও জাগ্রত হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ সুগম হয়। পরবর্তীতে তাঁরই অন্যতম শিষ্য মুহাম্মদ আব্দুহ্ আধুনিক মিসরের বুদ্ধিজীবি রেনেসাঁর অগ্রদূত, জাতীয়বাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক ও অবিসংবাদিত চিন্তাবিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
'আবদুহ্ এর জন্ম, মৃত্যু ও বংশ পরিচয়

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন আধুনিক যুগে মুসলিম জাগরণের একজন অন্যতম পথিকৃৎ, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষাব্রতী, আইনজ্ঞ, মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা এবং শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক। মুক্তবুদ্ধি চর্চা এবং ইসলামী সংস্কার আন্দোলনে মৌলিক অবদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। মিশর সহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির অভ্যুদয়কালে তিনি মুসলিম জাতিকে ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সঠিক জন্মস্থান এখন পর্যন্ত অজানা। আর তাঁর জন্মের বছর নিয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে ১৮৪৯ খ্রি. তাঁর জন্ম সময় বা সাল হিসেবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। তিনি নিজেই তাঁর লেখায় এ তারিখটি উল্লেখ করেছেন, যদিও কেউ কেউ তাঁর জন্মের সময় নিয়ে বিভিন্ন তারিখ দিয়েছেন।[৩৪] মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ১২৫৮ হিজরি[৩৫] মোতাবেক ১৮৪৯ খ্রি. মিশরের উত্তরে নীল বদ্বীপ অঞ্চলের এক ভাটি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই অশ্বারোহণ, ধনুক চালনা এবং সাঁতার কাটা পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন এক মধ্যবিত্ত কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান খায়রুল্লাহ্।[৩৬] মুহাম্মদ 'আবদুহ্ একজন খাঁটি মিশরীয় হওয়ার অন্যতম কারণ হলো তিনি ছিলেন মিশরীয় বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষক বা কৃষক শ্রেণির পরিবারথেকে উঠে আসা এক সহজ-সরল আদর্শ সন্তান। 'আবদুহ্ এর পিতা আবদুল্লাহ ইবন হাসান খায়রুল্লাহ তাঁর মাতা জুনায়না বিনতে উসমান আল কবির এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়ে হাসান খায়রুল্লাহ্র পরিবারের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কেননা তাঁর মাতা ছিলেন ঘারবিয়্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত তান্তার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য।[৩৭]

---

৩৪ E.J. Brill's, *First Encyclopedia of Islam,* Volume VI, Leiden: The Netherland, 1987, P. 18-19

৩৫ জুরযীযায়দান, *তারীখ আল-আদাব আল-লুগাত আল-'আরাবিয়্যাহ্* (মিশর: দার আল-হিলাল, ১৯৯৩ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮০।

৩৬ আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবি* (বৈরূত: দার আল-মা'রিফাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩২৮।

৩৭ Aswita Taizir, *Muhammad Abduh and the Reformation of Islamic law* (Canada: 1994), p.1

'আবদুহ্ এর পিতা হাসান খায়রুল্লাহ্ ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত। তাঁর মাতা ছিলেন 'আরব বংশোদ্ভূত। কথিত আছে যে, তাঁর মাতার বংশ পরম্পরা দ্বিতীয় খলিফা হযরত 'উমর[৩৮] (রা.) এর বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। 'আবদুহ্ এর পরিবার মিশরের বাহরিয়্যা প্রদেশের নাসর মহল্লার একটি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই গ্রামেই 'আবদুহ্ এর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাঁর পিতা হাসান খায়রুল্লাহ ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী এবং শারীরিকভাবে শক্তিশালী। 'আবদুহ্ এর পূর্বপুরুষগণ ধনুবিদ্যা ও অশ্বচালনায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের উপর নমনীয় ছিলেন। তাই তাঁরা তাদের গৌরব ও অর্থের চেয়ে শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা অধিকতর সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন শান্ত প্রকৃতির ধর্মনিষ্ঠা ও বদান্যতার জন্য সকলে তাঁকে সম্মান করতো।[৩৯]

তৎকালীন সময় ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 'আবদুহ্ের পিতা-মাতাকে অধিকতর দৃঢ় চরিত্র ও যোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী দায়িত্বশীল অভিভাবকমনে হয়েছিল। কেননা তৎকালীন মিশরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের এক বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সেই সময়ে পুরোপুরি অশিক্ষিত ছিল; যার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের সন্তান মুহাম্মদ 'আবদুহ্কে একজন যোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। যদিও 'আবদুহ্ তাঁর আত্মজীবনীতে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর পিতার বিষয়ে বেশি কিছু উল্লেখ করেননি; তথাপি বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর পিতার সম্পর্কে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করেছিলেন এবং এরূপ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তাঁর নিজ গ্রামে তিনি অনেক বেশি

---

৩৮ 'উমর ইবন আল-খাত্তাব তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে পরিচিত। মক্কা মুকার্‌রমায় কুরাইশ বংশের শাখা বানু 'আদী গোত্রে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাকে 'আদাবী বলা হতো। তাঁর মাতার নাম হানুতামা বিনতে হাশিম। হারবুল ফিজার এর চার বৎসর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরে যুলহাজ্জ মাসে অর্থাৎ হিজরতের সাত বৎসর পূর্বে ছাব্বিশ অথবা সাতাশ বৎসর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ২৪ হিজরির মুহার্‌রম মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি ধাবমান ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে আরোহণ করতে পারতেন। ইবনে সা'দ এর বর্ণনানুযায়ী জাহেলী যুগে উকাজ মেলায় তিনি কুশতী লড়তেন। নবী করীম (স.) এর যুগে প্রথমদিকে তিনি ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। এ সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের বিশেষ করে স্বীয় গোত্রের নও-মুসলিমদের তিনি নির্যাতন করতেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইবনে হিশাম দুটি ভিন্ন বর্ণনা প্রকাশ করেন। প্রথমত: মহানবী (স.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে তিনি বের হন। সে সময়ে পথিমধ্যে একজন তাঁকে বলেন, নিজের ঘর অর্থাৎ ভগ্নি ও ভগ্নিপতির সংবাদ লও। তখন তিনি তাঁর ভগ্নিপতির বাড়িতে গমন করেন। সেখানে তাদের সাথে কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত শ্রবণ ও পাঠের মাধ্যমে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত: একদিন গোপনে তিনি মহানবি (স.) এর কোরআন তিলাওয়াত শুনে এতে প্রভাবিত হন। তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ না করায় তিনি পবিত্র কোরআনের নির্দেশনানুসারে স্ত্রীকে তালাক দেন। তিনি বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই মহানবি (স.) এর সঙ্গে ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি একজন সাহসী বীর যোদ্ধা এবং মহান ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। (দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২-২৩।)

৩৯ জামাল উদ্দীন আফগানী ও মুহাম্মদ'আবদুহ্, *আল 'উরওয়াত আল-উসকা* (কায়রো: দার আল-'আরাব, ১৯৯৩ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৭।

সম্মানিত ও সুখী ছিলেন। 'আবদুহ্ এর পিতা তাঁর সন্তানদের পড়ালেখার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাড়িতে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করতেন, আর এতে করে তারা পড়াশোনায় পর্যাপ্ত স্বাচ্ছন্দবোধ করেছিল এবং আগামী দিনে পড়ালেখার বিষয়ে আসন্ন অন্যান্য সুযোগগুলো অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর পিতার অবস্থান সম্ভবত গ্রামের ঐ সকল ব্যক্তির চেয়ে কিছুটা উপরে ছিল যাদের নিকট কিছু জমি ছিল।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ যে সকল গুণাবলির উপর বেড়ে উঠেন তা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং তাঁর পারিপার্শ্বিকতা তাঁকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছিল। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা,আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ। আর উদারতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভালবাসায় এভাবেই তিনি অগ্রসর হোন সামনের দিকে।[৪০]

মৃত্যুবরণ

১৩২৩ হিজরি মোতাবেক ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুলাই এক গ্রীষ্মে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া[৪১] শহরে ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর চিন্তা-দর্শন, লেখনী ও শিক্ষার মাধ্যমে তিনি বহু গুণগ্রাহী অর্জন করেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর চিন্তা-দর্শন ও কর্মের দ্বারা তাঁর পরবর্তী সময়ের বেশ কয়েকটি প্রজন্মকেও প্রভাবিত করেন। এ মহামনীষার তিরোধানের সংবাদ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে দ্রুত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। আর এটি অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয় যে, 'আবদুহ্ এর সুস্থতা, অসুস্থতা, যাপিত জীবন কিংবা প্রতিদিনের অন্য যে কোনো সমৃতির ন্যায় তাঁর মৃত্যুর পরের দিন The Egyptian Gazette 'ডেথ অব গ্র্যান্ড মুফতি' অর্থাৎ 'প্রধান মুফতির মৃত্যু' শিরোনামে এক শোক সংবাদ প্রকাশ করে। উক্ত শোক প্রতিবেদনে বলা

---

৪০ আহমাদ আমিন, *যু'আমা আল-ইসলাহ্ ফি আল-'আছর আল-হাদিছ*, দার আল-কিতাব আল-'আরাবি (বৈরূতঃ ১৯৪৮ খ্রি.), পৃ. ২৮০।

৪১ আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরটি আল-আস্কান্দারিয়্যা নামেও পরিচিত। আল-ইস্কান্দারিয়্যা মিশরের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। টলেমীর যুগে এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ছিল। আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপকূলবর্তী অল্প সংখ্যক সামুদ্রিক বন্দরের অন্যতম ভৌগলিক তাৎপর্যপূর্ণ বন্দর হওয়ার কারণে আল-ইস্কান্দারিয়্যার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩২ অব্দে মহামতি আলেকজান্ডার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবদের অধিকারে আসার পর এর পূর্ব গৌরব স্তিমিত হয়ে গেলেও এটি একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ নগর হিসেবে পরিচিত।[সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৮-১০৯।]

হয়, আজ কায়রো অন্ত্যেষ্টি যাত্রা। গতকাল ৫.১৫ ঘটিকায় সেফার, রামলেহে মিশরের গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ মুহাম্মদ আবদুহ্ এর প্রয়াণ ঘোষণায় আমরা গভীরভাবে শোকাভিভূত।[৪২]

ইউরোপ যাওয়ার প্রাক্কালে আলেকজান্দ্রিয়ার শহরতলি রামলেহের সেফেরে তাঁর বন্ধু মুহাম্মদ বেরাসিমের বাড়িতে তিনি যে রোগে আক্রান্ত ছিলেন সেটিই তাকে পাকড়াও করে।[৪৩] তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর এ অসুস্থতা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল; কিন্তু মৃত্যুর প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বেও এর থেকে গুরুতর কোনো পরিণতির আশংকা করা হয়নি। তাছাড়া তিনি কিডনির ক্যান্সার রোগেও আক্রান্ত ছিলেন।[৪৪]

তিনি চিকিৎসার জন্য ইউরোপ এবং চিকিৎসা শেষে মরক্কোতে যাওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন।[৪৫] চিকিৎসার জন্য লন্ডন গমনের জন্য ইসকান্দারিয়ায় অবস্থানকালে কয়েকদিন রোগে ভোগে তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হন। 'আবদুহ্র শারীরিক অবস্থার এতটাই অবনতি ঘটে যে, তাঁর জন্য ইউরোপ ভ্রমণ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে এবং কয়েকদিনের অসুস্থতার পর অবশেষে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুলাই রোজ মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'আরবি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী দিনটি ছিল ০৮ জুমাদাল আউয়াল, ১৩২৩ হিজরি।[৪৬] 'আবদুহ্ এর জীবনের শেষের দিকে হিন্দুস্থান, তুর্কিস্থান ও ইরানসহ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের মুসলমানদের বাস্তব অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করারএকটি মনোবাসনা তিনি তাঁর মধ্যে লালন করতেন। ইসলামের ইতিহাস প্রণয়ন ও একটি দৈনিক প্রকাশ করার পরিকলপনা তার জীবদ্দশাতেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আল-আযহার এর সংস্কার কর্মসূচিতে নিরাশ হয়ে তিনি নতুন পদ্ধতির একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুর কারণে তাঁর জীবনের সকল স্বপ্ন পূরণ হয়নি।[৪৭]

মৃত্যুর পরের দিন প্রভাতে একটি হৃদয়স্পর্শী শবযাত্রা রেল স্টেশন রোডে পৌঁছায়; সেখান থেকে তৎকালীন মিশর সরকার কর্তৃক একটি সুসজ্জিত ট্রেনে মৃত দেহটিকায়রোতে নিয়ে যাওয়া হয়। যাত্রা পথে সমবেত জনতার প্রার্থনা এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কয়েকটি বৃহত্তর শহর এবং

---

৪২ dig-eg-gaz.github.io/post/will-abduh/

৪৩ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *তারীখ আল-উসতায আল-ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: ১৯৩১ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯, ৭৮।

৪৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬, ১৫১।

৪৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১।

৪৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯, ৬০, ১৫১।

৪৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪৯।

শহরতলিতে মৃতদেহ রাখা হয়।[৪৮] তারপর কায়রোতে আরও একটি মর্মস্পর্শী শবযাত্রা পৌঁছায়; যেখানে আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানরত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, কূটনৈতিক প্রতিনিধি, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ছোট দল, শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত, ধনিক শ্রেণি, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণ, প্রভাবশালী গোষ্ঠী, আল-আযহার হতে আগত শিক্ষার্থী, সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের লোকদের সমন্বয়ে এক বিশাল সমাগম ঘটে। অবশেষে মরদেহ আল-আযহার মসজিদে পৌঁছালে সেখানে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়।[৪৯] 'আবদুহ্ এর ন্যায় প্রকৃত দেশপ্রেমিক, অসাধারণ পণ্ডিত, সাহসী ও উদার মনের নেতা এবং সংস্কারককে সম্মান জানাতে মতের ও ধর্মের পার্থক্য ভুলে গিয়ে সেদিন ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।[৫০] নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন নেতৃত্বের বহুগুণে গুণান্বিত একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

'আবদুহের মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বশোকাভিভূত হয় এবং তাঁর জন্য গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে। তাঁর এ মৃত্যুতে মুসলমানরা একজন ধর্মীয় নেতা ও মহান সংস্কারককে হারায়। তাঁর মৃত্যুর পর বিরুদ্ধবাদীদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায় এবং সমালোচকদের অনর্থক সমালোচনা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেম ও ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত এক মহান পুরুষ; যিনি তাঁর সমগ্র জীবন দেশ, জাতি ও ইসলামের কল্যাণে ব্যয় করেন। যে সকল মানব দেশ ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে সকল জাতি-ধর্ম ও মানুষের নিকট একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক,পণ্ডিত ও মানব হিতৈষী হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাদের অন্যতম। তিনি মুসলিম জাতিকে নবজাগরণের পথে পরিচালিত করেছেন। তাঁর সুদূর প্রসারী দৃষ্টি ও আদর্শিক চিন্তাধারা যুগযুগ ধরে আলোকবর্তিকা হয়ে মুসলিম বিশ্বকে পথের দিশা ও প্রেরণা যোগাবে।

---

৪৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।
৪৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।
৫০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
‘আবদুহ্ এর শোকগাঁথায় হাফিজ ইব্রাহীম

‘আবদুহ্ এর সাহচর্যে কবি হাফিজ ইব্রাহীম

কবি হাফিজ মুহাম্মদ বেগ ইব্রাহিম[৫১] (১৮৭২-১৯৩২ খ্রি.) আধুনিক ‘আরবি কাব্যের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একজন। তিনি আধুনিক মিশরের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক স্বাধীনচেতা ও স্বভাবকবি। তিনি পরাধীন মিশরবাসীকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি তাঁর কবিতায় মিশরের গণ-মানুষকে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন দেখাতেন। এজন্য তাঁকে মিশরের জাতীয় কবিও বলা হয়। তবে তিনি ‘শা‘ইর আল-নীল’ অর্থাৎ নীলনদের কবি হিসেবেই অধিক পরিচিত। তিনি নীল পৃষ্ঠে অর্থাৎ নীল নদের ভাসমান নৌকায় জন্মগ্রহণ করেন, তাই তিনি পরবর্তী সময়ে ‘শা‘ইর আল-নীল’ বা নীল নদের কবি হিসেবে সুখ্যাত হন।[৫২] তিনি ছিলেন প্যান-ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববিশ্রুত নেতা এবং মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক মুফতি মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ এর অন্যতম প্রধান ভাবশিষ্য, বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সঙ্গী।

হাফিজ ইব্রাহিমের দেশাত্ববোধ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে ওঠার পেছনে যার সাহচর্য তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ‘আবদুহ্। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সুদানের এক সেনা বিদ্রোহে হাফিজের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হলে সামরিক আদালতের রায়ে ৩ মে, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে তাকে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয় এবং পরে তাঁর

---

৫১ হাফিজ ইবরাহীম (১২৮৯-১৩৪ হি./১৮৭২-১৯৩০ খ্রি.) মিশরের আসিয়ূত প্রদেশের অন্তর্গত দয়রুত শহরের সন্নিকটে নীলনদে নোঙরকৃত একটি ভাসমান নৌকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইবরাহীম আফিন্দী ফাহমী ও মায়ের নাম আলিসত হানিম কারীমা। পিতা খাঁটি মিশরীয়, আর মা তুর্কি বংশোদ্ভুত। চার বছর বয়সে তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। অসহায় বিধবা মা শিশু হাফিজকে নিয়ে কায়রোতে হাফিজের মামার কাছে চলে যান। সেখানে দু’-তিনটি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে উকীলের দপ্তরে চাকরি গ্রহণ করেন। অতপর কখনওপুলিশে, কখনও সেনাবাহিনীতে চাকুরি করেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর হাফিজের জীবনে আরও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। তিনি ১৯০৬ সালে কায়রোতে প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংস্কারক মুহাম্মদ ‘আবদুহ্এর সান্নিধ্যে আসেন। এ সময়ে আরও কতিপয় রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে হাফিজেরপরিচয় হয়। তাঁদের প্রভাবে হাফিজের মধ্যে গভীর দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। ফলে তিনি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত হন।[ড. আবদুল হামীদ সিনদ আল-জুনদী, হাফিজ ইবরাহীম (কায়রো:১৯৬৮ খ্রি. পৃ.১৬; ফাখূরী. তারীখ. পৃ. ৯৬৬; যায়্যাত, পৃ.৫০৪-৫০৭; দয়ফ. তারীখ. পৃ. ১০০-১১০।]

৫২ ড. আহমাদ আমীন, *মুকাদ্দামাতু দিওয়ানি হাফিজ ইব্রাহীম* (বৈরূত: মুহাম্মদ আমীন দামজ, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৬।

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১ নভেম্বর, ১৯০৩ খ্রি. থেকে তাঁর জন্য মাসে চার পাউন্ড করে অবসর ভাতা নির্ধারণ করা হয়।[৫৩] সামরিক আদালতের রায়ে চাকরি হারানোর পর কবি হাফিজের জীবনে নেমে আসে আর্থিক অনটনের ঘোর অমানিশা। অনেক খোঁজাখুজির পরও তিনি কোনো কাজ না পেয়ে চরম হতাশা ও দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হন। জীবনের এমনই এক সংকটকালে তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও সংস্কারক মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সাথে। মুহাম্মদ 'আবদুহ এর সাথে কবি হাফিজের পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে একটি কবিতার মাধ্যমে। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ যখন ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের গ্রান্ড মুফতির (প্রধান মুফতি) পদ অলংকৃত করেন তখন হাফিজ ইব্রাহিম 'আবদুহ্ এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁর সম্মানে একটি কবিতা রচনা করেন। এভাবে উভয়ের মধ্যে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন তৎকালীন মিশরের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার এবং শুদ্ধি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম পুরোধা। তিনি সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়াঁমি এবং দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হাফিজ ইব্রাহীম 'আবদুহ্ এর সংস্কার, বিপ্লব ও জাতীয় জাগরণমূলক কর্মসূচিতে একাত্মতা পোষণ করে তাঁর সান্নিধ্যে আসেন এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁর সকল কর্মসূচিকে তরান্বিত করার প্রাণপণ চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। 'আবদুহ্ এর বিপ্লবী সাহচর্যে আসার সুবাদে মিশরের কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সংস্কারবাদী বিপ্লবী নেতার সাথে হাফিজের সখ্যতা গড়ে উঠে। এ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে সা'দ জাগলুল পাশা, মুস্তফা কামিল ও কাসিম অমিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৪]

মিশরের এ সকল বিশিষ্ট নাগরিকের সংস্পর্শ ও সাহচর্য হাফিজের চিন্তা-চেতনা ও মননে গভীর রেখাপাত করে। তিনি তাঁদের দেশাত্মবোধ, জাতীয় জাগরণমূলক চেতনা ও বুদ্ধিদীপ্ত সংস্কারবাদী আন্দোলনে উজ্জীবিতহয়ে সমাজ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্রতী হন। এই সময়ে তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদ ও কর্তৃত্ববাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি বহু দেশাত্মবোধক ও জাতীয় জাগরণমূলক কবিতা রচনা করেন। পশ্চাদপদ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন মিশর জাতিকে জাতীয় জাগরণ, উন্নয়ন ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত করার মহান মানস নিয়ে

---

৫৩ ড. হামীদ আবদ আল-সিন্দ আল-জুন্দী, *হাফিজ ইব্রাহীম শা'ইর আল-নীল* (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬৮ খ্রি., ৩য় সংস্করণ), পৃ. ১৬।

৫৪ Hafiz Ibrahim, *Encyclopaedia of Islam,* new edition, vol. iii, p.59

আজীবন তিনি কবিতার মাধ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁর কবিতায় তিনি ইংরেজদের জুলুম-নির্যাতন, শাসন-শোষণ, মিশরবাসীর ক্ষোভ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলির বাস্তব চিত্র জোরালোভাবে ছন্দোবদ্ধরূপে তুলে ধরেন। হাফিজের রাজনৈতিক কবিতাগুলো মিশরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকলে পাঠক সমাজে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তৎকালীন মিশরের পত্রিকা-মঞ্চ সমূহের রাজনৈতিক প্রবক্তা ছিল তাঁর কবিতা। তাঁর রাজনৈতিক কবিতা সমূহের মধ্যে 'দিনশওয়ায়ের'[৫৫] ঘটনা সম্বলিত কবিতাটি অনুপম।[৫৬] ফলে তাঁর কবিতা ও রচনাবলি মিশরীয় জাতির স্বাধীনতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠে। এ সকল কারণে তাঁর কবিতার প্রতিবাদ্য বিষয় খুব সহজেই গণ-মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যেত। পাঠকদের মনে হতো এ যেন তাদেরই হৃদয়ের কথা।[৫৭]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ স্মরণে কবি হাফিজের শোকগাঁথা

(١) سلام علي الإسلام بعد محمد سلام علي أيامه النضرات

(٢) علي الدين و الدنيا علي العلم والحجي علي البر والتقوي علي الحسنات

(٣) لقد كنت أخشي عادي الموت قبله فأصبحت أخشي أن تطول حياتي

---

৫৫ **দিনসাওয়াই ঘটনা:** ১৯০৬ সালে কায়রো থেকে আলেকজান্দ্রিয়া গমন করে কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসার মিনওফিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেন। তারা পাশ্ববর্তী দিনসাওয়াই গ্রামে পাখি শিকারে বের হয়। ঘটনাচক্রে শিকারের সময় স্থানীয় একজন ইমামের স্ত্রী গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় গ্রামবাসী ব্রিটিশ শিকারীদের ঘিরে ফেলে হামলা চালায়। এ আক্রমণে দু'জন ব্রিটিশ অফিসার আহত হয়। অফিসারগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাতে থাকে এবং আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছোঁড়ে। পথিমধ্যে একজন আহত অফিসারের মৃত্যু হয় এবং অপরজন ক্যাম্পে ফিরে আসে। উত্তেজিত ব্রিটিশ সৈন্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে একজন স্থানীয় লোককে হত্যা করে। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা প্রায় বায়ান্ন জন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। সিরিন আল-কুম নামক স্থানে ব্রিটিশ অফিসারদের উপর আক্রমণের জন্য ১৮৯৫ সালে জারীকৃত আইনের বিধান অনুসারে গ্রেফতারকৃত গ্রামবাসীদেরকে আদালতে বিচারের মুখোমুখী করা হয়। ভুট্টুস গালী পাশা নামক একজন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী হিসেবে বিচার কাজ পরিচালনা করেন। ১৯০৬ সালের ২৭ জুন গ্রেফতারকৃত গ্রামবাসীদের মধ্যে চারজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়; অনেকে কারাবরণ এবং বেত্রাঘাতের দণ্ড লাভ করে। প্রকাশ্যে এ ধরনের নৃশংস সাজা দেওয়া হলে মিশরীয়দের জাতীয় মর্যাদায় চরম আঘাত আসে। এ ঘটনা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মিশরীয়দের উদ্বুদ্ধ করে। উক্ত বর্বরতা ও নৃশংসতার জন্য মোস্তফা কামিল মিশর থেকে ব্রিটিশদের প্রত্যাবর্তনের দাবী জানান। এ ঘটনাটি মিশরের সাধারণ আইন সভায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় এবং সেখানে জোরালো দাবী উঠে যে, বন্দীকৃত দিনসাওয়াই গ্রামের নিরপরাধ গ্রামবাসীদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক। [দ্র. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব*, (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, আগস্ট ২০১০ খ্রি.), তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪১৫-৪১৬।]

৫৬ হাফিজ ইব্রাহীম, *দিওয়ানু হাফিজ ইব্রাহীম* (কায়রো: ১৯৫৪ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২০।

৫৭ আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *তা'রীখ আল-আদাব আল-'আরাবি* (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ্, ১৯৯৫ খ্রি., ২৬ তম সং.), পৃ. ৫০৬।

(٤) فوا لهفي! والقبر بيني و بينه علي نظرة من تكلم النظرات

(٥) وقفت عليه حاسر الرأس خاشعا كأني حيال القبر في عرفات

(٦) لقد جهلوا قدر الإمام فأودعوا تجاليده في موحش بفلاة

(٧) ولو ضرحوا بالمسجدين لأنزلوا بخير بقاع الأرض خير رفات

(٨) تباركت هذا الدين دين محمد أيترك في الدنيا بغير حماة

(٩) تباركت هذا عالم الشرق قد قضي ولانت قناة الدين للغمزات

(١٠) زرعت لنا زرعا فأخرج شطأه وبنت ولما نجتن الثمرات

(١١) فواها له ألا يصيب موفقا يشارفه والأرض غير موات

(١٢) مددنا إلي الأعلام بعدك راحنا فردت إلي أعطافنا صفرات

(١٣)وجالت بنا تبغي سواك عيوننا فعدن وآثرن العمي شرقات

(١٤) وآذوك في ذات الإله و أنكروا مكانك حتي سودوا الصفحات

(١٥) رأيت الأذي في جانب الله لذة ورحت و لم تهمم له بشكاة

(١٦) لقد كنت فيهم كوكبا في غواهب و معرفة في أنفس نكرات

(١٧) أبنت لنا التنزيل حكما وحكمة وفرقت بين النور والظلمات

(١٨) ووفقت بين الدين والعلم والحجي فأطلعت نورا من ثلاث جهات

(١٩) وقفت ل"هانوتو" و "ربنان" وفقة أمدك فيها الروح بالنفحات

(٢٠) وخفت مقام الله في كل موقف فخافك أهل الشك والنزعات

(٢١) و كم لك في إغفاءة الفجر يقظة نقضت عليها لذة الهجعات

(٢٢) ووليت شطر البيت وجهك خاليا تناجي إله البيت في الخلوات

(٢٣) و كم ليلة عاندت في جوفها الكري ونهت فيها صادق العزمات

(٢٤) وأرصدت للباغي علي دين أحمد شباة يراع ساحرا النفثات

(٢٥) إذا مس خد الطرس فاض جبينه بأسطار نورا باهر اللمعات

(٢٦) كأن قرار الكهرباء بشقه يريك سناه أيسر اللمسات

(٢٧) فياسنة مرت بأعواد نعشه لأنت علينا أشأم السنوات

(٢٨) حطمت لنا سيفا و عطلت منبرا وأذويت روضا ناضرالزهرات

(٢٩) وأطفأت نبراسا وأشعلت أنفسا علي جمرات الحزن منطويات

(٣٠) رأي في لياليك المنجم ما رأي فأنذرنا بالويل والعثرات

(٣١) ونبأه علم النجوم بحادث تبيت له الأبراج مضطربات

(٣٢) رمي السرطان الليث و الليث خادر ورب ضعيف نافذ الرميات

(٣٣) فأودي به ختالا فمال إلي الثري ومالت له الأجرام منحرفات

(٣٤) وشاعت تعازي الشهب باللمح بينها عن النير الهوي إلي الفلوات

(٣٥) مشي نعشه يختال عجبا بربه ويخطر بين اللمس والقبلات

(٣٦ تكاد الدموع الجريات تقله وتدفعه الأنفس مستعرات

(٣٧) بكي الشرق فارتجت له الأرض رجة و ضاقت عيون الكون بالعبرات

(٣٨) ففي الهند المحزون و في الصين جازع و في مصر باك دائم الحسرات

(٣٩) وفي الشام المفجوع و في الفرس نادب و في تونس ما شئت من زفرات

(٤٠) بكي عالم الإسلام عالم عصره سراج الدياجي هادم الشبهات

(٤١) ملاذ عياييل ثمال أرامال غياث ذوي عدم إمام هداة

(٤٢) فلا تنصبوا للناس تمثال عبده وإن كان ذكري حكمة و ثبات

(٤٣) فإني لأخشي أن يضلوا فيؤمئوا إلي نور هذا الوجه بالسجدات

(٤٤) فياويح للشوري إذا جد جدها وطاشت بها الآراء مشتجرات

(٤٥) وياويح للفتيا إذا قيل من لها؟ وياويح للخيرات والصدقات

(٤٦) بكينا علي فرد وإن بكاءنا علي أنفس لله منقطعات

(٤٧) تعهدها فضل الإمام وحاطها بإحسانها والدهر غير مواتي

(٤٨) فيا منزلا في عين شمس أظلني وأرغم حسادي وغم عداتي

(٤٩) دعائمه التقوي وأساسه الهدي وفيه الأيادي موضع اللبنات

(٥٠)عليك سلام الله ما لك موحشا عبوس المغاني مقفر العرصات

(٥١) لقد كنت مقصود الجوانب آهلا تطوف بك الآمال مبتهلات

(٥٢) مثبة أرزاق ومهبط حكمة ومطلع أنوار وكنز عظات

কবিতার অর্থ:

১) মুহাম্মদের (মুহাম্মদ 'আব্দুহ্ এর) মৃত্যুর পর ইসলাম নিরাপদ থাকুক। তাঁর সুন্দর আলোকিত দিনগুলো নিরাপদ থাকুক।

২) দ্বীন-দুনিয়া,জ্ঞান-বিজ্ঞান,সৎকর্ম, খোদাভীতি ও কল্যাণসমূহ সুরক্ষিত থাকুক।

৩) তাঁর (মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর) মৃত্যুর পূর্বে স্বাভাবিক মৃত্যুকেও আমি ভয় করতাম; অথচ এখন আমি আমার জীবন প্রলম্বিতহওয়াকে ভয় পাই।

৪) তোমাদের সেই দৃষ্টিপাতসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ দৃষ্টির জন্য আমার খুব দুঃখ হয়,যখন আমার ও তাঁর মধ্যে ব্যবধান কেবল তাঁর কবর।

৫) আমি তাঁর সমাধির পাশে খালি মাথায় বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়েছি; যেন সমাধির সামনে আমি 'আরাফাতের মাঠে দাঁড়িয়েছি।

৬) তারা (মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর দাফনকারীগণ) নেতার যথার্থ মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল; তাই তাঁর লাশ তারা নির্জন প্রান্তরে সমাহিত করেছে।

৭) তারা যদি দুটি মসজিদের কোনো একটির নিকটে তাঁর জন্য সমাধিস্থলনির্ধারণ করত, তাহলে তারা শ্রেষ্ঠ ভূমিতেই সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে সমাধিস্থ করতে পারত।

৮) তুমি গৌরবান্বিত! মুহাম্মদ (সা.) এর এ জীবনবিধান কি পৃথিবীতে রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যতিতই পরিত্যক্ত থাকবে?

৯) তুমি গৌরবান্বিত! প্রাচ্যের এই মহাজ্ঞানীর তিরোধান হয়েছে। তাই কটাক্ষের বিরুদ্ধে দ্বীনের বর্শাও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

১০) তুমি আমাদের জন্য একটি চারা গাছ রোপণ করেছিলে। এটি তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল, কিন্তু আমরা এর ফল ভোগ না করতেই তুমি চলে গেলে।

১১) বড়ই আক্ষেপ! সেই চারা গাছটির জন্য; কেননা এটি তার পরিচর্যার জন্য কোনো সুযোগ্য ব্যক্তিকে পাচ্ছে না, অথচ জমি (যথেষ্ট) উর্বর।

১২) তোমার (মৃত্যুর) পর (নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য) আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমাদের হাত সম্প্রসারিত করেছিলাম, কিন্তু আমাদের স্কন্ধের দিকে তা শূন্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৩) আমাদের দৃষ্টিগুলো তোমার বিকল্পের সন্ধানে আমাদেরকে নিয়ে অনেক ঘোরাফেরা করছিল। অবশেষে (ব্যর্থ হয়ে) ফিরে এসেছে এবং ক্রন্দন করতে করতে লাল হয়েঅন্ধত্বকে বরণ করে নিয়েছে।

১৪) তারা (বিরুদ্ধবাদীরা) সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে এবং তোমার যথার্থ মর্যাদাকে অস্বীকার করেছে; এমনকি (পত্র-পত্রিকায় তোমার বিরুদ্ধে লেখালেখি করে) পৃষ্ঠাসমূহ কালো করে ফেলেছে।

১৫) (কিন্তু) আল্লাহর পথে কষ্টকে তুমি সানন্দে গ্রহণ করে নিয়েছ এবং এর জন্য কোনো অভিযোগ না করেই তুমি (পরকালে) প্রস্থান করেছ।

১৬) তাদের মধ্যে তুমি ছিলে অনেক অন্ধকারের মাঝে একটি নক্ষত্র সদৃশ এবং অপরিচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব।

১৭) জীবন বিধান ও বিজ্ঞানরূপে তুমি আমাদের কাছে অবতীর্ণ গ্রন্থের (আল- কোরআনের) ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলে এবং আলো ও আধাঁরের মধ্যকার একটি পার্থক্য নির্ণয় করেছিলে।

১৮) তুমি ধর্ম, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলে এবং তিন দিক থেকে এক (বিশেষ) আলোর উদয় ঘটিয়েছিলে।

১৯) তুমি (ইসলামের বিরূপ সমালোচক ফরাসি ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ ও বৈজ্ঞানিক) হানূতু ও (দার্শনিক) রেনানকে শক্তভাবে থামিয়ে দিয়েছিলে। এ কাজে জিব্রাইল (আ.) অনুপ্রেরণা যুগিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছিলেন।

২০) প্রতিটি স্থলে তুমি আল্লাহর উপস্থিতিকে ভয় করেছো। তাই সংশয়বাদীরা ও কুমন্ত্রণা দানকারীরা তোমাকে ভয় করেছে।

২১) তুমি কতো প্রভাতের নিদ্রাকালে জাগ্রত থেকে নিদ্রাসুখ ভঙ্গ করেছো।

২২) আর (কতোদিন) কা'বাঘরের প্রভুর সাথে নিভৃতে কথা বলার জন্য একাগ্রভাবে কা'বার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়েছো।

২৩) আর কতো রাতের গভীরে তুমি নিদ্রার সাথে বিদ্রোহ করেছো এবং সত্য সংকল্পগুলোকে জাগ্রত রেখেছো।

২৪) আর আহমাদের (সা.) দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণকারীদের প্রতি লেখার একটি যাদুকরী কলমের নিব তুমি প্রস্তুত রেখেছো।

২৫) (তোমার) কলমটি যখন পৃষ্ঠার পার্শ্বদেশ স্পর্শ করত,তখন উজ্জ্বল ঝলকবিশিষ্ট আলোর সারিতে এর ললাট কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যেতো।

২৬) নিবের ফাটলে যেন বিদ্যুতের অবস্থান; আলতো ছোয়া তোমাকে তার ঝলক প্রদর্শন করে।

২৭) হে সেই বছর! যা তাঁর (মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর) শবযানের পার্শ্ব দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল, আমাদের জন্য তুমি সবচেয়ে অশুভ বছর।

২৮) তুমি আমাদের একটি তরবারি ভেঙ্গে দিয়েছ; একটি মঞ্চ শূন্য করে দিয়েছ এবং পুষ্পশোভিত একটি উদ্যান শুষ্ক করে দিয়েছ।

২৯) তুমি আমাদের একটি প্রদীপ নির্বাপিত করে দিয়েছ এবং মুসড়ে পড়া কতিপয় ব্যক্তিকে শোকের জ্বলন্ত অঙ্গারে দগ্ধ করেছ।

৩০) জ্যোতিষী তোমার রাতগুলোতে ভয়াবহতা দেখতে পেয়ে আমাদেরকে এর দুর্ঘটনা ও বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল।

৩১) জ্যোতিষশাস্ত্র তাকে (জ্যোতিষীকে) একটি দুর্ঘটনার পূর্বাভাস দিয়েছিল, যার জন্য রাশিচক্র অস্থিরতার সাথে রাত কাটিয়েছিল।

৩২) কর্কট সিংহকে তীর ছুঁড়ল যখন সিংহ তার আস্তানায় (গুহায়) লুকিয়ে ছিল। অনেক সময় দুর্বলের তীর নিক্ষেপও (অবস্থাভেদে) কার্যকর হতে পারে।

৩৩) কর্কট সিংহকে প্রতারণাছলে নিয়ে গেল (মেরে ফেলল)। সিংহ মাটির দিকে নেমে এল এবং আকাশমণ্ডল (আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র) তার দিকে নুয়ে পড়ল।

৩৪) তারকারা পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে মরুভূমির দিকে পতিত জ্যোতিষ্কটির জন্য একে অন্যকে সান্ত্বনা দিতে ছড়িয়ে পড়ল।

৩৫) স্বীয় আরোহীর জন্য গর্ব করতে করতে এবং (মানুষের) স্পর্শ ও চুম্বনের মধ্য দিয়ে দুলতে দুলতে তাঁর (মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর) শবযানটি সম্মুখে এগিয়ে চলল।

৩৬) যেন প্রবহমান অশ্রুমালা সেটি উপরের দিকে তুলে ধরছিল এবং শোকাভিভূত দগ্ধ নিশ্বাসসমূহ তা ঠেলে নিচ্ছিল।

৩৭) তাঁর ('আবদুহ্ এর) মৃত্যুতে প্রাচ্য কাঁদল এবং গোটা পৃথিবী দারুণভাবে কেঁপে উঠল আর সৃষ্টিকুলের দৃষ্টিসমূহ অশ্রু বিসর্জনে সংকোচিত হলো।

৩৮) তাঁর জন্য কেউ ভারতবর্ষে শোকাভিভূত, কেউ চীনে উদ্বিগ্ন, কেউ বা আবার মিশরে অবিরাম আফসোস নিয়ে ক্রন্দনরত।

৩৯) কেউ সিরিয়ায় ব্যথিত, কেউ পারস্যে বিলাপরত, আবার তিউনিশিয়ায় আছে যত চাও দীর্ঘশ্বাস।

৪০) ইসলামী বিশ্ব তার যুগের পণ্ডিত, অন্ধকারের প্রদীপ ও সংশয়ের মূলোৎপাটনকারীর শোকে ক্রন্দন করল।

৪১) ('আবদুহ্ ছিলেন) গরীব-দুঃখীর আশ্রয়, বিধবাদের তত্ত্বধায়ক, অভাবগ্রস্তদের সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শকদের নেতা।

৪২) তোমরা মানুষের জন্য 'আবদুহ্ এর প্রতিমূর্তি স্থাপন করো না; যদিও তা প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার স্মারক (হতে পারে)।

৪৩) কেননা আমার আশঙ্কা হয় যে, লোকেরা এতে পথভ্রষ্ট হবে এবং এই আলোকোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের প্রতি সিজদায় মাথাবনত করবে।

৪৪) আফসোস! পরামর্শসভার জন্য যখন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে মতামতসমূহ উপস্থাপিত হয়ে লক্ষ্যচ্যুত হয়।

৪৫) আফসোস! ফতোয়ার জন্য; যখন বলা হয়, কে আছে ফতোয়া দেয়ার? তদ্রূপ কল্যাণময় কাজসমূহ ও দান-দক্ষিণার জন্যও বড় আফসোস।

৪৬) যদিও আমরা কেঁদেছি একজন ব্যক্তির জন্য। (প্রকৃতপক্ষে) আমাদের ক্রন্দন ছিল আল্লাহর প্রতি নিবেদিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গের জন্য।

৪৭) নেতা (মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর) অনুগ্রহ তাদের তত্ত্বাবধান করেছিল এবং প্রতিকূল সময়ে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন।

৪৮) 'আইন শামসে' অবস্থিত হে সেই বাড়ি, যা আমাকে ছায়া দিয়েছিল, আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণকারীদের অবজ্ঞা করেছিল এবং আমার শত্রুদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে দিয়েছিলে।

৪৯) যার স্তম্ভসমূহ খোদাভীতি এবং ভিতসমূহ হচ্ছে সৎপথ প্রদর্শন। আর যার ইটের গাঁথুনিতে রয়েছে দান-দক্ষিণা।

৫০) তোমার ওপর আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি বর্ষিত হোক। তুমি নির্জন কেন? তোমার ঘরগুলোই বা কেন কঠোর? আর তোমার আঙ্গিনাগুলো কেনইবা জনশূন্য?

৫১) তুমি ছিলে সকল দিকের লক্ষ্যস্থল, জনাকীর্ণ। তোমাকে ঘিরে থাকত (সকলের) অনুনয়পূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা।

৫২) (তুমি ছিলে) জীবিকাসমূহের মিলনস্থল, প্রজ্ঞার অবতরণস্থল। আর আলোকমালার উদয়স্থল এবং উপদেশাবলির সংরক্ষণাগার।[৫৮]

৫৮ হাফিজ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪-১৪৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
‘আবদুহ্ এর শিক্ষা জীবন

মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর পূর্বে নিজ গৃহে একজন গৃহশিক্ষক ও ক্বারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। দশ বছর বয়সে কিশোর মুহাম্মদ ‘আবদুহ্কে লেখাপড়া শেখানোর পর একজন হাফিজের[৫৯] বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। ‘আরবের মুসলিম পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী শৈশবে ‘আবদুহ্ প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর পবিত্র কোরআন হিফজ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল বারো। পবিত্র কোরআন হিফজের পূণ্যময় এ কাজটি তিনি মাত্র দুই বছরে সম্পন্ন করেছিলেন; যা ছিল খুবই অস্বাভাবিক এবং তাঁর এ কাজটি এক অসাধারণ কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কেননা তিনি তাঁর শিক্ষকের কৃতিত্বের চেয়ে একটু বেশিই অর্জন করেছিলেন। সেই সময়ে এটিই ছিল শিক্ষার একমাত্র প্রথম পদক্ষেপ, যা মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ এর পিতা-মাতার সামাজিক অবস্থানের ন্যায় অন্যান্য বহু পরিবারের সন্তানের জন্য উন্মুক্ত ছিল; যদি সে সন্তান তার পড়াশোনা ঠিকভাবে চালিয়ে যায়।[৬০] পবিত্র কোরআন হিফজ করার পর ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য ‘আবদুহ্ তান্তায় গমন করেন।[৬১] ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে ‘আবদুহ্ের তেরো বছর বয়সে তাঁর বাবা তাঁকে তান্তার আহমাদি মসজিদে পাঠিয়েছিলেন। এ সময়টা ছিল নব-নির্মিত এক রেলপথের মাধ্যমে কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে তান্তার সংযুক্ত হওয়ার ঠিক অব্যাবহিত পরে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই তান্তা এই মসজিদটির জন্য বিখ্যাত ছিল, এটি মিশরের সর্বাধিক সম্মানিত সূফি-সাধক আহমদ আল-বাদাবির[৬২] সমাধির চারপাশে নির্মিত। উনিশ শতকের

---

৫৯ হাফিজ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যিনি স্মৃতিপটে পবিত্র কোরআনকে ধারণপূর্বক অনর্গল হুবহু তিলাওয়াত করতে সক্ষম। [মালুফ লুওয়াইস,*আল-মুনজিদ ফি আল-লুগাহ ওয়া আল-আ'লাম* (বৈরূত: আল-কাছুলিকিয়্যা, ২০০৯ খ্রি.), ح - ف - ظ মূলধাতু।]

৬০ Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muhammad ‘Abduh* (London: Oxford University Press, 1933), p. 85

৬১ হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখ আল-আদাব আল-‘আরাবি* (বৈরূত: আল-মাতবা'ত আল-বুসিরিয়্যা, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১০৫১।

৬২ আহমাদ আল-বাদাবী এর পূর্ণ নাম আহমাদ আল-বাদাবী সীদী। তিনি ছিলেন শত বছর ধরে পরিচিত মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক ও দরবেশ। এ মহান সাধক ছিলেন হযরত আলী (রা.) এর বংশধরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আফ্রিকার বেদুঈনদের ন্যায় মুখে অবকণ্ঠন করতে পারতেন বলে তাঁকে আল-বাদাবী বলা হতো। তিনি সাত রকম পঠন রীতিতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। তিনি শাফি'ঈ ফিক্হ নিয়ে অধ্যয়ন করেন। ১২ রবিউল আওয়াল ৬৭৫ হিজরি মোতাবেক ২৪ আগস্ট ১২৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। আহমাদ আল-বাদাবী ছিলেন একজন উঁচুস্তরের সাধক ও দরবেশ। [সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২২-২২৩।]

মাঝামাঝি সময়ে তান্তা দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে তুলা ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠে। ফলে এখানে নবাগতদের দ্বারা কয়েকটি ইউরোপীয় স্টাইলের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ শুরু করতে যাচ্ছিল; যাদেরকে তুলার চলতি বাজারের উঠতি দাম আকৃষ্ট করেছিল। তবে এই নবাগতরা ছিল গ্রিক খ্রিষ্টান। আর এ সকল বিদ্যালয়ে কোনো মুসলিম শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ছিলনা। কেননা তখন পর্যন্ত মুসলমানদের একটি মাত্র পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল; আর সেটি হলো আহমাদ আল-বাদাবির মসজিদের প্রাচীন বিদ্যালয়।[৬৩]

আল-আযহারের পরে তান্তার আহমাদি মসজিদ ছিল তৎকালীন মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ; যেখানে মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানর্জনের জন্য ছুটে আসত। 'আবদুহ্ সেখানে মাত্র আঠারো মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করার পর তিনি নিজেকে কিছুটা বুঝতে অক্ষম বলে মনে করেছিলেন। কারণ এখানে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যায় বাধ্য করা হতো। সেখানকার প্রাচীন ও গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতিতে হতোদ্যম হয়ে তিনি তান্তা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন এবং তিন মাসের জন্য তাঁর মামার সাথে বসবাস করলেন। কিন্তু তাঁর ভাই তাকে খুঁজে পেয়ে পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। কিছুটা পীড়াপীড়ির পর 'আবদুহ্ তাঁর গ্রামে ফিরে পুনরায় পড়াশোনা শুরু না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর ভাই ও পিতার সাথে নিজেকে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত করেন এবং ক্ষেত-খামারে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। কিন্তু তাঁর বিয়ের চল্লিশ দিন বা তারচেয়ে বেশি সময় পর তাঁর পিতা তাঁকে কৃষি কাজ থেকে নিবৃত্ত করে পুনরায় তান্তার জামি'য়া আহমাদিয়ায় প্রেরণের চিন্তা করেন। তাই ১৮৬৫ খ্রি. তিনি তাঁর এক নিকটবর্তী আত্মীয় সূফি দরবেশ খিদর এর সাহচর্যে তাসাউফ শিক্ষার জন্য 'আবদুহ্কে সোপর্দ করেন।[৬৪] এ সময়ে 'আবদুহ তাঁর পিতার খালু শাইখ খিদর[৬৫] এর সাক্ষাৎ লাভ করেন; যিনি ছিলেন একজন দরবেশ ব্যক্তি।

---

৬৩ Mark Sedwick, *Muhammad 'Abduh* (oxford: one world, 2010), p. 1-2

৬৪ ত্বাহির আল-ত্বানাহী, *মুযাক্কারাত আল-ইমাম মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: দার আল-হিলাল, ১৯৯৩খ্রি.), পৃ.২

৬৫ শাইখ খিদর: তিনি ছিলেন 'আবদুহ্ এর পিতার খালু ; যিনি একজন সাধক দরবেশ। তিনি পশ্চিম তারাবলুস সফর করেন। সেখানে তিনি সানূসী ত্বরীকার অনন্যএক বুযুর্গ সাধক সায়্যিদ মুহাম্মদ আল-মাদানীর নিকট থেকে মা'রিফাতের জ্ঞান লাভ করেন। শাইখ খিদর মা'রিফাতের জ্ঞান লাভ করত: শাযিলিয়্যা ত্বরীকার বাই'য়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি নিজ ত্বরীকার রীতি অনুযায়ী মুহাম্মদ 'আবদুহ্কে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি দারস দেন এবং তাঁকে এ শিক্ষা দেন যে, তিনি যেন সাধারণ মানুষ থেকে নিজেকে আলাদা মনে না করেন এবং তাদের সাথে সবসময় মিলেমিশে থাকেন। [মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *তারীখুল উসতাযিল ইমাম আশ-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: ১৯৩১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।]

সাধারণত যুবক বা তরুণরা খুব অনিচ্ছায় নিয়ম মেনে চলতে চায়। তানতার জামি'য়া[৬৬] আহমাদিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তরুণ 'আবদুহ্ পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়েন। তবুও দরবেশ খিদর ধৈর্য্যের সাথে দৃঢ়তা অবলম্বন করেন এবং কঠিন শব্দ ও অর্থের ব্যাখ্যা তিনি 'আবদুহ্ এর নিকট খুব সহজ ও সাবলীলভাবে সমাধানপূর্বক উপস্থাপন করেন। এভাবে তিনি 'আবদুহ্কে মৃদুভাবে পাঠের দিকে প্রত্যাবর্তন করান; যাতে করে তরুণ 'আবদুহ্ ধীরে ধীরে নিজেকে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে খুঁজে পায়।[৬৭]

শাইখ খিদর এর সাক্ষাৎ লাভ 'আবদুহ্ এর জীবনের মোড়কে ঘুরিয়ে দেয়। পুনরায় তিনি জ্ঞানার্জনের প্রতি উদগ্রিব হয়ে উঠেন। এ মহান সাধক দরবেশের সাহচর্যে 'আবদুহ্ এর মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়।[৬৮] তাঁর এ নিকট আত্মীয়ের সুপরামর্শে তিনি আবার মাদরাসায় পড়তে যান। ফলে 'আবদুহ্ তানতার জা'মিয়া আহমাদিয়াতে পুনরায় যোগদানপূর্বক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে নিজেকে যুক্ত করেন।

'আবদুহ্ এর শিক্ষকদের মধ্যে শাইখ খিদর তাঁকে জীবন-ঘনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। একই সাথে শারী'য়াতের জ্ঞানের পাশাপাশি যে, মা'রিফাত লব্ধ জ্ঞানেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে বিষয়ে তিনি তাঁকে দিকনির্দেশনা দেন। আল-আযহারে অধ্যয়নকালীন প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষ শেষে 'আবদুহ্ মহল্লাত নাসর এ শাইখ খিদর এর সাথে দু'মাস সময় কাটাতেন। এ সময় খিদর তাঁর নিকট জানতে চাইতেন যে, এ বছর তিনি কী কী অধ্যয়ন করেছেন। যাতে করে তাঁরা পাঠ্য বিষয়গুলি একসাথে পুনরালোচনা ও পুনরায় পরীক্ষা করে নিতে পারে এবং পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করতে পারে। এ দরবেশ 'আবদুহ্কে বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং তৎকালীন আযহারে অপঠিত ও অজানা এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত

---

৬৬ জামি'য়া (**جامعة**): ১৯০৬ খ্রি. মিশরে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, নেতা ও সমাজ সংস্কারক একটি মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছিলেন। ১৯০৬ সালের ১২ অক্টোবর তারিখে উক্ত নেতৃবৃন্দের একটি দল; তন্মধ্যে বিশেষ করে কাসিম আমিন একটি মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে বেশি তৎপর ছিলেন। এ সময়ে সকলে মিলে সা'দ যাগলুল এর বাড়ীতে একত্রিত হন এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কমিটি গঠন করা হয়। মিশরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মিশরীয় জনগণের নিকট অনুদান আহবান করা হয়। কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হবে আল-জামি'য়া আল-মিশরিয়্যা। তখন থেকে 'আরব দেশসমূহে বিশ্ববিদ্যালয় বুঝাতে জামি'য়া শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। [আহমাদ আবদুল-ফাত্তাহ বদীর, *আল-আমীর ফু'আদ ওয়া নাশআত জামি'য়াতিল মিশরিয়্যাহ্*, (কায়রো: ১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৬)।

৬৭ মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, *আল-'আমাল আল-কামিলাহ্ লি আল-ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: দার আল-সুরক্, ১৯৯৩ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪-৩২৫।

৬৮ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

করেছিলেন। তরুণ 'আবদুহ্ও এ বিষয়ে যথেষ্ট ইচ্ছুক ছিলেন এবং তা করার উপায়গুলো সন্ধান করছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে দ্বিতীয় যে মহান ব্যক্তির সাক্ষাৎ 'আবদুহ্ এর জীবনে ঘটে তিনি ছিলেন শাইখ হাসান আত্ব-তাবীল। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি দর্শন ও জ্যামিতি শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষার আসর মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর জ্ঞান অর্জনের স্পৃহাকে আরও বহুগুণেবৃদ্ধি করে দেয়।[৬৯] আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনে তাঁর দিকনির্দেশনামূলক শিক্ষা 'আবদুহ্ এর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে; বিশেষ করে জ্যামিতি ও দর্শনশাস্ত্রে। একইভাবে তিনি 'আবদুহ্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন এবং তাকে শিখিয়ে দেন যে, সাহসিকতার সাথে কীভাবে বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করতে হয়।

অতঃপর ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিশ্ব বিখ্যাত মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্র জামে আল-আযহারে ভর্তি হন। আল-আযহারে তিনি ১৮৭৭ খ্রি. পর্যন্ত অবস্থান করেন।[৭০] সেখানে তিনি 'ইলমুল কালাম,[৭১] তাফসির,[৭২] হাদিস,[৭৩] ফিক্হ,[৭৪] উসূল,[৭৫] ইতিহাস,[৭৬] দর্শন[৭৭] ও তাসাওউফ[৭৮] শাস্ত্র

---

৬৯ আহমাদ আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯১।

৭০ Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age*(Great Britain: Oxford University Press, 1962), p. 131

৭১ 'ইলমুল-কালাম: 'ইলমুল-কালাম ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলামী বিশুদ্ধ আকীদাসমূহ যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিতকরণ এবং এর সাথে বিরোধপূর্ণ মতবাদের প্রতিবাদ ও প্রাত্যাখ্যান করা। আল-ফারাবী 'ইলমুল কালামকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা হিসেবে গণ্য করেন; যা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে যেখানে সে শারী'য়াতে বর্ণিত আকীদাসমূহকে সত্য বলে প্রমাণ করতে এবং এর বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে সমর্থ হয়। 'ইলমুল-কালাম সম্পর্কে এটাও বলা যেতে পারে যে, এটি ইসলামী জ্ঞানের এমন এক শাখা; যা দ্বীনিয়াত ও দর্শনের মাঝামাঝি অবস্থান করে। তাছাড়া এটি জ্ঞান ও চিন্তার সমন্বয়ে গঠিত পরস্পরবিরোধী এমন এক পদ্ধতি যা ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সেতুবন্ধন সরূপ। ইসলামী জ্ঞানের এই শাখাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে দর্শনভিত্তিক দ্বীনিয়াত কিংবা ধর্মীয় দর্শন নামে অভিহিত করা যায়। [সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২।]

৭২ তাফসির (**تفسير**): তাফসির শব্দটি একবচন, বহুবচনে তাফাসির। তাফসির অর্থ ব্যাখ্যা, ভাষ্য ইত্যাদি। এটি আরবি 'শার্হ' শব্দের সমার্থক। তাফসির শব্দটি বৈজ্ঞানিক ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক রচনাবলির ভাষ্যসমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এরিস্টোটল এর রচনাবলির গ্রীক ও আরবি ভাষ্যসমূহের ক্ষেত্রে শব্দটি সচরাচর ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ইসলাম ধর্মে তাফসির শব্দটি বিশেষত পবিত্র কোরআন এর ভাষ্য এবং এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞানের এ শাখাটি যা **علم القران والتفسير** অর্থাৎ কোরআন ও এর ভাষ্য সম্পর্কীয় বিজ্ঞান নামে অভিহিত। এটি হাদিছ শাস্ত্রের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সাধারণত মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এ শাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হয়। [সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪ খ্রি.), ১২শ খণ্ড,পৃ. ১৯৩-১৯৪।]

৭৩ 'হাদিস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, বাণী, কথা, নতুন, সংবাদ, খবর ইত্যাদি। আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলভী (র.) বলেন: অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, হাদিস বলতে রাসূল (সা.) এর মুখনিঃসৃত বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে বুঝায়। অনুরুপভাবে সাহাবিদের কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবিঈর কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদিস হিসেবে অভিহিত করা হয়। [ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান আল-মু'জামুল*

ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি আল-আযহারেও তান্তার অনুরূপ পরিস্থিতি দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থায়

ওয়াফী (ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৩১; আবদুল হক দিহলভী, *আল মুকাদ্দামাতু লি মিশকাত আল-মাসাবীহ্* (ইন্ডিয়া: দিল্লি, রাশিদিয়া কুতুবখানা, তা.বি.]

৭৪ ফিক্হ (**فقه**): ফিক্হ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, কোনো বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করা ইত্যাদি। ইবনু আছীর এর মতে ফিক্হ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তুকে চিবিয়ে ফেলা কিংবা কোনো বস্তুকে উন্মুক্ত করা। ইমাম রাগিব এর মতে উপস্থিত জ্ঞানের মাধ্যমে অনুপস্থিত জ্ঞান অর্জন করার নামই হচ্ছে ফিক্হ। ফিক্হ শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো শারী'য়াত সম্পর্কিত জ্ঞান, শারী'য়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান। ইসলামী পরিভাষায়, গবেষণার সাহায্যে শারী'য়াতের বিধি-বিধানগুলি এর উৎস হতে বের করা করার নামই হচ্ছে ফিক্হ। । [সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.), ১৫শ খণ্ড,পৃ. ৬৯ ।]

৭৫ উসূল (**أصول**) : উসূল অর্থ মূলসমূহ, মূলনীতিসমূহ ইত্যাদি। শব্দটি বিভিন্ন পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত ইসলামী শিক্ষার তিনটি শাখায় এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা: উসূল আল-দীন, উসূল আল-হাদিছ এবং উসূল আল-ফিক্হ। উসূল আল-দীন কালাম এর সমার্থক। উসূল আল-হাদিছ বলতে হাদিছ শাস্ত্রের পদ্ধতি এবং পরিভাষার ব্যবহারকে বুঝায়। উসূল আল-ফিক্হ বলতে মুসলিম আইন শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহের দর্শনকে বুঝায়। [সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৭ ।]

৭৬ **ইতিহাস:** ইতিহাস হচ্ছে অতীতের ইতিবৃত্ত। ইতিহাসকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, প্রাচীন ইতিহাস (মানব-সভ্যতার প্রথম থেকে ৪৭৬ সালে রোম নগরীর পতনের সময় পর্যন্ত), মধ্যযুগের ইতিহাস (রোম নগরীর পতন থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত) এবং আধুনিক ইতিহাস (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)। গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসকেই (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৪-৪২৪) ইতিহাসের জনক বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইতিহাস বলতে বোঝাত রাজারাজড়াদের কাহিনীকেই, তাও প্রধানত যুদ্ধের আর জয়-পরাজয়ের কাহিনীকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটেনের এডওয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-১৭৯৪) এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫ খ্রি.-১৮৮৬ খ্রি.) রাজরাজড়াদের কাহিনীর পাশাপাশি সমকালীন রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদিকেও ইতিহাসের বিষয়ভুক্ত করেন। তাঁরা এটা দেখানোর প্রয়াস পান যে, সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো ঘটনা আদৌ ঘটতে পারে না। এজন্য তাঁদেরকে বলা হয় আধুনিক ইতিহাসের জনক। কার্লমার্কসের মতে, মানুষের সমগ্র ইতিহাসই হলো মূলত শ্রেণিসংগ্রামের; শাসক এবং শোষিতের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১]

৭৭ 'দর্শন' যাকে ইংরেজিতে 'Philosophy' বলা হয়। 'Philosophy' শব্দটি গ্রিক শব্দ হতে উদগত। গ্রিক 'ফিলোসোফিয়া' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞানানুরাগ। গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস এ শব্দটির প্রচলন করেন। সক্রেটিস বিনায়বশত নিজেকে জ্ঞানী (Sophist) না বলে জ্ঞানানুরাগী বলে অভিহিত করতেন। পূর্বে 'Philosophy' বলতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যসহ সকল বিদ্যাকেই বোঝাত। তখন এর প্রধান তিনটি দিক ছিল। যথা: ১. প্রাথমিক দর্শন। ২. নৈতিক দর্শন। ৩. আধ্যাত্মিক দর্শন। দর্শনশাস্ত্রের পরিধিকে প্লেটো কিছুটা এবং অ্যারিস্টটল আরও কিছুটা সীমাবদ্ধ করে দেন। অ্যারিস্টটল দর্শনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন। যথা: নীতিশাস্ত্র (Ethics), তর্কশাস্ত্র (Logic), বিজ্ঞান (Science) ইত্যাদি। অধিবিদ্যাকেই (Metaphysics) তিনি 'প্রথম দর্শন' বলে অভিহিত করেন। হবসের মতে, কারণ থেকে কাজে এবং কাজ থেকে কারণে পৌঁছানোর নামই দর্শন। দর্শনের বর্তমান সংজ্ঞা হলো, যে তত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো বিষয়ের মূল সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তাই-ই দর্শন। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০]

৭৮ তাসাওউফ (**تصوف**) : তাসাওউফ শব্দটি ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থ পশম, উল ইত্যাদি।তাসাওউফ শব্দটি পশমী পোশাক পরিধান করা অর্থাৎ প্রকাশ করে। সুতরাং সূফী হয়ে সূফী-দরবেশের ন্যায় মোটাসোটা পশমী পোশাক পরিধান এবং নিজেকে কৃচ্ছতাপূর্ণ সূফীবাদী জীবন যাপনের জন্য নিবেদিত করাকে ইসলামী পভিাষায় তাসাওউফবলা হয়। সংক্ষেপে এর অর্থ নিজেকে সূফীবাদী জীবনের জন্য সমর্পিত করা। [সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪ খ্রি.), ১২শ খণ্ড, পৃ.৩৯৭ ।]

সন্তুষ্ট ছিলেন না। কেননা তা ছিল কঠোর ও ধরা-বাঁধা নিয়মে আবদ্ধ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো পাঠ্য বিষয়গুলো কেবল গোঁড়া ধর্মতত্ত্বের শাস্ত্রীয় 'আরবি রচনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল; যেখানে যুক্তি-প্রমাণ ব্যতিরেকেই অধিকাংশ পাঠ্য বিষয়কে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করা হতো। পাঠ্যপুস্তকের এক চিরায়ত বৃত্তের মধ্যে ছিল সেখানকার পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া, যা শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম ছিলনা। তাই 'আবদুহ্ এর কাছে আল-আযহারের পরিবেশও মনঃপুত হয়নি।

আল-আযহারের তৎকালীন শিক্ষা পদ্ধতি ছিল নিষ্প্রাণ ও গতিহীন। নিয়মিত রুটিন ক্লাস ও শিক্ষক মহাদোয়ের গতানুগতি বক্তৃতা প্রদান অনেকটা এমনই ছিল যে, তৎকালীন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচিতে প্রাণের স্পন্দন ছিল প্রায়ই অনুপস্থিত। শ্রেণিকক্ষে কেবল পাঠ্যবইয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতো, ব্যাখ্যার টীকা প্রদান করা হতোএবং টীকা-টিপ্পনীর বক্তৃতা হতো। এ শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ কেবল ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ও শাব্দিক বর্ণনার উপর নিবদ্ধ ছিল। এখানকার পাঠ্যসূচিতে ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান বিষয়ের ন্যূনতম কোনো অন্তর্ভুক্তি ছিলনা।[৭৯]

'আবদুহ্ যখন আল-আযহারে পদার্পণ করলেন সে সময় আযহার দুটি দলে বিভক্ত ছিল; একটি ছিল অতি রক্ষণশীল আর অন্যটির ছিল সূফিবাদের প্রতি ঝোঁক। 'আবদুহ্ দ্বিতীয়টির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এ সময় তিনি তাসাউফের দিকে বেশি ঝোঁকে পরেন। এমনকি সূফিদের মতো আলখেল্লা পরে তিনি সংসার-বিরাগী হয়ে পড়েন। তাঁর জীবনের এহেন যুগসন্ধিক্ষণে ১৮৬৯ খ্রি./১৩৮৬ হি. সালে তিনি শাইখ জামাল উদ্দীন আফগানীর সংস্পর্শে আসেন। কায়রোতে আফগানীর সাথে 'আবদুহ্র প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। মিশরে আফগানীর প্রথম সফর ছিল সংক্ষিপ্ত। পরবর্তীতে ১৮৭১ খ্রি.পুনরায় তিনি মিশরে আগমন করেন এবং ১৮৭৯ খ্রি.পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।[৮০] ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের মিশর সফর ছিল আফগানীর জন্য এ দেশে দ্বিতীয় সফর। এ সময় 'আবদুহ্ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলেন; আল-আযহারে থাকাকালীন 'আবদুহ্ জামাল উদ্দীন আফগানীর সাথে সাক্ষাত করেন। সেখানে তিনি আফগানীর অধিকতর নিকটবর্তী

৭৯ আহমাদ আমীন, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৮৫।

৮০ মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪-৩২৫।

হন। 'আবদুহ্ ১৮৭১ খ্রি. থেকে ১৮৭৯ খ্রি.পর্যন্ত তাঁর একজন ছাত্র ছিলেন। আফগানী আল-আযহারে বহু প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করেছিলেন; কিন্তু মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন ব্যতিক্রম। 'আবদুহ্ ছিলেন তাঁর প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠতম।

আফগানী ইতিমধ্যে ইসলামী মনন সমৃদ্ধ গণ-মানুষের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মুক্তির এ মহান প্রবক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি 'আবদুহ্ এর বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তিবাদী মন ও আবেগকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। আফগানীর সাহচর্য 'আবদুহ্ এর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার বিকাশকে আরও শাণিত করেছিল। তিনি 'আবদুহ্কে এক বিশেষ শিক্ষা উপহার দিয়েছিলেন; তা হলো জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধ এবং অন্ধ অনুকরণ বিরোধী তীব্র চেতনাবোধ। আফগানী তাঁর সামনে ইসলামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগ-সমস্যার ইসলামী সমাধানের সঠিক পথ ও পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। এমনকি তাঁকে সাংবাদিকতাসহ লেখালেখির আধুনিক স্টাইল, বক্তৃতা-ভাষণের সম্মোহনী কৌশল ইত্যাদি শিখিয়ে দেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
'আবদুহ্ এর কর্মজীবন

ছাত্র জীবন শেষে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মিশরের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ আল-আযহার হতে অধ্যাপনার সনদ অর্জন করেন। আল-আযহারে অধ্যাপনার মধ্য দিয়েই শুরু হয় তাঁর শিক্ষকতা জীবন। শুরুর দিকে সেখানে তিনি ছাত্রদের যুক্তিবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও একত্ববাদের শিক্ষা দেন। অধিকতর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বহু শিক্ষার্থী তাঁর বাসস্থান ঘিরে ইবন মিসকাওয়াহ্ এর 'তাহযীব আল-আখলাক' গ্রন্থের দারস গ্রহণ করে। তাছাড়া জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীকে তিনি ফরাসি লেখক ও মন্ত্রী গুইজট (Guizot) লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ তামাদ্দুন-ই-ইউরোপ এর 'আরবি অনুবাদ পাঠ দান করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি একজন সুপ িত হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ দার আল-'উলূম মিশরিয়্যায় ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন; একই সাথে খেদিভ স্কুল অব ল্যাংগুয়েজে তিনি 'আরবি শিক্ষা দিতেন। নতুন প্রতিষ্ঠিত দার আল-'উলূম মিশরিয়্যা নামক এ বিদ্যাপীঠটি আল-আযহারের সাথে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল; যা ১৮৭২ খ্রি. আলি পাশা মোবারক কর্তৃক স্থাপিত।[৮১] সেখানে তিনি ইবন খালদুনের[৮২] মুকাদ্দিমার পাঠ দান করেন এবং ছাত্রদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-উপজাতি ও নৃ-গোষ্ঠীর উত্থান-পতনের ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে ছাত্রদের বোধ শক্তিকে জাগিয়ে তুলেন। এ সময় তিনি ইতিহাস পঠন-পাঠনে বিপ- ব আনয়ন করেন। এই সময়ে তিনি মাদরাসাতুস্ সুন্নায় 'আরবি ভাষা ও সাহিত্যের একজন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি সেখানে ছাত্রদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক শিক্ষা ও ধারণা প্রদান ছাড়াও

---

৮১ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

৮২ **ইবন খালদূন:** ১ রামাদান,৭৩২ হি./২৭ মে, ১৩৩২ খ্রি. ইবন খালদূন তিউনিসের এক আরব পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিশেষত আল-আবিলীর তত্ত্বাবধানে দর্শন ও 'আরব-মুসলিম চিন্তাধারার মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। তিনি ছিলেন পথচারী এক ফাকীহ্ যিনি শেষ পর্যন্ত একজন প্রতিভাবান ঐতিহাসিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন, এমনকি তিনি বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার প্রতিষ্ঠা করেন যেগুলি আধুনিককালের মানবীয় বিষয়াবলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হয়ে উঠে। তাঁর প্রধান রচনা 'মুকাদ্দিমা' বিশ্বজনীন মূল্যের দাবীদার। তিনি মুকাদ্দিমায় সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিষয়াবলীকে কেন্দ্রীভূত করেন। তাঁর অভিমত ও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে অবক্ষয় ও পতনের হেতুতত্ত্ব অর্থাৎ তিনি মানব সভ্যতার বিপর্যের ঐ সকল কারণ উদঘাটন করতে সমর্থ হন, যা মানব জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে। [Allen J. Fromherz, *Ibn Khaldun, Life and Times* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010): 42-43; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ১৯৮৬ খ্রি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭১, ২৭৫-২৭৭; ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৩-৫।]

তাদের মধ্যে উন্নত রুচিবোধ গঠনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। পাঠদানের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও দর্শন থেকে ছাত্রদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তাছাড়া 'আবদুহ্ ভাষা ও প্রশাসন বিদ্যালয় মাদরাসাতু আল-লিসান ওয়া আল-ইদারাতে 'আরবি শিক্ষা দিতেন।[৮৩] তিনি ছাত্রদেরকে এমন পদ্ধতিতে প্রবন্ধ রচনার কৌশল ও লেখনির প্রশিক্ষণ প্রদান করেন; যাতে করে মিশরীয় যুব সমাজ 'আরবি ভাষা ও ইসলামী শিক্ষায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে মিশরের শাসন ব্যবস্থার ভ্রান্তদিকগুলো সংশোধন করতে সক্ষম হয়।[৮৪] মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও গুণাবলির মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 'আরব বিশ্বে বিশেষ করে মিশরের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দারুল উলূম মাদরাসার অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করেন। সেখানে তিনি তাঁর উস্তাদ শাইখ জামাল উদ্দীন আফগানীর[৮৫] (১৮৩৮-১৮৯৭ খ্রি.) অনুসৃত পন্থায় ইবনে খালদুনের ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল একদল সংস্কারপন্থী বিপ্লবী তরুণ সমাজ তৈরি করা; যারা ঘুণে ধরা সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার এবং বিপ্লব সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আবদুহ্-এর অধ্যাপনা ও কার্যকলাপের লক্ষ্য শাসকমহলকে বিচলিত করে তোলে। তিনি দার"ল উলুমের অধ্যাপনা থেকে অপসারিত হন।

'হিযব আল-ওয়াতানি আল-হুরর্' নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠনে আফগানীর সম্পৃক্ততার কারণে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে মিশর থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। এ দলটির মূল লক্ষ্য ছিল মিশরীয়দের জন্য মিশর। গভীর জ্ঞান চর্চা ও ব্যাপক জ্ঞান বিতরণের মধ্য দিয়ে 'আবদুহ্ যখন তাঁর মূল্যবান সময় অতিবাহিত করছিলেন ঠিক এ বছরই মিশরের তৎকালীন খেদিভ রাফিক পাশা মুহাম্মদ 'আবদুহ্কে দারুল উলূম মিশরিয়্যার শিক্ষকতা থেকে বরখাস্ত করেন। আফগানীর

---

৮৩ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত।*

৮৪ *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪।

৮৫ জামালুদ্দীন আফগানী: সায়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানী (১২৫৪-১৩১৬ হি./১৮৩৭-১৮৯৮ খ্রি.) আফগানিস্তানের কাবুল জিলার আসআদাবাদে এক হানাফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন আফগানিস্তানে অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও বিভিন্ন ইসলামী বিদ্যায় পারদর্শী হন। তিনি تاريخ الأفغان ও رسالة رد على الدهريين নামে দুটি পুস্তক রচনা করেন। তিনি ১৮৭১ সালে মিশর গমন করেন ও সেখানে আট বছর অবস্থান করেন। পরবর্তীতে তিনি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সাথে প্যারিসে অবস্থান করেন। তখন তিনি العروة الوثقى নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকায় তিনি তাঁর সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। তিনি তুর্কী বাদশাহ সুলতান আবদুল হামিদের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে ইসতাম্বুলে আগমন করেন। সেখানে তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ বছর অতিবাহিত হয় এবং তিনি চিবুকে কোন একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন। [হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯-৪৪৩; জুরযী যায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৯।]

একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে এ সময় 'আবদুহ্‌কেও শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে তাঁর নিজ গ্রাম মহল্লাত নাসরে অবসর জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। 'আবদুহ্ চাকুরীচ্যুত হওয়ার পর তিনি নিজ গ্রামে অবস্থান করেন। তিনি সেখানে অন্তরীণ জীবন-যাপন শুরু করেন। তাঁর চাকুরিচ্যুতি ও অন্তরীণ হওয়ার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করা এবং তাঁর প্রগতিশীল ও প্রথাবিরোধী চিন্তাধারা।

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ পাশার মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে 'আবদুহ্‌কে ক্ষমা করা হয় এবং তাঁকে মিশরীয় সরকারের সরকারি গেজেট *'আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিশরিয়্যাহ্'* এর সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁর নিবন্ধসমূহ এবং সংস্কার সম্পর্কিত ধারণাগুলো ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের নবগঠিত 'উচ্চতর গণশিক্ষা পরিষদ' এর একজন সদস্য হিসেবে মনোনয়ন লাভের দিকে তাঁকে পরিচালিত করে।[৮৬] এসময় তিনি সংস্কারমূলক অসংখ্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ সরকারি মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের 'উরাবী বিদ্রোহে[৮৭] তাঁর দল যখন 'উরাবী পাশার পক্ষাবলম্বন করে তখন ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে মিশর থেকে নির্বাসন দেয়া হয়। আর এ বিদ্রোহের পরপরই ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে ব্রিটিশ দখলদারিত্বের আগমন ঘটে। এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করার অভিযোগে মুহাম্মদ 'আবদুহ্‌কে সর্বপ্রথম অভিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে তিন মাসের জন্য কারাবরণ করতে হয়।[৮৮] কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি বৈরূত ভ্রমণ করেন; এর পরপরই আফগানীর সাথে সাক্ষাৎ লাভের জন্য ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্যারিস গমন করেন। সেখানে তাঁর শিক্ষক শাইখ জামাল উদ্দীন আফগানীর সাথে পুনরায় সাক্ষাত ঘটে। ইসলামী সংস্কার ও ঐক্যের

---

৮৬ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড,পৃ. ১৪০-১৪১।

৮৭ 'উরাবী বিদ্রোহ: জনৈক কৃষকের পুত্র কর্নেল আহমদ 'আরাবী পাশা যিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন। 'উরাবী পাশা ১৮০০০ সৈন্যের নিযুক্তি দাবি করেন। তিনি "মিশর মিশরীদের জন্য" এ স্লোগান দেন এবং দেশবাসীদের কাছে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন। তিনি এশিয়ার অগ্নিপুরুষ জামাল উদ্দীন আফগানীর ভাবশিষ্য ছিলেন। ১৮৮২ সালের ১১ জুন আলেকজান্দ্রিয়া শহরে বিক্ষোভ দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়; তখন ইউরোপীয় ও তুর্কি দূতাবাস আক্রান্ত হয়। ব্রিটিশ এবার 'উরাবী পাশার বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে উঠে। ১৩ই সেপ্টেম্বর তেলুলকেবির নামক স্থানে কিছু অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকতায় 'উরাবী পাশা পরাজিত হয়ে ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হন। মিশরের জাতীয় আন্দোলনে প্রথম নেতৃত্ব দেন আহমাদ 'উরাবী পাশা। তাঁর এই জাতীয় আন্দোলনই ইতিহাসে 'উরাবী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। [মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.) ৩য় সংস্করণ,পৃ. ১৩৭।]

৮৮ মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭।

আহ্বান জানিয়ে তাঁরা সেখানে আল-'উরওয়াত আল-উসকা নামে একটি গোপন সমিতি গঠন করেন।[৮৯]

এ সময় উভয়ের সম্পাদনায় তাঁরা *আল-'উরওয়াতু আল-উসকা*[৯০] নামক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। এটি প্যারিসের ৬নং রুয়ে মারটেল হতে প্রকাশিত হতো। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মার্চ এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এটি প্রধানত: ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক পত্রিকা ছিল। জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান এবং পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্যবন্ধন প্রচার ছিল এই পত্রিকার মূলনীতি। এর প্রধান প্রচার ক্ষেত্র ছিল মিসর। বৈদেশিক রাজশক্তির অনুগত গোলাম তৎকালীন মিসরের খেদিব ভীত হয়ে মিসরে এর প্রচার বন্ধের উদ্দেশ্যে আইন জারী করেন যে, যার নিকট এ পত্রিকার কোন সংখ্যা পাওয়া যাবে তাকে অর্থদন্ড দিতে হবে। ব্রিটিশ বিরোধী হওয়ার ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার ভারতে এর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন।[৯১] পরিণামে আঠার সংখ্যা প্রকাশের পর এ পত্রিকার প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।[৯২] এ প্রকাশনাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তিউনিস ভ্রমণ করেন। তারপর ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিস ছেড়ে তিনি পুনরায় বৈরূতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি ইসলাম, খ্রিষ্টান ও ইহুদী ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সংঘ গঠনে যুক্ত হয়েছিলেন।

বৈরূত প্রত্যাবর্তনের পর 'আবদুহ্র প্রথম স্ত্রী পরোলোকগমন করায় সেখানে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করে একজন শিক্ষক হিসেবে খুব শান্তিপূর্ণভাবে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। তাঁর পান্ডিত্য,ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ এ অঞ্চলের সকলকে বিমোহিত করে। এ সময় তিনি বৈরূতে সুলতানিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসাবে হাদিসের পাঠ দান করেন। 'আবদুহ্ বৈরূতে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় অধ্যয়ন ও গবেষণার ন্যায় মূল্যবান কাজে সময় অতিবাহিত করেন। সুলতানিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বৈরূতের দু'টি মসজিদে পবিত্র কোরআন এর দারস দিতেন। 'আবদুহ্ এর নিজ আবাসস্থলে সব সময় জ্ঞানচর্চার আলোচনা

---

৮৯ *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৩।

৯০ আল-'উরওয়াতু আল-উসকা: পত্রিকাটির নাম *العروةالوثقىوالثورةالتحريريةالكبرى* পত্রিকাটি ১৩ মার্চ ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহকীক করেছেন সালাহুদ্দীন আল-বুসতানী। পরবর্তীতে পত্রিকাটিতে শাইখ মুহাম্মদ আবদুহ্ এবং সায়্যিদ জামাল উদ্দীন আফগানীর ছবিসহ প্রকাশ করা হয়। [*আল-'উরওয়াতু আল-উসকা* (মিসর : দার আল-'আরাব, জুলাই, ১৯০৭ খ্রি.) পৃ. ৭ ও ৯।]

৯১ অধ্যাপক মুহ: মনসুর উদ্দিন, জামাল উদ্দীন আফগানী, মাসিক মোহাম্মদী, ৩৯ বর্ষ ১৩ ও ১৪ সংখ্যা কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ বাংলা।

৯২ মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭।

সভায় মুসলিম ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের বহু অনুসারীগণ সমভাবে উপস্থিত থাকতেন।[৯৩] এ সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিসালাত আত-তাওহীদ' রচনার কাজ শুরু করেন।

'আবদুহ্ যখন বৈরূত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আল-আযহার এর 'রাওয়াক আব্বাসী' নামক ছাত্রাবাসে কিছুদিন ইমাম আবদুল কাছির আল-জুরজানীর বিখ্যাত গ্রন্থ '*দালাইল আল-ইজায ও আসার আল-বালাগা*' এর পাঠদান করেন।[৯৪]

শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি নিজেকে লেখালেখি ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত রাখেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি মিশরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিশরের সরকারি পত্রিকা *আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিশরিয়্যাহ্*[৯৫]এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে একই পত্রিকায় ১৮৮১ খ্রি. প্রধান সম্পাদক হিসেবে রাষ্ট্রীয় এ গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এ পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মদ আলী; যা তিনি ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে চালু করেন।

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন সরকার তাঁকে মিশর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করলে প্রথমেই তিনি ন্যাশনাল কোর্টের (জাতীয় আদালতের) বিচারক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন;[৯৬] যদিও তিনি পুনরায় শিক্ষকতায় থেকে পাঠদান শুরু করতে চেয়েছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনা মতে 'আবদুহ্কে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশর প্রত্যাবর্তনের সুযোগ প্রদান করা হয় এবং তাঁকে প্রাথমিক দেওয়ানী আদালতের একজন বিচারক নিযুক্ত করা হয়। ইতিমধ্যে তিনি চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন। চল্লিশোর্ধ বয়সে তিনি আবিদিন এর বিচারক ছিলেন।[৯৭] পরবর্তীকালে তিনি আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে তিনি ফরাসি ভাষা শেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; যেহেতু

---

৯৩ শাকিব আরসালান, *হাদির আল-'আলাম আল-ইসলামী*, ১ম খণ্ড, (কায়রো: ১৯৬৩হি.), পৃ. ২৮৩।

৯৪ আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ, আল-উসতায আল-ইমাম মুহাম্মদ আবদুহ্ (কায়রো: তা. বি.), পৃ. ২৬৭।

৯৫ আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিশরিয়্যাহ্: এটি একটি সাময়িকী। এতে বিস্তারিত প্রতিবেদন সম্বলিত দাপ্তরিক গেজেট, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা প্রকাশিত হতো; যা সারাদেশে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হতো। সামরিক-বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং শিক্ষিত শ্রেণির লোকদের মধ্যে তা চাঁদার মাধ্যমে ক্রয়ের ব্যাপারে সনির্বন্ধ আবেদন ছিল। রাষ্ট্রীয় স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে তা বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। সাময়িকীটি তুর্কী ও 'আরবি ভাষায় প্রকাশিত হতো। তাছাড়া শুরুর দিকে এটি কেবল একটি সাময়িকী ছিল; দৈনিক ছিল না। আর এমনটা খুব কমই দেখা যায় যে, এ সাময়িকীটি সপ্তাহে তিন বারের বেশি প্রকাশ পেয়েছে। [P.J. Vatikiotis, *The History of Egypt* (Great Britain: The Johns Hopking University Press, 1980), 2nd edition,p.99]

৯৬ P.J vatikiotis, *ibid*, p. 194

৯৭ Amin,Osman.*MuhammadAbduh* (Washington DC: American Council of Learned Societies, 1953), p. 74

তাঁর অনেক সহকর্মী বিচারকগণ আদালতে এ ভাষাটি ব্যবহার করতেন, তাই 'আবদুহ্ও ফরাসি আয়ত্ত করেন যাতে করে তাঁকে কোনো অসুবিধায় পড়তে না হয়। তিনি সচেতনভাবেই কোনো একটি ইউরোপীয় ভাষার জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কেননা তিনি এ বিষয়টি অবগত ছিলেন যে, কোনো একটি ইউরোপীয় ভাষার জ্ঞান তাঁকে তাঁর জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য আরও বেশি সক্ষম করে তুলবে। যেহেতু সমগ্র বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের স্বার্থগুলো বিশেষভাবে ইউরোপীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল, তাই এ জাতীয় একটি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি সর্বোত্তম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেন।[৯৮]

তিনি ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বখ্যাত বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নতুন খেদিভ আব্বাস হিলমিকে সম্মত করে আল-আযহারের জন্য একটি প্রশাসনিক পর্ষদ গঠনের অনুমতি পান। এবার তিনি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও প্রশাসনের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের যে স্বপ্ন তাঁর মধ্যে ছিল তা বাস্তবায়িত করার সুযোগ পান এবং তিনি বেশকিছু সংস্কার করতে সক্ষম হন। তাঁর উদারপন্থী শিক্ষানীতি সমাদৃত হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক ইতিহাস, গণিত, দর্শন প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করেন।

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে 'আবদুহ্ মিশরের প্রধান মুফতি নিযুক্ত হন। 'আবদুহ্ গ্রান্ড (প্রধান) মুফতি হিসেবে নিয়োগ লাভের পর সে বছরই আইন প্রণয়ন কমিটির একজন স্থায়ী সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। দেশ ও জাতির পক্ষে তিনি গণ-মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে একজন দক্ষ আইন প্রণেতা, সূক্ষ বিবেচক ও বিচক্ষণ পরামর্শক হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। মিশরে নিযুক্ত তৎকালীন ব্রিটিশ হাই কমিশনার লর্ড ক্রোমারের সাথে কী ধরনের আচরণ করতে হবে এ বিষয় সম্পর্কিত 'আবদুহ্ এর পরামর্শের ভূয়সি প্রশংসা করে খেদিভ আব্বাস হিলমি[৯৯] তাঁকে ক্রোমারের নিকট পরিচয় করিয়ে দেন। যদিও আব্বাস হিলমির সাথে তাঁর সম্পর্কটা সবসময় সৌম্যপূর্ণ ছিলনা। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর

---

৯৮ মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯।

৯৯ আব্বাস হিলমী: ১৮৯২ সালে জানুয়রি মাসের সাত তারিখে খেদিভ তাওফিকের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আব্বাস হিলমী খেদিভ পদে অধিষ্ঠিত হন। দখলদার শক্তির প্রভুত্বপূর্ণ মনোভাব ও শোষণকে তিনি প্রবলভাবে ঘৃণা করতেন। ব্রিটিশ কনসাল-জেনারেল ও অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সাথে আচার-ব্যবহার ও লেনদেনে তাঁর এ মনোভাব প্রকাশ পায়। একবার সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনকালে তিনি পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনী প্রধান কিচেনারেরও সমালোচনা করেন। ব্রিটিশবিরোধী এ মনোভাব কি তাঁর ক্ষমতাহীনতা জনিত ক্রোধ না তাঁর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ; তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। যদিও লর্ড ক্রোমার তাঁর দেশপ্রেমকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা লিপ্সার আবরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। [Earl of Cromer, *Abbas ii* (London: Macmillan, 1915), p. 8-11]

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মিশরের প্রধান মুফতি হিসেবে তিনি যতদিন এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন তিনি আইন সভায় ছিলেন; সেখানে তাঁর দায়িত্ব ছিল পরামর্শ প্রদান এবং বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক সুচিন্তিত মতামত ও ধারণা প্রদান করা।

অবশেষে জীবনের শেষদিকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'জাম'ইয়্যাতু আল-খাইরিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্'[১০০] নামক সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এ সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সরকার প্রধানসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সমাজসেবার অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলা এবং সমাজের দুঃস্থ ও অসহায় মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক যাবতীয় বিষয় আঞ্জাম দেয়ার জন্য এই সময়ে 'লাজনাতু আল-ইহইয়া-ই-'উলুম আল-'আরাবিয়্যা' নামক সংস্থার সভাপতি হিসেবেও তাঁকে নিযুক্তি দেয়া হয়। এ সংস্থার মৌলিক কর্মসূচি ছিল 'আরবি ভাষার দুষ্প্রাপ্যও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের পুনঃমুদ্রণ ও পুনঃপ্রকাশ পূর্বক 'আরবি ভাষাভাষী মানুষের নিকট এগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। 'আবদুহ্ এর সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে সীনা আন্দালুসীয়ার প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ '*আল-মুখাসসাস*' এর সতেরো খণ্ড এ সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিউনিস ও ফাস হতে মালিকী ফিক্হ এর বিখ্যাত গ্রন্থ '*আল মুদাওয়ানা*' এর মূল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতঃ তা সম্পাদনা শেষে প্রকাশ করা হয়।[১০১] এভাবে তিনি তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাঁর জীবনকে অর্থবহ করে তুলেন।

---

১০০ আল-জাম'ইয়্যাতু আল-খাইরিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্: ১৮৭৮ সালে সাংবাদিক আবদুল্লাহ আল নাদিম জাম'ইয়্যাতুল খাইরিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এটি ইসলামী সমাজসেবামূলক একটি সোসাইটি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মিশরে যখন নারী শিক্ষা ছিলো অপরিচিতি; তখন এ সোসাইটির মাধ্যমে মিশরীয় ছেলে-মেয়েদের ইসলামী নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া হতো। [ভুঁইয়া, ড. গোলাম কিবরিয়া, *আধুনিক মিশর সুদান এবং লিবিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০১৪ খ্রি.), ১ম সং., পৃ.২৮।]

১০১ Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muhammad 'Abduh* (London: Oxford University Press, 1933), p. 85)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্যিক মুহাম্মদ ‘আবদুহ্

১ম পরিচ্ছেদ

মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ এর রচনাবলি

২য় পরিচ্ছেদ

রিসালাত আত্-তাওহিদ এর বিষয়বস্তু, ভাব ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ

৩য় পরিচ্ছেদ

আধুনিক ‘আরবি গদ্য সাহিত্যের গতিধারা নিরূপণে ‘আবদুহ্ এর ভূমিকা

৪র্থ পরিচ্ছেদ

জাগরণি সাহিত্যে ‘আবদুহ্ এর অবদান

৫ম পরিচ্ছেদ

সাংবাদিকতা সাহিত্যে ‘আবদুহ্ এর অবদান

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাফসির সাহিত্যে ‘আবদুহ্ এর অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ
মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর রচনাবলি[১]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন আধুনিক 'আরবি সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক। তাঁর রচনা, চিন্তা ও গবেষণা মননশীল সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাঁর যুক্তিবাদী রচনাবলি, বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনা ও সংস্কারমূলক চিন্তাধারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ ও তাফসির সাহিত্য পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর শক্তিশালী লেখনী, রচনার আধুনিক স্টাইল, ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থাবলি 'আরবি প্রবন্ধ সাহিত্যকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। তাই তাঁর সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করা সময়ের দাবী। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার অবদানে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো তাঁর মননশীল রচনা ও আধুনিক চিন্তা-দর্শন। তাঁর সৃষ্টিশীল ধারণা, বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনা এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারাই তাঁর রচনাশৈলী ও লেখনী শক্তিতে প্রাণ সঞ্চার করেছিল।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে মানুষের মনের রাজ্যে ও চিন্তার দুয়ারে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং মুসলিম জাতিকে নতুনভাবে জাগরণ, মুক্তি ও উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার কলম ও শক্তিশালী লেখনী মিশরবাসীকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলেছিল এবং পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতিকে অগ্রগতি, উন্নতি ও প্রগতির চূড়ায় আরোহণের দ্বার খুলে দিয়েছিল। 'আবদুহ্ এর যুক্তিবাদী রচনাবলি, চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা ও সংস্কারমুলক ধর্মীয় চিন্তাধারা মারাকেশ হতে ইন্দোনেশিয়া

পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ ও তাফসির মালয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[২]

তাছাড়া ভারত উপমহাদেশেও নবাব মুহ্সিনুল মুলক মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর শিক্ষা, সংস্কারমূলক চিন্তাধারা ও সৃষ্টিশীল রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর *রিসালাতুত্-তাওহীদ*[৩] এর উর্দু অনুবাদ

---

১ গবেষকের একান্ত সংগ্রহ।

২ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *তারীখ আল-উসতায আল-ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: ১৯৩১ খ্রি.), ১ম খণ্ড,ভূমিকা

করান। তাঁর শক্তিশালী লেখনী, রচনার আধুনিক স্টাইল,ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থাবলি 'আরবি প্রবন্ধ সাহিত্যকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে। একজন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর অবদানের মূল বিষয়গুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সাহিত্যের মূল সঞ্জীবনী শক্তি ছিল তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও প্রথাবিরোধী লেখনী। এ জন্যই তিনি পাঠক সমাজে একজন সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি, সুনাম ও পরিচিতি পেয়েছিলেন।

খ। সাংবাদিকতা সাহিত্যেও রয়েছে তাঁর অনবদ্য অবদান। কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু 'আরবি পত্রিকায় তিনি নিজে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন এবং সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এভাবে তিনি 'আরবি সাংবাদিকতা সাহিত্যকে বিভিন্ন উপায়ে সমৃদ্ধ করেছেন। যেমন: তিনি মিশরের সরকারি পত্রিকা *আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিশরীয়্যাহ্* এর প্রধান সম্পাদকসহ বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।[৪]

গ। তাফসির সাহিত্য হচ্ছে 'আবদুহ্ এর সাহিত্য অবদান সমূহের মধ্যে অন্যতম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান; যা *আল-মানার*[৫] পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৬]

---

৩ গ্রন্থটিতে আল্লাহ্র একত্ববাদ সম্পর্কে লেখক বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ.৮৬

৫ আল-মানার (**المنار**): আল-মানার ১৮৯৮ খ্রি. হতে ১৯৪০ খ্রি. পর্যন্ত কায়রো হতে প্রকাশিত মুসলিম চিন্তাধারা ও মতবাদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত একটি সাময়িকীর নাম। এতে পবিত্র কোরআনের মশহুর আধুনিক ব্যাখ্যাসমূহ প্রকাশ পেতো। আল-মানার পত্রিকাটি কোনো বিশেষ মত-গোষ্ঠীর অংশ না হয়ে সালাফিয়্যা সংস্কারবাদী দলের সমর্থন করতো। পত্রিকাটি ছিল একাধারে প্রতিরোধ ও পুনরুজ্জীবনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতীক। আফগানীর মৃত্যু বছর ১৮৯৭ সালের শেষ দিকে সায়্যিদ রাশিদ রিদা কায়রো আগমন করেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সহকারীরূপে কাজ করার মানসে প্রথম হতেই রিদা একটি পত্রিকায় কাজ করার সংকল্প করেছিলেন। এটিকে তিনি আল-মানার (আলোকতথ্য) নামে অভিহিত করেছিলেন। মার্চ ১৮৯৮ খ্রি./১৩১৫ হি. মোতাবেক শাওয়াল মাসের শেষের দিকে তিনি এটি প্রথম প্রকাশ করেন। বেশ কিছুকাল তিনি এই পত্রিকায় জামাল উদ্দীন আফগানী, মুহাম্মদ 'আবদুহ্, আল-কাওয়াকিবী, জামাল উদ্দীন আল-কাশিমী ও অন্যান্য লেখকের বহু নিবন্ধ প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করেন। পত্রিকাটির গবেষণামূলক সুচিন্তিত লেখনী, ইসলামী আন্তর্জাতিকতা এবং তথ্য-উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা আল-মানারকে একটি বিরল ক্ষুদ্র সংখ্যক উদারপন্থী সংস্কৃতিমনা পাঠক মহলের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর নিয়মিত তাফসির প্রকাশনা পত্রিকাটিকে মহান গৌরব প্রদান করেছে। এর মূল প্রবন্ধসমূহে, সমসাময়িক মুখ্য ইসলামী 'আরবি সমস্যা সম্পর্কে সর্বদা যুক্তি-প্রমাণসহ ভারসাম্যপূর্ণ ও গতিশীল ধর্মনিষ্ঠ মতামতসমূহ নিখুঁতভাবে পেশ করা হতো। তদুপরি এর বিচার সংক্রান্ত (ফিক্হি) আলোচনা, পুস্তক সমালোচনা এবং মুসলিম বিশ্ব সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনা একে ইন্দোনেশিয়া, ভারত, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা এমনকি কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশের রচনা প্রেরণকারী লেখকদের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। শুরুতে আট পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক হিসেবে যাত্রা শুরু করে পত্রিকাটি পরবর্তীকালে দীর্ঘতর ব্যবধানে পাক্ষিক ও মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়

ঘ। মৌলিক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্যেও তিনি অবদান রাখেন। যেমন: জামাল উদ্দীন আফগানীর[৭] (১৮৩৮-১৮৯৭ খ্রি.) বিখ্যাত রচনাবলি তিনি ফারসি হতে আরবিতে অনুবাদ করেন।[৮]

বৎসর হতে বরাবর প্রকাশিত পবিত্র কোরআনের তাফসির ছিল রাশিদ রিদার রচনা। এতে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কর্তৃক আল-আযহারের বৈকালিক ভাষণে প্রচারিত ব্যাখ্যা হতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকতো এবং উক্ত দুই ব্যক্তির স্ব-স্ব অবদান এখানে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেতো। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কেবল চতুর্থ সূরা আন-নিসা এর ১২৫ আয়াত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন; অপরপক্ষে রাশিদ রিদা দ্বাদশতম সূরা ইউসুফ এর শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হন। আল-মানারে সংগৃহীত সংকলন সমষ্টি চল্লিশ বৎসরেরও অধিক সময়ের মূল্যবান তথ্যের একটি রত্ন-ভান্ডার; যাতে একটি যুগের সংস্কার পন্থীদের মনোভাব, তাঁদের আকর্ষণ সমূহের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাঁদের আশা-নিরাশার আলেখ্য ইত্যাদি দারুনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলামী উম্মার ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার এর প্রতি নিবিষ্ট থাকায় আল-মানার অধিকতর খাঁটি তাওহীদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআন ও সুন্নার আদর্শে প্রত্যাবর্তনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে। একইভাবে পত্রিকাটি আফগানী ও 'আবদুহ্র সালাফী ঐতিহ্যকে সমর্থন করে। এতে মুহাম্মদ 'আবদুহ্র চিন্তাধারা উল্লেখসহ বিচার (ফিক্হ) সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের গঠনমূলক আলোচনা এবং বহু যুগোপযোগী বিষয়ের সমাধান দেয়া হয়। [সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৩-৫৪৫।]

৬ আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *তা'রীখ আল-আদাব আল-'আরাবি* (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), ভূমিকা।

৭ সাইয়িদ জামাল উদ্দীন আফগানী গত দু'শ বছরে সারা মুসলিম বিশ্বে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যে কয়েকজন মহান মুসলিম মনীষী জন্ম নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং কর্ম সম্পর্কে না জানলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে তিনি কত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ১৮৩৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৭ খ্রি. ৫৮ বছর বয়সে মারা যান। এর মধ্যে তিনি এমন অসাধারণ সব কাজ করেন যা ভাবাই যায়না।

জামাল উদ্দীন আফগানীর কাজ বুঝতে হলে সে সময়কে বোঝা দরকার। তিনি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন সাম্রাজ্যবাদ তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিয়ে অধিষ্ঠিত। ভারত ইতোমধ্যেই পদানত হয়ে গেছে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। যখন তিনি মাত্র সতেরো আঠারো বছরের যুবক তখন ভারত উপমহাদেশে সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। সে সময় সমগ্র ভারতকেই বৃটেন দখল করে নেয়। একই সময়েফ্রান্স, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল ও ডাচরা মিলে সারা বিশ্ব দখল করে চলছে। জামাল উদ্দীন আফগানী সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের ঠিক সেই সময়ই জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়েওঠেন। এই সময়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বিশ্বের প্রায়সকলদেশই কোনো না কোনোভাবে ইংরেজদের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের পদানত হয়ে আছে। জামাল উদ্দীন আফগানী তাঁর যৌবনেই সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ান। আফগানিস্তানে তার জন্ম হলেও হিন্দুস্তানে তিনি আসেন।

আমরা জানি, উনবিংশ শতাব্দীর সেসময় গোটা মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায়এক চতুর্থাংশই ভারত উপমহাদেশে বাস করত। এর মধ্যে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বেশি এবং মধ্যভাগে বিক্ষিপ্তভাবে মুসলিমরা বাস করত। আফগানী কলকাতাতেও আসেন। তিনি ফ্রান্সে যান। তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশে যান (যেগুলোকে সেসময়ের মুসলিম পাওয়ার বলা যেতে পারে) । যেমন: মিশরে তিনি অনেকদিন ছিলেন। মিশরকে তখন উত্তর আফ্রিকা বা 'আরব বিশ্বের নেতা বলা হতো। মিশর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেশ। সেখানে তিনি কাজ করেন এরপর তুর্কি খিলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে তিনি গমন করেন এবং সেখানকার রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। তিনি মিশরে থাকাকালীন সময় সেখানে এ কাজটিই করেছিলেন। মিশরের মতো তুরস্কও তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বর্তমানেও তুরস্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। তিনি তুরস্কের খেলাফতকে পরিবর্তন ও রক্ষা করারচেষ্টা করেন। ইরান এখনকার মতো তখনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল। তিনি ইরানে যান এবং সেখানেও কাজ করেন। সেখানকার রাজনীতিকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই সাথে হিন্দুস্তানের রাজনীতিকে তিনি প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন।

এগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো তিনি ইন্দোনেশিয়া বা ইস্টে (পূর্বে) কাজ করেননি। কিন্তু তৎকালীন কেন্দ্রীয় চারটি স্থান উপমহাদেশ, ইরান, তুরস্ক এবং মিশরে কাজ করেন। আফগানিস্তানও সেই সাথে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, তিনি সঠিক ভাবেই দেশগুলো নির্বাচন করেন । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মুসলিম বিশ্বের

ঙ। সাংবাদিকতা, তাফসির ও অনুবাদ সাহিত্য ছাড়াও ভাষাতত্ত্বের উপর 'আবদুহ্ এর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

চ। এছাড়াও তিনি মিশরের শারী'য়াহ্ আদালতে দায়িত্ব পালনের সময়ে তাঁর বিচারিক অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন।[৯]

ভবিষ্যত নির্ভর করছে এসব দেশ বা স্থানের এলিট বা জনগণকে প্রভাবিত করার উপর । আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে, তিনি তাঁর জীবনে মিশরে মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর মতো একজন মহৎ শিষ্য পান। মুফতি 'আবদুহ্ই তাঁর চিন্তাধারাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা করেন, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রে 'আরবি ভাষা-ভাষীদের মধ্যে। এটা সত্য যে সাবকন্টিনেন্টে তৎকালীন মুসলিম এলিটদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিত কম ছিল। যারা ছিল তারা 'আরবি শিক্ষিত ছিল। তাদের মধ্যে 'আরবির মাধ্যমেই আফগানীর চিন্তাধারা পৌঁছানো সম্ভব হতো। ইংরেজির মাধ্যমে পৌঁছানোর কোনো উপায়তখন ছিল না। আর ইংরেজি ভাষা তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এখানে প্রথম মুসলিম ইংরেজি কলেজই স্থাপিত হয়অনেক পরে, আলীগড়ে। এ ছাড়া ইংরেজি শিক্ষা ছিল তখন গুটি কয়েক লোকের মধ্যে। সুতরাং তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের যারা এলিট ছিলেন তাদের ভাষা 'আরবিই ছিল বলা যায়। 'আরবির সাথে সাথে ভারত এবং ইরানে ফার্সিও ছিল। কাজেই তিনি প্রথমেমুফতিমুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সহায়তায়মিশর কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা শুরু করেন। সারা বিশ্বে তিনি তাঁর বাণীকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

এরপর তিনি ফ্রান্সে গিয়ে*আল-'উরওয়াত আল-উসকা* বা শক্ত রজ্জু নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্যারিসকে কেন্দ্র করে 'আরবি ভাষায়এটা করার মধ্যে এটাও প্রমাণ করে যে, তিনি নিজেও 'আরবি ভাষা ভালো জানতেন। তিনি তার পত্রিকা *আল-'উরওয়াত আল-উসকায়* যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন সেগুলো সংকলন করে উর্দুতে মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস কাসেমী *'আফগানী রচনাবলী'* লিখেন।

জামাল উদ্দীন আফগানী তখন তাঁর লেখায় মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো কী তা দেখাতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর যুগকে সামনে রেখেই কথা বলেছেন। যেমন: আমরা আমাদের যুগকে সামনে রেখে কথা বলে থাকি। তিনি দু'টি বিষয়কে প্রধান হিসেবেদেখেন। একটি হলো অনৈক্য। তিনি বলেন যে, বিদেশী শক্তি আমাদের অনৈক্যের সুযোগে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে।

আর দ্বিতীয় যে বিষয়ের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেটা হলো নেতৃত্ব। তিনি বলেন, মুসলিমদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব ঘটেছে এবং শক্ত কোনো নেতৃত্ব নেই। যদিও বলা যায়, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারীর অধিকার এসকল বিষয়তিনি আনেননি। কেন আনেননি? এর উত্তর হলো, সে যুগে এগুলো বড়প্রশ্ন ছিল না। তখনকার সময় বড় প্রশ্ন ছিল মুসলিম জাতির রক্ষা। যে শাসকই আছে তাকে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে সেখানে প্রথম কাজ এটা নয় যে, বাদশাহী বাদ দিয়ে গণতন্ত্র কিংবা মানবাধিকার রক্ষা করা। প্রকৃতপক্ষে তখনকার ইস্যুই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ মানসিকতাটা দেড়শত বছর আগে না গেলে আমরা বুঝব না। তিনি তাঁর সময়কে সামনে রেখেই নেতৃত্বের প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি একথা বললেননি যে, নেতা স্বৈরাচারী, গণতান্ত্রিক নয়কিংবা তিনি নির্বাচিত হননি। কিন্তু তিনি বলেন যে, যে নেতা যেখানে আছেন, আপনারা ঝগড়া-ঝাটি বন্ধ করুন, আপনারা একত্রিত হন। আপনাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখতে হবে। তিনি তাদেরকে অলসতা, বিলাসী জীবন এবং জুলুম পরিহার করতেবলেন। তিনি এ দু'টি জিনিস, অনৈক্য ও নেতৃত্বকে সার্বিকভাবে গুরুত্ব দেন।

তিনি তাঁর 'একতা' প্রবন্ধে বলেছেন, একথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, সমস্ত মুসলিম দেশের উপর কোনো একক ব্যক্তির আধিপত্য মেনে নেয়া হোক। এমন প্রস্তাব দুঃসাধ্য বলে মনে করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমি অবশ্যই চাই যে, এদের সবার উপর কোরআনী আহকামের আধিপত্য থাকুক এবং সবাই ইসলামকে নিজেদের ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে পরিণত করুক। [Sharif M. M., *A History of Muslim Philosophy*, ed., vol. II, rep. (Delhi: Low Price Publications, 1995), p. 1463]

৮ *Ibid*

৯ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, ভূমিকা।

'আবদুহ্ এর সাহিত্যকর্ম

১। تفسير سورة الفاتحة : ১৯০৫ খ্রি. কায়রো থেকে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আল-মানার প্রেস থেকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ পায়। এ সংস্করণে মানুষের কর্মের স্বাধীনতার উপর 'আবদুহ্'র একটি বক্তৃতাও রয়েছে।[১০]

২। تفسير سورة العصر : সূরা আল-'আসর এর তাফসির সর্বপ্রথম '*আল-মানার*' পত্রিকায় ১৯০৩ খ্রি. কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ খ্রি. একই প্রেস থেকে এর তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রণ হয়। উপরিউক্ত সংস্করণেও ইসলামী শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উপর 'আবদুহ্ এর একটি বক্তৃতা রয়েছে।[১১]

৩। تفسير جزء عم : প্রথম দিকে এটি '*আল-মানার*' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯০৪ খ্রি. কায়রো থেকে 'আমিরীয়্যা কর্তৃক এটি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়।

৪। تفسير القرأن الحكيم (*تفسير المنار*):'আবদুহ্'র জীবদ্দশায় সূরাতুন-নিসা এর একশত পঁচিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এ তাফসীর রচিত হয়। পরবর্তীতে সায়্যিদ রাশিদ রিদা সূরা তাওবা পর্যন্ত তা সম্পন্ন করেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে কায়রো থেকে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ততাফসীরটি মোট বারো খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[১২]

৫। رسالة التوحيد : এটি 'আবদুহ্ এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি কয়েকটি বিষয়ের সমষ্টি করেছেন। যথা:

১) الله جل جلاله وصفاته وأفعاله

২) والإنسان ومكانته وأفعاله

৩) والرسالة والنبوة ـ عامةـ ولمحمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص

---

১০ *প্রাগুক্ত।*

১১ *প্রাগুক্ত।*

১২ Hafiz Ibrahim, *Encyclopaedia of Islam,* new edition, vol. iii, p.90

৪) والقرآن الكريم ... معجزة الإسلام ورسوله ..

এ গ্রন্থটি 'আমিরী প্রিন্টিং প্রেস থেকে ১৮৯৭ খ্রি.এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে ব্যাখ্যাসহ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা কর্তৃক ১৯০৮ খ্রি. কায়রোর আল-মানার প্রেস থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। যেমন: ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[১৩]

৬। رسالة رد الدهريين : গ্রন্থটি তাঁর উস্তাদ জামাল উদ্দীন আফগানীর বিখ্যাত ফারসি রচনা থেকে 'আরবিতে অনুবাদ করেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বৈরূত থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[১৪] এ গ্রন্থে উস্তাদ জামাল উদ্দীন আফগানী বস্তুবাদকে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করেছেন। এটির প্রারম্ভে মুহাম্দ আবদুহ্-এর এক দীর্ঘ মুখবন্ধ আছে। গ্রন্থখানির শেষ অধ্যায়ের নাম 'জাতিসমূহের সুখ অর্জনের উপায়'। উস্তাদ জামাল উদ্দীন আফগানী গ্রন্থটির শেষে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[১৫]

তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। এ পরিবর্তন হয় তারা নিজেরা করে, অথবা তাদের উপর যারা কর্তৃত্বশীল তারা করে, নতুবা তাদেরই মধ্যকার অন্যদের কারণে সেটা সংঘটিত হয়।

---

১৩ মুহাম্মদ 'আবদুহ্, (তাহকীক: ড. মুহাম্মদ'আম্মারা), *রিসালাতুত তাওহীদ* (বৈরূত: দার আল-সুরক্ব, ১৪১৪ হি.), পৃ. ০৯।

১৪ সায়্যিদ জামাল উদ্দীন আফগানী,('আরবি অনু. শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্, তাহকীক: ড. আহমদ মাজেদ), *রিসালাতুর রদ্দি 'আলাদ্-দাহরইন* (বৈরূত: দার আল-মা'আরিফ আল-হুকমিয়্যা, ১৪৩৮ হি.), পৃ. ০৯।

১৫ *আল-কোরআন*, ১৩ : ১১।

যেমন, উহুদের ময়দানে তিরন্দাজদের স্থান পরিবর্তনের কারণে মুসলিমদের উপর যে মহাবিপদ এসেছিল। এ বিপদের কারণে কয়েকজন সাহাবি কাফিরের হাতে শহিদ হয়েছেন।[১৬]

ইসলামী শারী'য়াতে এ ধরনের আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। তবে আয়াতের অর্থ এই নয় যে, তিনি কারও কোনো গুনাহ ব্যতীত তাদের উপর বিপর্যয় দেন না; বরং কখন কখনও অপরের গুনাহের কারণে বিপর্যয় নেমে আসে।

উপরিউক্ত আয়াতের বরাতে নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করা যায়,

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّااللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَال نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

"যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত। একবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আগমন করলেন এবং বলতে লাগলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। 'আরবের লোকেদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার সঙ্গের শাহাদাত আঙ্গুলের অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হবো? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপকাজ অতি মাত্রায় বেড়ে যাবে।"[১৭]

৭। الأسلام والرد على منتقديه : মিশরের সাবেক গ্রান্ড মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ইসলাম বিষয়কমূসিয়ূ হানুতুর প্রশ্নাবলির উত্তর সম্পর্কিত গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। এছাড়াও তিনি

---

১৬ শাইখুল হাদিস মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন, ড. হোছাইন মুজতবা এ এইচ এম. সম্পাদিত, *হযরত মুহাম্মদ (সা.): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* (ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.), দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৫৭৫।

১৭ *সহিহ্ আল-বুখারি*, হাদিস নং ৩৩৪৬, ৩৫৯৮, ৭০৫৯, ৭১৩৫ ; *সহিহ্ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৮০; *আল-মুসনাদু লি আহমাদ ইব্ন হাম্বল*, হাদিস নং ২৭৪৮।

শেষ যুগে ইসলামের ধারক-বাহকদের নিয়ে কিছু নিবন্ধ লিখেছেন। ১৩২৭ হিজরি সনে মিশরের আত্-তাওফিক আল-আদাবিয়্যা প্রেস কর্তৃক কায়রো থেকে এটি প্রথম প্রকাশ হয়।[১৮]

৮। الأسلام والنصرانية مع العلم والمدنية : এটি 'আবদুহ্ এর প্রসিদ্ধ নিবন্ধ সংকলন; যা তিনি তাঁর ব্যস্ততম জীবনের ফাঁকে রচনা করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের দ্বান্দ্বিক মতবাদ নিয়ে এখানে অনেক যৌক্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ রয়েছে। তিনি এ গ্রন্থটি শুরু করেছেন কোরআন মাজীদের সূরাতুন্- নাহ্ল এর ১২৫ নম্বর আয়াত দিয়ে শুরু করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থ: তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশর মাধ্যমে এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।[১৯]

নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছে কে তার পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়। আর কে সৎপথে আছে, তাও তিনি সবিশেষ অবগত আছেন।"[২০]

এ গ্রন্থে আবদুহ্ এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সভ্যতা আবির্ভূত হয়। অতঃপর তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখনই মানুষ কলুষিত হতে থাকে। ইসলামের চাঁদ উদিত হওয়ার সাথে সাথেই মানুষের মাঝে নতুন চেতনা প্রবাহিত হয়। মানুষ যখন সভ্যতার ছায়াতলে দলে দলে আশ্রয় নিতে লাগলো তখন বলতে লাগলো আসমান-যমীন যতদিন থাকবে আমাদের ঈমান থাকবে।[২১] এ নিবন্ধগুলো সর্বপ্রথম ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-মানার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

---

১৮ *আল-ইসলামু আওয়ার রদ্দু আলা-মুনতাকিদায়িহি*, ভূমিকা, পৃ.০২

১৯ এখানে ইসলাম প্রচার ও তাবলীগের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তা হবে হিকমত, সদুপদেশ ও নম্রতার উপর ভিত্তিশীল এবং আলোচনার সময় সদ্ভাব বজায় রাখা, কঠোরতা পরিহার করা ও নম্রতার পথ অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।এখানে আরো উল্লেখ্য যে, তাঁর কাজ উল্লিখিত নীতি অনুসারে উপদেশ দেওয়া এবং প্রচার করা। হিদায়াতের রাস্তায় পরিচালিত করা আল্লাহর আয়ত্তাধীন। আর তিনিই জানেন যে, কে হিদায়াত গ্রহণকারী, আর কে পথভ্রষ্ট। [দ্র. গবেষকের মত।]

২০ *আল-কুরআন*, ১৬ : ১২৫

২১ মুহাম্মদ 'আবদুহ্,*আল-ইসলামু ওয়া আল-নাসরানিয়্যাতু মা'আল 'ইলমি ওয়া আল-মাদানিয়্যা*(১৯৮৮ খ্রি.) পৃ. ০৫)

৯। حاشية: على شرح الدوانى : এটি পার্শ্বটীকা সম্বলিত একটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ; যা আল-ঈজীর ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে *'আকাইদ* গ্রন্থের ভাষ্য হিসেবে *'আদ্-দাওয়ানী'* নামে রচনা করেন। এটি ১৯০৫ খ্রি. কায়রো হতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১০। شرح نهج البلاغة : গ্রন্থটি ১৮৮৫ খ্রি. বৈরূত থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি ভাষাতত্ত্বের উপর 'আবদুহ্ এর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

১১। شرح مقامات بديع الزمان الهمدانى : এটিও ভাষাতত্ত্বের উপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ১৮৮৯ খ্রি. বৈরূত থেকে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যদিও পরবর্তীতে মুহীউদ্দীন আবদুল হামীদ কর্তৃক তা পরিমার্জিত হয়ে কায়রো হতে একাধিকবার প্রকাশিত হয়।[২২]

১২। شرح كتاب البصيرن الناصيرية : এটি কাযী যাইনুদ্দীন উমার ইবন সাহ্লান আস-সাবী প্রণীত যুক্তিবিদ্যার একটি শরাহ্ বা ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যামূলক এ গ্রন্থটি 'আবদুহ্'র ভূমিকা ও ভাষ্যসহ ১৮৯৮ খ্রি. 'আমিরী প্রিন্টিং প্রেস, কায়রো হতে প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয়।

১৩। دلائل الأيجاز وأثار البلاغة : এটি মূলত আবদুল কাহির আল-জুরজানী রচিত গ্রন্থ। পরবর্তীতে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কর্তৃক সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা সহকারে ১৯০৩ খ্রি. প্রথমবারের ন্যায় কায়রো হতে এটি প্রকাশিত হয়।

---

২২ সে সময় আরবের লোকেরা সকলেই জানতেন যে, শায়খ আবুল ফযল আহমদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-হামদানী-ই হলেন বদীউয যামান আল-হামদানী। তাঁর কথায় যেন ছিল জাদু। তাঁর কথাই ছিলো মার্জিত কবিতা। যুহাইর বলেন, তাঁর কবিতায় আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো জাদুর মতো মিলতে লাগলো। আমি তাঁকে চন্দ্র ও সূর্যের সাথে তুলনা করছি। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি স্তুপবাসীর কথাগুলো বিনয় ও নম্রতার সাথে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রায় চার শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কিন্তু মাত্র পঞ্চশটির মতো প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে মহিউদ্দীন আবদুল হামীদ তাঁর প্রকাশিত মাকামাতগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। এ গ্রন্থের পরিমার্জন করেছেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্। [হুসাইন ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবুল ফযল, *মাকামাতু বাদি'উয যামান আল-হামদানী* (বৈরূতঃ দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৪২৬ হি.), পৃ. ০৩]

১৪। تكبير فى اصلاح المقام الشريعة : গ্রন্থটি ১৮৯০ খ্রি.প্রকাশিত হয়। এতে 'আবদুহ্ কর্তৃক বিচারালয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ সুপারিশমালার লিখিত রূপ প্রদান করা হয়। বিশেষ করে আদালতে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতায় শারী'য়াহ্ আদালতের কার্যাবলি ও নীতিমালা সংশোধনের সুপারিশ সম্বলিত একটি গ্রন্থ হিসেবে এটি বিবেচিত।

১৫। উল্লিখিত গ্রন্থাবলি ছাড়াও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর কয়েকটি স্মৃতিকথা রয়েছে; যা আল-আযহার ও মিশরের শারী'য়াহ্ আদালতে সংশোধনের জন্য পেশ করা হয়েছিল। তাছাড়া 'আবদুহ্ এর নির্বাচিত বিশেষ নিবন্ধগুলো পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য রাশিদ রিদা সংকলন করে *تاريخ الأستاذ الأمام الشيخ محمدعبده* নামক গ্রন্থের দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৯৩১ খ্রি. কায়রো থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
রিসালাত আত্-তাওহিদ এর বিষয়বস্তু, ভাব ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর রচনাবলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে *'রিসালাত আত্ তাওহিদ'*। সুলতানিয়া মাদরাসায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটি মূলত সে বক্তৃতামালারই সংকলন। পরবর্তীতে তা একটি স্বতন্ত্র সংগ্রহ বা সংকলন হিসেবে পাঠকের নিকট প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে সুলতানিয়া মাদরাসায় মুসলিম-অমুসলিম, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতিতে 'আরব জাতীয়তাবাদ ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। এ সকল আলোচনার মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও চলতো। আর এ আলোচনার আসরগুলো ছিল একেকটি উদার ও মুক্ত জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের ন্যায়। *'রিসালাতুত্-তাওহিদ'* তাঁর শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থসমূহের একটি। এ গ্রন্থে তিনি আধুনিক বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থান, সমসাময়িক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, বর্তমান আধুনিকতা ও অতীত ধর্মীয় ঐতিহ্য, যৌক্তিকভাবে স্রষ্টার পরিচয়কে জানা, ওহি প্রদত্ত জ্ঞান ও সৃষ্টি রহস্যের নিবিড় পরীক্ষণের মাধ্যমে সঠিক কারণ উদঘাটন, ইসলামী সংস্কার, 'ইলম আল-কালামের পুনরুজ্জীবন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্মতত্ত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। যেমন:

ক) *'রিসালাত আত্-তাওহিদ'* গ্রন্থের শিরোনামেই গ্রন্থটির একটি স্বতন্ত্র বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য লুকায়িত আছে। গ্রন্থটির শিরোনাম অধ্যয়নে যে কোনো পাঠকেরই খুব সহজে অনুধাবন হবে যে, এটি একান্তই ধর্মতত্ত্বের উপর বিশেষ কোনো গ্রন্থ। শিরোনামে যদিও এটি শুধুই একটি ধর্মীয় গ্রন্থ মনে হয়, বাস্তবিক অর্থে তা নয়; বরং ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও মুসলমানদের সমসাময়িক ও আধুনিক জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক যুগের মুসলমানদের সাথে এ সকল বিষয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং এখানে ইসলামী সংস্কার সম্পর্কিত যুক্তিমালা রয়েছে। তাই সংজ্ঞা অনুসারে এ গ্রন্থটিকে একটি ধর্মীয় কাজ মনে হয়; তবে তা ধর্মতাত্ত্বিক নয়।[২৩]

২৩ Mark Sedgwick, *Muhammad Abdudh* (Oxford: one world, 2009), p. 62

খ) এ গ্রন্থে 'আবদুহ্ আধুনিকতা ও অতীত ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে পাঠকদেরকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে চেয়েছেন এবং এ সকল ধারণা তাদেরকে কীভাবে স্পষ্ট করে বুঝাতে পারেন এর একটি জোরালো প্রয়াস তাঁর রচনায় প্রতীয়মান হয়। যাতে করে মুসলমানরা আধুনিক যুগের নব্য জাহিলিয়্যাত এবং ইসলামের সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যটা নিরূপণে সমর্থ হয়।

গ) *'রিসালাত আত্-তাওহিদ'* গ্রন্থে দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আবদুহ্ আরও কিছু বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেন। যেমন: স্রষ্টা প্রদত্ত ওহিলব্ধ জ্ঞানের সম্ভাব্যতা যৌক্তিকভাবে জানা এবং প্রত্যাদেশ ও সৃষ্টি রহস্যের নিবিড় পরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে যুক্তির কষ্টি পাথরে একে যাচাইপূর্বক মজবুতভাবে ধারণ করার প্রতি জোর তাগিদ দেন। এখানে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'আবদুহ্ কোরআন মাজিদের যৌক্তিক দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, ইসলামী ধর্মমত সর্বত্র একটি ঐক্যের ধর্ম। এটি কোনো দ্বন্দমূলক নীতির ধর্ম নয়; তবে যৌক্তিক কারণেই একে যথাযথরূপে মানানসই হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশই হচ্ছে এর সবচেয়ে নিশ্চিত ভিত বা স্তম্ভ। এগুলো ছাড়া যা কিছু আছে তা অবশ্যই বিতর্কিত হিসেবে বুঝতে হবে এবং শয়তান বা রাজনৈতিক আবেগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া থেকে মুক্ত নয় তা মনে করতে হবে। কোরআন মাজিদ প্রত্যেক মানুষের কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছে এবং সত্য ও মিথ্যার বিচার-বিশ্লেষণ করে।[২৪]

ঘ) *'রিসালাত আত্-তাওহিদ'* এ আরও কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা হচ্ছে মুসলিম ইতিহাস ও সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সমাজে ইসলাম সম্পর্কিত যে সকল ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে যুক্তিসহ 'আবদুহ্ সে সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধিত করেন।[২৫]

ঙ) মুহাম্মদ 'আবদুহ্ আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে একটু স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করেন। তাই তিনি 'নতুন ধর্মতত্ত্ব' নামে পরিচিত নয়া উদীয়মান ধারার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। অটোম্যান পণ্ডিতদের নিকট যা 'ইয়েনি 'ইলম আল-কালাম' হিসেবে পরিচিত। 'আবদুহ্ মনে-প্রাণে

---

২৪ Muhammad Abduh,Translated by Ishaq Musaad and Kenneth Cragg, George Allen and Unwin, *The theology of Unity* (London: 1966), P. 49

২৫ Kurzman, Charles, ed. *Modernist Islam, 1840-1940: A source book* (Oxford :Oxford University Press, 2002 AD), p. 59

বিশ্বাস করতেন যে, 'ইলম আল-কালাম এবং জ্ঞানগত ধর্মতত্ত্বকে পুনর্জীবিত করা এখন সময়ের দাবী। তাই তিনি কারণ উদঘাটন, সংলাপ, গঠনমূলক বিতর্ক ও যুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের নিকট ধর্মতত্ত্বকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পান। তাঁর দৃষ্টিতে আধুনিক যুগে ধর্মীয় বিশ্বাসকে সুরক্ষার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হচ্ছে এগুলো।[২৬]এ বিষয়ে তাঁর মতামতগুলো *'রিসালাত আত্-তাওহিদ'* এ খুব স্পষ্টতই প্রকাশিত হয়েছিল; যেখানে তিনি আধুনিক সময়ের পরিবর্তিত প্রমাণাদি ও তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে সাড়া দেয়ার জন্য যৌক্তিক ধর্মতত্ত্বের উপর জোর দিয়েছেন। 'আবদুহ্ এররচনা থেকে খুব স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলমানদেরকে তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উন্নত জাতি হিসেবে মুসলমানদেরকে বিশ্ব দরবারে আসীন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

২৬ Elshakry, Marwa, *Reading Darwin in Arabic, 1860-1950*(Chicago: University of Chicago press,1st published 2013) p.181; শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্, (তাহকীক: ড. মুহাম্মদ 'আম্মারা), *রিসালাতুত তাওহীদ* (বৈরূত: দার আল-সুরক্ব, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৮-১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আধুনিক 'আরবি গদ্য সাহিত্যের গতিধারা নিরূপণে 'আবদুহ্ এর ভূমিকা

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে ফরাসিদের আগমনের মধ্য দিয়ে 'আরবি সাহিত্যে রেঁনেসা যুগ সূচিত হয়। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সে সময় থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আধুনিক 'আরবি সাহিত্যের যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে আবরদের যোগাযোগ শুরু হয়। এই সময়ে পাশ্চাত্যের সাথে মিশরসহ সমগ্র 'আরব বিশ্বের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এ সুবাদে তাঁরা পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জানার অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। আর এর প্রভাব পড়ে আবরদের ভাষা ও সাহিত্যে। বিশেষ করে ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিশর আক্রমণ, তৎপরবর্তী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল, ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের সুয়েজ খাল উন্মুক্তকরণ, ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১ম বিশ্বযুদ্ধ[২৭]

---

২৭ **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (First World War):** উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রজ্যবাদী দ্বন্দ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য ইত্যাদি প্রথম মহাযুদ্ধের মূল কারণ হলেও এর সূচনা ঘটে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ডের হত্যার মধ্য দিয়ে। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন সার্বিয়া সফরকালে যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ড ও তার পত্নী সোফিয়া আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে এরই সূত্র ধরে ২৮ জুলাই অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শিগ্‌গিরই এ যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। গ্রেট বিট্রেন, ফ্রান্স, রশিয়া, ইতালি, রুমানিয়া, গ্রিস, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, চীন, জাপান, প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয় মিত্রপক্ষ। আর জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, অটোমেন সাম্রাজ্য, বুলগেরিয়া প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয় চক্রীপক্ষ। যুক্তরাজ্যও মিত্রপক্ষে যোগদান করে। প্রথম দিকে চক্রীপক্ষ একের পর এক বিজয় অর্জন করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল জার্মানির বিরুদ্ধে এবং ডিসেম্বর মাসে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এ সময়ে শ্যাম (বর্তমান থাইল্যান্ড), লাইবেরিয়া, চীন, ব্রাজিল, গুয়াতেমালা, কোষ্টারিকা, নিকারাগুয়া, হাইতি, হণ্ডরাস প্রমুখও মিত্র পক্ষে যোগ দেয়। ১৯১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করে। এক মাসের মধ্যে তুরস্ক, অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরিও আত্মসমর্পণ করে। জার্মানির অভ্যন্তরেও দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। ১৯২৮ সালের ২৮ অক্টোবর কীল-এ নৌবাহিনী বিদ্রোহ করে; ৮ নভেম্বর মিউনিখে শুরু হয় বিদ্রোহ। এমতাবস্থায় ৯ নভেম্বর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম পদত্যাগ করেন এবং নেদারল্যান্ডে পালিয়ে যান। অনন্যোপায় চ্যান্সেলার প্রিন্স ম্যাক্সিমিলিয়ান ১১ নভেম্বর সকাল ১১ টায় মিত্রপক্ষের সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফক এর নিকট আত্মসমর্পণ করলে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে। এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম বিমান, সাবমেরিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধসমাপ্তির পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এর ১৪ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্যারিসের নিকটবর্তী ভার্সাইতে এক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে ২৮ জুন একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষে ৪.২ কোটি সৈন্য এবং চক্রীপক্ষে ২.৩ কোটি সৈন্য অংশগ্রহণ করে; তৎকালীন মূল্যে ১৮৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, একমাত্র বিট্রেনেরই ৬০০০ জাহাজ ধ্বংস হয়, জার্মানি একাই হারায় ২০০টি সাবমেরিন। এ যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটিতে এবং আহত হয় প্রায় দুই কোটি মানুষ। ভার্সাই চুক্তির শর্তানুসারে জার্মানি তার বিপুল এলাকা ও সাম্রাজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। জার্মানির ওপর অস্বাভাবিক অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং বাস্তবত জার্মানির সার্বভৌমত্বই খর্বিত করে দেয়া হয়। এ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই জাতিপুঞ্জ (League of Nations) এর জন্ম হয়। [হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি.), তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৩১৩]

এবং ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২য় বিশ্বযুদ্ধ[২৮] মিশরসহ সমগ্র 'আরব বিশ্বকে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

নেপোলিয়ন যখন মিশর আক্রমণ করে তখন সাথে করে তিনি পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, কারিগর ও নির্মাতাদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন। এমনকি স্থাপত্যশিল্প ও চিত্তবিনোদনের সরঞ্জামাদিসহ মুদ্রণযন্ত্র পর্যন্ত তিনি সাথে করে মিশরে এনেছিলেন। তিনি বহু বিদ্যালয়, হাসপাতাল, চিকিৎসা বিদ্যালয় ও থিয়েটার স্থাপন করেন। এ সকল প্রতিষ্ঠান ছাড়াও তিনি কারিগরি, বৈজ্ঞানিক অস্ত্র-শস্ত্র, জাহাজ, কল-কারখানার ন্যায় আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন

---

২৮ **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (Second World War):** প্রথম মহাযুদ্ধের পর সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তিতে পরাজিত জার্মানির ওপর যে সমস্ত অপমানজনক, ভারসাম্যহীন ও নির্যাতনমূলক শর্তাদি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো মেনে চলা কোনো দেশপ্রেমিক ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন জার্মানের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। মিত্র পক্ষের এ অদূরদর্শী ও প্রতিহিংসামূলক শর্তাবলিই ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ। এ কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং জার্মানদের উগ্র দেশপ্রেম ও আর্য আভিজাত্যবোধ। ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়েই হিটলার ভার্সাই চুক্তিকে উপেক্ষা করে শক্তি সঞ্চয় শুরু করেন এবং খণ্ডিত জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা ও জার্মানি সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টম্বর পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা করেন। ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২৮ সেপ্টেম্বর জার্মানি ও রাশিয়া পোল্যান্ডকে ভাগ করে নেয়। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে হিটলার ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করেন। অচিরেই নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গের পনত ঘটে। মে মাসে বেলজিয়ামেরও পতন ঘটে। ১৪ জুন নাৎসিবাহিনী প্যারিস দখল করে। আগষ্ট মাসে ১৫০০ জার্মান বোমারু বিমান দিয়ে ইংল্যান্ডে আক্রমণ করে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের বলিষ্ঠতার মুখে এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ক্রমশ হিটলার যুগোস্লাভিয়া এবং মুসোলিনি গ্রিস দখল করেন। বুলগেরিয়া, ইতালি, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া হিটলারের পক্ষ অবলম্বন করে। এতদিন যাবৎ সমাজতন্ত্র বিরোধী হিটলার ও সমাজতন্ত্রী ষ্ট্যালিন ছিলেন অন্তরঙ্গ মিত্র। কিন্তু বলদর্পী হিটলার ১৯৪১ সালের ২২ জুন অতর্কিত রাশিয়া আক্রমণ করে বসেন। পূর্বাঞ্চলে জাপান ১৯৪০ সালের জুন মাসের মধ্যেই ইন্দোচীন দখল করে নেয়। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর ৪২৩টি জাপানি বিমান হাওয়াইয়ের পার্লহারবারস্থ মার্কিন ঘাঁটি আক্রমণ করে বসে। পরদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪২ সালের মধ্যেই জাপান হংকং, ফরমোজা, মালয় ও বার্মা দখল করে নেয়। সিঙ্গাপুরেরও পতন ঘটে। এমতাবস্থায় ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই মিত্রতা গড়ে উঠে। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৪৩ সালে লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মান বাহিনী পরাজয় বরণ করে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে উত্তর আফ্রিকা থেকেও নাৎসিবাহিনীকে উৎখাত করা হয়। মিত্রশক্তির প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সেপ্টেম্বররে (১৯৪৩) মুসোলিনির পতন ঘটে এবং ইতালি আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই জার্মানি ইতঃপূর্বে দখলকৃত প্রায় সব এলাকাই হারিয়ে ফেলে। ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করেন এবং ২ মে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট জাপানের হিরোশিমা এবং ৯ আগষ্ট নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা বিষ্ফোরণের ফলশ্রুতিতে ২ সেপ্টেম্বর জাপানও আত্মসর্পণ করে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আনুমানিক ২.২০ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়, ৩.৪০ কোটি মানুষ আহত হয়, ১০০০ বিলিয়ন ডলারের উপর খরচ হয়, আরও ১০০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ ধ্বংস হয় এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় আরও কোটি কোটি মানুষের। এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতিসংঘের উদ্ভব ঘটে। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩]

করেন। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল।[২৯]এভাবে মিশর তথা 'আরব বিশ্বের আধুনিকীকরণে নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম অবদান রাখেন।

পরবর্তীকালে ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ আলী পাশা[৩০] মিশরের শাসনভার গ্রহণ করলে তিনি মিশরকে আধুনিকায়নের পথে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যান। ক্রমবর্ধমান আধুনিকায়নের এ ছোঁয়া সবকিছু ছাপিয়ে 'আরবি সাহিত্যেও এর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। 'আরবি সাহিত্যে সূচনা হয় নবজাগরণ। তৎকালীন কবি সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য ভাবধারার সাথে পরিচিত হয়ে নতুন সাহিত্য ধারার অবতারণা করেন। প্রাচীন 'আরবি সাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁরা এখন সাহিত্যের বিচিত্র ধারাও প্রকৃতির সাথে পরিচিত হতে থাকে, যা একসময় 'আরব সাহিত্যিকদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। যেমন: কথাসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য, সাংবাদিকতা সাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য, জাগরণী সাহিত্য এবং লোকসাহিত্য ইত্যাদি ছিল আধুনিক সাহিত্যের নতুন নতুন বিষয়গত উপাদান।

'আরবি সাহিত্যে আধুনিক রূপের সৃষ্টি ও বিকাশ ধারার সূচনা লগ্নে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে 'আরব বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধুনিকতার সাথে সাথে তাদের সাহিত্যেও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। সাহিত্যের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। 'আরবি সাহিত্যের আধুনিক এ বিতর্কে কোনোকোনো সাহিত্যিক প্রাচীন রচনারীতির অনুসরণ করেন। 'আরবি ভাষার সংরক্ষণ

---

২৯ আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *তা'রীখ আল-আদাব আল-'আরাবি* (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ্, ১৯৯৫ খ্রি., ২৬ তম সং.), পৃ. ৫৯৬।

৩০ মুহাম্মদ আলী পাশা (১১৮৩-১২৬৩ হি./১৭৬৯-১৮৪৯ খ্রি.) ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ও প্রতিভাবান শাসনকর্তা। তিনি ম্যাসিডোনিয়ার কাভালা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণকরেন। আলবেনীয় বংশোদ্ভুত সাধারণ সৈনিক মুহম্মদ 'আলী সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বলে স্থির গতিতে উন্নতি লাভ করেন। তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১২১৪ হি./১৭৯৯ খ্রি. সালে একটি বৃহৎ বাহিনী পরিচালনা করে জনসাধারণের নজরে পড়েন। তিনি ১২২০ হি./১৮০৫ খ্রি. সালে মিশরের গভর্নর (পাশা) নিযুক্তহন। গভর্নর হয়ে তিনি নামে মাত্র উসমানীয় খলিফার অধীনস্থ ছিলেন; কার্যত তাদের কর্তৃত্ব হতে তিনি স্বাধীন ছিলেন। তিনি মিশরে আধুনিক সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের অবসান করেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও পূর্ত কার্য, বিশেষত কৃষির জন্যসেচ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সুদান জয় (১২৩৬-১২৩৮ হি./১৮২-১৮২৩ খ্রি.) করেন। ব্রিটিশ, ফরাসি ও রুশ বাহিনীর একত্রে সমাবেশে উসমানী খলিফার পক্ষ হতে গ্রিসের যুদ্ধে ১২৪২ হি./১৮২৭ খ্রি.) সালে তিনি বিরাট সাফল্য লাভ করেন। সিরিয়া বিজয় ছিল তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আপস ব্যবস্থার দ্বারা তিনি উসমানী খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে ১২৫৬ হি./১৮৪১ খ্রি. সালে মিশর ও সুদান শাসনের স্থায়ী অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ইনতিকাল করেন। [*Encyclopaedia Britannica* (vii),c,. p. 85; Hitty, *History*. পৃ. ৭২২-৭২৪; *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্থান, নভেম্বর, ১৯৭৬), পৃ. ৯৫-৯৬।]

নীতির উপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাচীনপন্থীরা কঠোর সংরক্ষণ নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে 'আরবি ভাষার অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। আধুনিককালে সাহিত্যের প্রাচীন গতিধারা অব্যাহত রাখার এ আন্দোলনে যে সকল সাহিত্যিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাদের মধ্যে মিশরের আলী বাশা মোবারক, রিফা'আহ্ বে আত্-তাহতাভী (১৮৭৩), সিরিয়ার নাসিফ আল ইয়াযুযী (১৮৯১), ইরাকের মাহমুদ শুক্রী অন্যতম।

এক্ষেত্রে শাইখ নাসিফ আল-ইয়াযুযী পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকদের রচনায় আলংকারিক সৌন্দর্য ও ছন্দোবদ্ধ গদ্যের ব্যবহার অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। আলংকরিক সৌন্দর্যের বহুমাত্রিক প্রয়োগ এবং শাব্দিক সৌন্দর্য নিয়ে তাদেরকে খুবই যত্নশীল হতে দেখা যায়। এ সকল কারণে তাদের রচনাশৈলী ও শিল্প প্রয়াসে সৃজনশীলতার পরিবর্তে কৃত্রিমতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। ফলে এ ধরনের রচনারীতি জীবনকে সঠিকভাবে রূপায়িত করতে ব্যর্থ হয়। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক ভাষাবিদদের সমর্থনে 'আরবি গদ্যসাহিত্যে প্রাচীনকে ধারণপূর্বক আধুনিকরূপ দানের এ আন্দোলনকে আরও জোরালো হতে দেখা গেলেও তাদের হস্তক্ষেপে 'আরবি গদ্যে বাহ্যিক কাঠামোর প্রাধান্য বা অর্থের চেয়ে শব্দের প্রাধান্য অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ফলে 'আরবি গদ্য সাহিত্যে সৃষ্টিশীল ধারার উন্মেষ হয়ে উঠে সময় সাপেক্ষ।[৩১]

অন্যদিকে 'আরবি সাহিত্যে পুরাতন রচনারীতির পরিবর্তন সাধনে ব্রতী নিয়ে একদল সাহিত্যিক কাজ শুরু করেন; যারা সংস্কারপন্থী হিসেবে পরিচিত। এ দলের সাহিত্যিকগণ 'আরবি প্রাচীন রীতির সাহিত্যে অতিমাত্রায় সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারা সাহিত্যে নতুন ধারা সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হন। ফলে আধুনিক 'আরবি সাহিত্যে সংরক্ষণবাদ ও সংস্কারবাদ এর ন্যায় নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়। সংস্কারপন্থী সাহিত্যিকরা পাশ্চাত্যের আদলে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত হন। তাদের সাহিত্য সংস্কার নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের ছাঁচে একটি নতুন সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলা। অতিশয় পাশ্চাত্য ঘেঁষা সংস্কার নীতির কারণে 'আরবি গদ্য সাহিত্য তাঁর মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধারা প্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এসব লেখক ও সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্ম সমকালীন পাঠকদের সাহিত্য বাসনা পূর্ণ করতে এবং মানসিক ক্ষুধা নিবারণ করতে কিছুটা ব্যর্থ হয়।

---

৩১ হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবি আল-হাদিছ*, (বৈরূতঃ দার আল-জীল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২২।

সংস্কারপন্থী সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বাগ্রে যার নাম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন লেবাননের আহমাদ ফারিস আল-শিদইয়াক (১৮৮৭)। তিনি পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং তাদের জীবন প্রবাহ ও সংস্কৃতিকে খুব নিকট থেকে অনুধাবন করেন। ফলে তিনি তাদের জীবন ধারার সংস্পর্শ লাভ করেন। তাঁর মধ্যে সৃষ্টিশীল চিন্তার জাগরণ হয়। তিনি তাঁর লেখনীতে সরল ভাষায় পাঠককে আন্দোলিত করার প্রয়াস চালান। এজন্য সাহিত্য রচনায় তিনি আধুনিক রচনারীতির অনুসরণ পূর্বক সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আহমাদ ফারিস সংবাদপত্রকে তাঁর সাহিত্য দর্শন ও চিন্তাধারা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার সাথে সমকালের প্রখ্যাত কয়েকজন লেখক ও সম্পাদক একাত্মতা প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে *'হাদীকাত আল-আখবার'*এর সম্পাদক খলীল আল খূরী, *'আল-জিনান'* পত্রিকার সম্পাদক সালীম বুসতানী এবং *'আল-মুকতাত্বাফ ও আল-হিলাল'* পত্রিকার নিয়মিত লেখকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্য ঘেঁষা সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ করে পশ্চিমের দেশসমূহে বসবাসরত একদল লেখক 'আরবি সাহিত্য চর্চায় ভিন্ন মাত্রা সংযোজনের প্রচেষ্টা চালান। তাঁদের রচনায় পাশ্চাত্য ধারা অনুসরণের বিষয়টি প্রবলভাবে দৃশ্যমান হয়। আধুনিক 'আরবি সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারা বিবর্তনে এদের ভূমিকা কিছুটা স্পর্শকাতর। 'প্রবাস সাহিত্য'[৩২] নামে একনতুন ধারার রচনাশৈলী সংযোজনের মাধ্যমে তারা 'আরবি সাহিত্যে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন। জিবরান খলীল জিবরান এ ধারার

---

৩২ **প্রবাস সাহিত্য:** আধুনিক 'আরবি সাহিত্যে এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য মতবাদের নাম। উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে লেবাননের রাজনৈতিক অস্থিরতা,ধর্মীয় কোন্দল,অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ইত্যাদি থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় এবং আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে কিছু 'আরব খ্রিষ্টান উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রবাস জীবন বেছে নেন। এ সব প্রবাসী আরবের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এসব কবি সাহিত্যিকের সৃষ্টি-কর্মে নতুন জীবনের উপস্থাপনা, স্বাধীন অনুভূতির বহি:প্রকাশ ও ঐতিহ্যবাহী 'আরব জীবন ধারার বন্দনা ফুটে উঠেছে। তাঁরা প্রাচীন কাব্য নির্মাণ শৈলীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে প্রচলিচ ছন্দের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তির আহ্বান জানায়। এ সকল সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মকে 'প্রবাস সাহিত্য' নামে অভিহিত করা হয়। জিবরান খলীল জিবরান এ ধারার সাহিত্যর উজ্জ্বলতম নিদর্শন। এ সংঘের অন্যান্য সদস্যরা হলেন নাসীব আরীদা 'আব্দুল মাসীহ হাদ্দাদ,মীখাঈল নু'আয়মা, ঈলিয়্যা আবু মাদী,রশীদ আয়য়ূব, নাদরাতু হাদ্দাদ প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ গোষ্ঠীটি প্রাচীন রীতির সাহিত্যে অতি মাত্রায় সংস্কারবাদী মানসিকতার প্রচার করে। দ্বিতীয়টি ১৯৩৩ খ্রি. দক্ষিণআমেরিকার ব্রাজিলে আল-উসবাহ আল-আন্দালুসিয়্যাহ্ নামে গঠিত হয়। এর সদস্যরা হলেন রশীদ খূদী, শুকরুল্লাহ আল-জির, হালীম খূরী, ফাউযী আল-মা'লুফ,শাফীক, রিয়াদ আল-মা'লুফ,ইলইয়াস ফারহাত, নুমা কাবান প্রমুখ। 'আরবি সাহিত্যকে সর্ব প্রকার বাধ্যবাধকতামুক্ত করা এবং ভাষা প্রয়োগে নৈপুণ্য প্রদর্শন; বিশেষত অর্থের সৌন্দর্য, গভীরতা, তীক্ষ্ণতা, বিশ্বমানের শিল্প এবং নির্মাণশৈলীর বাস্তব প্রতিকৃতি স্থাপনই এ ধারার সাহিত্যের মর্মকথা। নতুন ধারার রচনাশৈলী সংযোজনের মাধ্যমে তারা 'আরবি সাহিত্যে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন। [ড. সাইয়্যিদ হামীদ আল-নাসসাজ ও সহযোগীবৃন্দ,*আল-আদাব আল-'আরাবি আল-হাদিস* (মিশর: ওযারাত আত-তারবিয়্যাহ্ ওয়া আত-তা'লীম,১৯৯৭ খ্রি.), পৃ.৯৩

সাহিত্যের উজ্জলতম ব্যক্তিত্ব। এ ধারার মূল রচনারীতি হচ্ছে, আধুনিক যুগে এসে 'আরবি সাহিত্যকে সকল ধরনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করা এবং ভাষা প্রয়োগে সর্বাধুনিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করা। বিশেষ করে 'আরবি সাহিত্যকে বিশ্বমানের নির্মাণশৈলীতে রূপান্তরিত করতে অর্থের সৌন্দর্য এবং ভাবের গভীরতা ও তীক্ষ্ণতার উপর জোর প্রদান করাই ছিল প্রবাস সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। 'শিল্পের জন্য শিল্প' এ স্লোগানকে 'আরবি সাহিত্যে রূপদান করা ছিল এ সাহিত্য ধারার মূলকথা। ভাষা প্রয়োগের নৈপুণ্য, সৌন্দর্যের আকর্ষণ, নির্মাণ শৈলীর প্রাধান্য ইত্যাদি শিল্পগুণ এই সময়ে 'আরবি সাহিত্যে সমৃদ্ধি এনে দেয়। তথাপি এ ধারার সাহিত্যিকদের অতিমাত্রায় পশ্চিমা প্রীতি ও অন্ধ অনুকরণের সীমাহীন উদ্যোগ 'আরবি সাহিত্যকে নেতিবাচক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। ফলে 'আরবি সাহিত্যের এরূপ পরিস্থিতির উত্তরণে সমন্বয় বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে 'আরবি সাহিত্য তার তৃতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়।[৩৩]

তৃতীয় পর্যায়ে এসে 'আরবি সাহিত্য এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। এ পর্যায়ে 'আরবি গদ্য সাহিত্যের প্রাচীন রচনারীতির ঐতিহ্যগত রূপ এবং সদ্য সূচিত ও নির্মিত আধুনিক ধারার রচনাশৈলীর মধ্যে সমন্বয় বিধানের একটি প্রচেষ্টা জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ প্রচেষ্টায় যারা সাহিত্য রচনায় অবদান রাখেন তারা মধ্যমপন্থী হিসেবে পরিচিত। এ পর্যায়ের লেখক ও সাহিত্যিকগণ তাদের রচনাশৈলীকে মূল ভাবকেন্দ্রিক আবর্তিত করার প্রয়াস রাখেন এবং তাদের সামগ্রিক সাহিত্য ভাবনা ও রচনারীতির দৃষ্টিভঙ্গিকে মূল ভাব ও বিষয়ের সাথে সূত্রায়িত করে তারা সৃষ্টিশীল আধুনিক সাহিত্য রচনায় আগ্রগামী হন। এভাবে 'আরবি সাহিত্যকে একটি সুসংহত ভিত্তি ও সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়তাঁরা নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে লেখকগণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, পরিশীলিত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার সহযোগে ঐতিহ্যগত প্রাচীন 'আরবি সাহিত্য এবং পশ্চিমা সাহিত্যের আধুনিক ধারা ও নির্মাণশৈলীর মধ্যকার এক অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটান। এ পর্যায়ের লেখক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এবং ইব্রাহীম আল ইয়াযুযী[৩৪] অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন।[৩৫]

---

৩৩ হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবি আল-হাদিছ* (বৈরূতঃ দার আল-জীল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২২-২৩।

৩৪ ইব্রাহীম আল ইয়াযুজঃ ইব্রাহীম আল ইয়াযুজ ১৮৪৭ খ্রি. বৈরূতে জন্মগ্রহণ করেন। 'আরবি সাহিত্যে রেনেসাঁ আন্দোলনের অগ্রপথিক। টাইপ রাইটার যন্ত্রে তিনি প্রথম 'আরবি অক্ষরের প্রবর্তন করেন। তিনি ১৮৯৪ সালে মিশর

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সাহিত্যের আধুনিকায়ন, মুসলিম জাতির জাগরণ এবং এতদোভয়ের মৌলিক কাঠামোতে সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'আরবি ভাষায় বিশুদ্ধ রচনারীতি ও আধুনিক রচনাশৈলীর প্রচলন করেন। তিনি তাঁর রচনায় প্রাচীন লেখকদের অনুসরণ এবং সদ্য সূচিত আধুনিক জীবনাচার লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 'আরবি সাহিত্যে আধুনিক ধারা প্রবর্তনের প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন করেন। 'আবদুহ্ এর সাহিত্যে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপিত হয়। গণ-মানুষের মুক্তি-স্বাধীনতা, অধিকার ও স্বাধিকারের কথা তিনি তাঁর রচনায় বলিষ্ঠভাবে চিত্রায়নের প্রয়াস পান। এ পর্যায়ের সাহিত্যে জীবন সমস্যার সমাধান, স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রতকরণ, শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গ বারবার জোরালোভাবে আলোচিত হতে থাকে। 'আবদুহ্র ন্যায় তৎকালীন অন্যান্য মধ্যমপন্থী লেখকদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত ভাবনা ছিল এরূপ যে, তাঁরা 'আরবি সাহিত্যের লালনক্ষেত্র মিশরের শাসন ব্যবস্থাকে পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার আহ্বান জানায়।[৩৬]

এ পর্যায়ের 'আরবি সাহিত্যে সমকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দ, লেখক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিকসহ সমাজের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা ও লেখনীতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণকে 'বিদেশি তাড়াও, বিদেশি খেদাও' আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানানো হয়।[৩৭] এই সময়ে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে যারা 'বিদেশি খেদাও' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সে সকল বাগ্মী ও কলম সৈনিকদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব।

এ পর্যায়ে 'আবদুহ্সহ আরও অনেক সমসাময়িক সাহিত্যিক 'আরবি গদ্য সাহিত্যে আলংকারিক সৌন্দর্যের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ পরিহারের মাধ্যমে একে জীবনমুখী ও সমাজধর্মী করে তোলার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হন। এ ধরনের সাহিত্যে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ন্যায় সামাজিক ব্যধির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সাহিত্যকে কাজে লাগানো হয়। ফলে যুক্তিনির্ভর রচনা ও

আসেন এবং সেখানেই ১৯০৬ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। [*আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাহ ওয়া আল-আ'লাম*(বৈরূত: দার আল-মাশরিক, ২৮ তম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৬১৭।]

৩৫ হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফী তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবি আল-হাদিছ*,(বৈরূত: দার আল-জীল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৩।

৩৬ 'উমার আল-দাসুকী, *ফি আল-আদাব আল-হাদিস*, (কায়রো: দার আল-ফিক্র, তা.বি. ৮ম সংস্করণ), পৃ. ৩১৩।

৩৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২-৩১৩।

বাস্তবধর্মী সাহিত্য ধারার প্রয়োজন প্রবলভাবে অনুভূত হয়। 'আরবি গদ্য সাহিত্যের আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় 'আবদুহ্ এর অবদান চিরস্মরণীয়। বিশেষ করে আধুনিক 'আরবি গদ্য সাহিত্যের গতিধারা নিরূপণে 'আবদুহ্ এর ভূমিকা 'আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

আধুনিক 'আরবি সাহিত্যের চলমান এ সংকটময় গতিধারায় প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্য বিতর্ক যখন সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়; 'আরবি কথা সাহিত্যে তখনও উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। পাশ্চাত্য ধারায় সাহিত্যকর্ম রচনা তৎকালীন সাহিত্য সমাজের সর্বত্র গ্রহণযোগ্য ছিলনা। বিশেষ করে 'আরবি গদ্য সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাসের অনুপ্রবেশের বিষয়টি ছিল অনেকের নিকট অসমর্থনযোগ্য। কেননা তখন পর্যন্ত পশ্চিমা ধারার গল্প ও উপন্যাসের ন্যায় নতুননতুন বিষয় 'আরবিতে অধ্যয়নের জন্যপাঠকের যথেষ্ট অভাব ছিল। তাছাড়া এ সকল ভাব ও বিষয়বস্তু ছিল সাধারণ আরবদের রুচি বহির্ভূত। অন্যদিকে ধর্মীয় গোঁড়ামিবশত অনেকেই গল্প-উপন্যাসের বিষয়টিকে আধুনিক 'আরবি সাহিত্যের গোড়ার দিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। পাশ্চাত্য গল্প ও উপন্যাসকে সাহিত্যে স্থান দেয়ার বিষয়টি সুধী সমাজে প্রথম দিকে বিতর্কের বিষয় ছিল। মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ (১৮৫০-১৯০৫ খ্রি.) এবং তাঁর শিষ্য রাশিদ রিদা (১৮৬৫-১৯৩৫ খ্রি.) এ ধরনের সাহিত্যের সমর্থনে প্রবন্ধ লিখেন।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ '*আল-আহরাম*' পত্রিকায় 'আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা ওয়া গায়রুহা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে চিত্তবিনোদনের জন্য গল্প সাহিত্য লেখা বা পড়া প্রশংসনীয় হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩৮] 'আবদুহ্ এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যখন গল্প সাহিত্যের ন্যায় স্পর্শকাতর বিষয়ে এ ধরনের ইতিবাচক বিবৃতি প্রদান করেন তখন সাহিত্য অঙ্গনে এ বিষয়টির একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। ফলে তৎকালীন সুধী সমাজে ও ধর্মীয় মহলে সাহিত্যের এ নতুন ধারাটি ব্যাপক উৎসাহ লাভ করে। 'আরবি গল্প সাহিত্যের গতিধারা সম্পর্কিত 'আবদুহ্ এর তৎকালীন ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। কেননা 'আরবি সাহিত্যের নতুন এ ধারার বিষয়ে সেসময় তিনি যদি কোনো সাহসী উদ্যোগ কিংবা যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন, তাহলে হয়তোবা বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে এসেও 'আরবি সাহিত্যে গল্প লেখার যাত্রা গতিময় হতোনা। যদিও

৩৮ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড,পৃ. ১৫৪-১৫৬।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই 'আরবি গল্প সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সময়ের সাহসী ও বিবেকবান শক্তিশালী লেখক। নানা দ্বিধা, বাধা ও ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি গদ্য সাহিত্যের গতিধারা নিরূপণে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর সৃষ্টিকর্মেই তাঁর দৃঢ় সাহস, মনোবল ও যুক্তিবাদের ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক 'আরবি সাহিত্যে 'আবদুহ্ এর অবদান

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক উসমানি খিলাফত বিলুপ্তকরণ হয় এবং উনিশ শতকের শেষার্ধে ইসলাম ধর্মের উপর পশ্চিমাদের নানামুখী আঘাত আসতে থাকে সেসময় কোনো কোনো মহলে এটা অনুভূত হয়েছিল যে, ইসলাম গুরুতর বিপদে রয়েছে।এই সময়ে তরুণ প্রজন্মের লেখক ও সাহিত্যিকেরা মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর চিন্তা-দর্শন ও লেখনী দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং ক্ষমা বা সহিষ্ণুতার ন্যায় ইসলামের মহৎ গুণগুলোকে ধারণ করে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর ন্যায় ত্বাহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.), মোহাম্মদ হোসাইন হায়কাল (১৮৮৮-১৯৫৬ খ্রি.), আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.) এবং তাওফিক আল-হাকিম ও (১৮৯৮-১৯৮৭ খ্রি.) ইসলামকে রক্ষার জন্য এবং একে সমসাময়িক মিশরীয়দের সমস্যার সাথে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক করে তোলার চেষ্টায় নিবেদিত ছিলেন।তাঁরা 'আরব সমাজগুলোকে ইসলামের ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনর্মূল্যায়ন করেন। একইভাবে তাঁরা সাহিত্যে নবি মোহাম্মদ (সা.) এর জীবন ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির মধ্যদিয়ে এক বিশাল সংখ্যক ইসলামী জীবনী রচনার মাধ্যমে আধুনিক 'আরবি সাহিত্যকেসমৃদ্ধ করার প্রয়াস চালান। এ প্রেক্ষিতেতাঁরা ইসলামকে তৎকালীন 'আরব সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। অধিকন্তু তাঁরা এটাও নির্দেশ করেন যে, ক্লাসিক্যাল 'আরবি এবং কোরআন মাজিদের ভাষা উন্নতি ও প্রগতির পথেঅন্তরায় নয়।[৩৯] আর এটা অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয় যে, এ ধরনের প্রেক্ষাপট অবলোকন করে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও চিন্তাধারায় উৎসুক অনেক লেখকই এগুলিকে

৩৯ Mahdi Ismat, *Modern Arabic Literature,* (Hyderabad: Rabi publishers,1983 AD), p. 14

আধুনিক 'আরব পাঠকদের নিকট পরিচিত করে দিতে দারুণভাবে উদগ্রীব হয়েছিলেন। আর তারাও ইসলাম সম্পর্কে জানতে ও শিখতে তাদের প্রচুর মেধাশক্তি উৎসর্গ করেছিল।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর বিভিন্ন কার্যাবলি যদিও মূলত 'আরবি ভাষার পুনরুজ্জীবনে উৎসর্গীকৃত ছিল, তথাপি তিনি ইসলামকে সকল ধরনের ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে আল-আযহারের সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হোন। তিনি আরবিতে উপন্যাস লেখার পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণপূর্বক ঔপন্যাসিকদের উৎসাহ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অনুপ্রেরণা ও পরিচালনায় সাইদ আল বুস্তানি (মৃত্যু ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর 'ধাত-আল-খিদর' গল্পটি ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। 'আবদুহ্ উপন্যাসকে সমাজ সংস্কারের একটি কার্যকর সাহিত্য উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি '*আল-আহরাম*' পত্রিকায় একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন যেখানে তিনি তাঁর সময়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করেছিলেন।[৪০]

'আবদুহ্ পাঠকদের মনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণপূর্বক এ বিষয়টি উদঘাটন করেন যে, শ্রোতা বা পাঠকগণ ইতিহাসের বিষয়সমূহ, নৈতিক বিষয় সম্পর্কিত নিবন্ধমালা এবং উপন্যাসকে খুব পছন্দ করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে 'আবদুহ্ যদিও কল্পকাহিনিকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু কল্পকাহিনি নির্ভর উপন্যাসের বিকাশে তাঁর ভূমিকা কখনও অন্যকে নিরুৎসাহিত করা কিংবা প্রশংসিত না করার দিকে যায়নি।[৪১] 'আবদুহ্ সাহিত্যের এ নতুন ধারণাকে অভ্যর্থনা জানাতে এবং একে বিকাশমান করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে একটি উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক আবহ সৃষ্টি করেন। তিনি মনে-প্রাণে ধারণ করতেন যে, মূলত ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনোও বিরোধ নেই। এ মর্মে তিনি নির্দিষ্ট কিছু কোরআনের আয়াতকে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং ইসলামী দার্শনিক মতবাদের অপর্যাপ্ততা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি সংস্কার আনতে ধর্মীয় জাগরণের পক্ষে ছিলেন। [৪২]

---

৪০ Abduh, al-Shaykh Mohammad, *Al-Kuttab al-'Ilmiyyah wa Ghayruha* [scientific Books and others] Al-Ahram. Al-Ahram Weeklyonline.11 May 1881. Web 14 Aug. 2008. <http://weekly.ahram.org.eg12001/529/bo1.html>

৪১ Moosa, Matti.*The Origins of Modern Arabic Fiction* (London:Lynne Rienner publishers,2nd edition, 1997), p.16

৪২ Hitti P.K., *History of the Arabs* (New York:10th edition, 1970), p. 754

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
জাগরণি সাহিত্যে 'আবদুহ্ এর অবদান

যে সকল প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও শিল্পীদের প্রচেষ্টায় আধুনিক 'আরবি সাহিত্যের উন্নয়ন সাধিত হয় এবং 'আরবি সাহিত্য নতুনত্ব লাভ করে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁদের অন্যতম বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার। সাংবাদিকতার মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা। স্বাধীনতার সমর্থক 'আবদুহ ঔপনিবেশিক শাসনের যেমন বিরুদ্ধে ছিলেন তেমনি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেও ছিল তাঁর কঠোর অবস্থান। এ কারণে তাঁকে নির্বাসনেও যেতে হয়। দেশ ও জাতির সেবা করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত; এই ব্রত পালনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি বক্তৃতা প্রদান ও লেখনীকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতায় সুপ্ত মুসলমানের ঘুমের ঘোর কেটে যায় এবং মিশরীয় তরুণ লেখকগণ সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়। তাঁর সাহিত্যে স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম ও ইসলামের প্রতি আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে তরুণ সমাজকে তিনি তাঁর সাহিত্যে দেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাই গৌরবময় যা কিছু তাঁর চোখে পড়েছে তাই তিনি সন্নিবেশ করেছেন তাঁর বাগ্মিতা ও সাহিত্যে। পরবর্তীকালে এ ঐতিহ্যবোধই তাঁর বাগ্মিতা ও সাহিত্য সৃষ্টির মূল উপাদানে পরিণত হয়। বাগ্মিতা তাঁর এক ধরনের সহচর হয়ে দাঁড়ায় এবং সাহিত্য তাঁর বাগ্মী জীবনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইসলামী ঐতিহ্যকে 'আরবি সাহিত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করে সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করাও ছিল তাঁর একটি লক্ষ্য।[৪৩]

মিশরীয় মুসলমানের সাহিত্য সাধনার এবং জাতীয় জীবনের ইতিহাসে 'আবদুহ্ এর অবদান কোনো অংশে কম নয়। একদিকে মিশরীয় মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনবাদ, অন্যদিকে বিশ্ব মুসলমানের সংঘবদ্ধতাজনিত 'প্যান-ইসলামীজম' দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। মুসলিম জাতীয়তার পরিকল্পনায় তিনি শাইখ জামাল উদ্দীন আফগানীর ভাবাদর্শবাহী এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে ইসলামী জীবন দর্শনের ব্যাখ্যাকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

৪৩ Moosa, Matti. *ibid*, p.16

মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গানো ছিল তাঁর আমৃত্যু সাধনা। নিপীড়িত মুসলমান জ্ঞানে, কর্মে, শিল্পে-সাহিত্যে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ও সভ্যতায় সমুন্নত হোক এটাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর প্রবন্ধগুলোতে যে ভাবাদর্শ ও মতবাদ প্রচারিত হয়েছে তাঁর জীবনবিন্যাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও অনুরূপ আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। 'আবদুহ্ একজন স্বপ্নাতুর লেখক ছিলেন। তাঁর রচনার ভাষা ছিল বিশুদ্ধ ও অনলবর্ষী। ভাষার কাঠামো ছিল রূপক, কিন্তু ঐশ্বর্যময় ও অমৃতময়। সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যান্য লেখকের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা ছিল মূলত ভাব বা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে নয়। তাঁর প্রতিবাদী লেখনি স্বজাতির প্রতি কুৎসা ও বিরূপতা প্রকাশের প্রতিবাদে শাণিত হয়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন যথার্থই প্রতিবাদী লেখক। মুসলিম জাতীয় চেতনাকে সামনে রেখে তিনি যে প্রতিবাদ করেছিলেন তা ছিল অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সত্য ও কল্যাণের জন্য, নিজেকে চেনার জন্য, জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য।

ইসলামী চিন্তাধারার সঙ্গে আধুনিক জীবনবোধের সমন্বয় বিধান করে কিভাবে অনুন্নত মুসলিম জাতিকে সমকালীন বিশ্বব্যবস্থায় একজন যোগ্য ও আদর্শবিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায়, 'আবদুহ্ সাহিত্য ও দর্শনের মধ্য দিয়ে এরই পথ নির্দেশ করতে প্রয়াস পান। তাঁর নীতি, জ্ঞান ও বিবেকবোধ স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদকে সহ্য করতে আদৌ প্রস্তুত ছিলনা। তাই জীবনের একটি সময়ে তাকে অন্তরীণ থাকতে হয়েছিল। জামাল উদ্দীন আফগানীর রচনা ও বক্তৃতা সেই সময়ের আদর্শবাদী গণ-মানুষ এবং দেশপ্রেমিক মুসলমানদের এক বিপ্লবী চেতনায় উদ্ভাসিত করে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রবল অনুপ্রেরণা 'আবদুহ্ তাঁর থেকেই লাভ করেন। 'আবদুহ্ এর সাহিত্যিক মানস গঠনে আফগানীর প্রভাব কতটা গভীরভাবে তাঁকে স্পর্শ করেছিল; পরিণত বয়সে তাঁর সাহিত্যকর্ম ও কর্মপ্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করলেই তা খুব সহজে অনুভব করা যায়। সাহিত্যে তাঁর স্বতন্ত্রপন্থী চিত্তের পরিচয় মেলে এবং সাহিত্যকে তিনি সমাজ সংস্কারের উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন।[৪৪]

৪৪ 'উমার আল-দাসুকী, *ফি আল-আদাব আল-হাদিস* (কায়রো: দার আল-ফিক্‌র, তা.বি. ৮ম সংস্করণ), পৃ. ৩০৪।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল জাতি-গোষ্ঠী দাসত্বের যাতাকলে পিষ্ট এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান, তাদের স্বপক্ষে 'আরবি সাহিত্যে যে সকল সাহিত্যিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন তাঁদের একজন। আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর বক্তৃতা ও সাহিত্যে মিশরের ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থা চিত্রায়নের প্রয়াস পান। সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর অনলবর্ষী বক্তব্যে তৎকালীন মিশরীয় জাতির তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটে এবং নতুন করে বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহায় জাগ্রত হয়ে তারা শোষণ ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে জামাল উদ্দীন আফগানীও ছিলেন এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা; যার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বৈষয়িক পাণ্ডিত্য ও ধর্মীয় চেতনা সম্বলিত বক্তৃতা-বিবৃতি সমগ্র মিশরীয় জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।[৪৫]

মুসলমানদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করার জন্য ইসলামের অতীত শৌর্য-বীর্যের বর্ণাঢ্য বিবৃতি যেমন রয়েছে তাঁর সাহিত্যে তেমনি আছে যুগচেতনার পটভূমিকায় মুক্তিবুদ্ধির চিন্তা-চেতনায় আত্মোপলব্ধির সঞ্জীবনী মন্ত্র। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুসলিম নবজাগরণের উন্মেষে 'আরবি ভাষায় যে সকল নতুন সাহিত্য ধারা সৃষ্টি হয়েছিল 'আবদুহ্ এর রচনার প্রভাব সে সকল সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর সাহিত্য ছিল আধুনিক 'আরবি গদ্য সাহিত্যের এক নতুন উপাদান। এ পর্যায়ের গদ্য সাহিত্যে জীবনের সমস্যাসমূহ, বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর স্বাধীনতা ও শান্তি অর্জনের আকুল আর্তি এবং পশ্চাৎপদ জাতি সত্ত্বার পুনর্জাগরণ সংঘটনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।[৪৬]

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে যখন 'উরাবি বিদ্রোহ সংগঠিত হয় তখন সমগ্র মিশর ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীনে ছিল। জামাল উদ্দীন আফগানী ঔপনিবেশিক এ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে জেগে ওঠেন। এ সময় জামাল উদ্দীন আফগানী এবং তাঁর মিশরীয় শিষ্য মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর প্রভাব মিশরের সমগ্র লেখক প্রজন্মের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। 'আবদুহ্ এর এ সকল বুদ্ধিজীবী শিষ্যের মধ্যে কয়েকটি

৪৫ *প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫*

৪৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০৪-৩০৮।

বিখ্যাত নাম রয়েছে; যারা মিশরীয় সংস্কার আন্দোলনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন কাসিম আমিন (১৮৬৫-১৯০৭ খ্রি.); যিনি তাঁর লেখনীতে নারীদের অকুণ্ঠ সমর্থন যুগিয়েছেন। নীল নদের কবি হাফিজ ইবরাহীম (১৮৭২-১৯৩২ খ্রি.), মুস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮ খ্রি.); যিনি মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরএকজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং মুহাম্মদ আল-মুওয়ায়লিহি[৪৭] (১৮৫৮-১৯৩০) সহ প্রমুখ।[৪৮] আল-মুওয়ায়লিহি একজন মিশরীয় সাংবাদিক; যার ক্ষুরধার লেখনীতে ছিল দ্রোহ ও প্রতিবাদের শক্তিশালী উপাদান।

৪৭ মুহাম্মদ আল-মুওয়ায়লিহি: মুহাম্মদ আল মুওয়ায়লিহি ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের রাজধানী কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। লোহিত সাগরের তীরবর্তী মুওয়ায়লিহি নামক স্থানের অধিবাসী হওয়ায় তাঁকে মুওয়ায়লিহি নামে অভিহিত করা হয়। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। আরবি, ফরাসি ও ইতালিয়ান ভাষায় তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৯৩০ খ্রি.তিনি পরলোক গমন করেন। [দ্র. ইউসুফ কাওকান, *'আলাম আল-নাছ্র ওয়া আল-শি'র ফি আল-'আছর আল-হাদিস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫-২৩৭]

৪৮ Allen Roger, *Writings of Members of the Nazh Circle,Journal of the America Research centre in Egypt*, Issue-8, Year- 1970, P. 79

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
সাংবাদিকতা সাহিত্যে 'আবদুহ্ এর অবদান

আধুনিক 'আরবি সাহিত্যে সাংবাদিকতা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য উপাদান। সংবাদপত্রের মাধ্যমে শুধু দেশ নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও খেলাধুলাসহ জগতের সকল তথ্য ও সংবাদ একইসঙ্গে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম, যার মাধ্যমে পাঠক সমাজ শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐকান্তিক সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে এবং তারা তাদের আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করে। তাছাড়া একজন আধুনিক মানুষ তার পূর্ব পুরুষদের ন্যায় বিশাল বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।[৪৯] তাই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সাংবাদিকতা সাহিত্যের ন্যায় আধুনিক জীবনের অতি প্রয়োজনীয় এ অনুষঙ্গকে দেশ, জাতি ও ইসলামের সেবায় কাজে লাগাতে উদ্যোগী হোন।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তাওফীক পাশার শাসনামলে প্রকাশনা ও মুদ্রণ শিল্পের জন্য স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কেননা এই সময়ে সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতার সুযোগে কোনো কোনো সংবাদপত্র অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি ও স্বেচ্ছাচারিতার চর্চা শুরু করে। অতঃপর 'উরাবী বিপ্লবোত্তর সময়ে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা মিশর অধিকার করে। এই সময়ে দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পায়। বিশেষত লর্ড ক্রোমারের শাসনামলে প্রকাশনা নীতিমালা সহজীকরণ করায় সংবাদপত্রের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে মিশরে সর্বাধিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।[৫০] এই সময়ে সাংবাদিকতা সাহিত্যে সংবাদ পরিবেশনের চেয়ে সাহিত্য নির্ভর প্রবন্ধ পরিবেশনের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব পায়। এ ছাড়াও সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা সাহিত্যের প্রভাব জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়।

---

৪৯ ড. শাওকী দায়ফ, *ফি আল-নাকদ আল-আদাবি* (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ২০১।

৫০ জুরযী যায়দান, *তারীখু আদাব আল-লুগাত আল- 'আরাবিয়্যাহ্* (মিশর: দার আল-হিলাল, ১৯৯৩ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯।

আরবি সাহিত্যে রেনেসাঁর জোয়ার যখন পূর্ণমাত্রায় প্রবহমান, তখন সাংবাদিকতা সাহিত্য সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এবং ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বিশ্ববিশ্রুত নেতা জামাল উদ্দীন আফগানী যখন মিশরীয় জীবন ধারায় একটি সর্বাত্মক সংস্কারের লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলনের সূচনা করেন। আফগানীর এ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে মুহাম্মদ 'আবদুহ্, রাশীদ রিদাসহ প্রমুখ এগিয়ে আসেন। তাঁদের এ আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল সংবাদপত্র। ফলে তাঁদের প্রবন্ধে অধিকতর বাস্তববাদী চিন্তা-চেতনাসমূহের প্রতিফলন ঘটে; একইভাবে পরিশীলিত শব্দ চয়ন এবং পরিচ্ছন্ন রচনারীতি ছিল তাদের সাংবাদিকতা সাহিত্যের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এ পর্যায়ের প্রাবন্ধিকগণ সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট সকল অনিষ্টকর উপাদান উচ্ছেদের জন্য প্রচেষ্টা চালান।

এদের মধ্যে আদীব ইসহাক, 'আবদুল্লাহ নাদীম, মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ও ইব্রাহীম আল-মুওয়ায়লিহী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয়।[৫১] তাঁদের প্রবন্ধ বহুলাংশে রাজনীতি বিষয়ক হলেও সাংবাদিকতা সাহিত্যে এটি একটি ভিন্ন মাত্রা সৃষ্টির মাধ্যমে লেখালেখির অঙ্গনকে আরও বিস্তৃত করে তোলে। এ ধরনের লেখায় গঠনমূলক রাজনৈতিক আলোচনা ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সমাজের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হতে থাকে। এ সময়কালের সাংবাদিকতা তথা প্রবন্ধ সাহিত্যের দুর্বার আন্দোলনে এবং জীবন ঘনিষ্ঠ লেখনীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'আবদুহ্ এর তৎকালীন প্রবন্ধসমূহে কেবল সমাজ-রাজনীতি নয়; বরং ধর্ম-দর্শনসহ জীবনের লৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়সহ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোকপাত করা হতো। 'আবদুহ্ এর প্রবন্ধ ছিল সমাজ সংস্কারের অন্যতম এক হাতিয়ার। ব্যক্তি মানসের জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়সহ 'আবদুহ্ এর প্রবন্ধাবলি তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে মিশরবাসীকে দেশপ্রেম ও জাতীয়বাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। ফলে মিশরবাসীরা যখন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে, তখন তারা সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশকতাবাদের অবসানকল্পে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। তাঁর লেখনীর ফলে মিশরে বিভিন্ন নতুন নতুন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে।[৫২]

---

৫১ ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসাইন, *আল-আদাব আল-হাদিছ* (রিয়াদ: ১৯৯৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০।

৫২ *প্রাগুক্ত*।

প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। আর এ সকল সংগঠনের আন্দোলন পরিচালনায় সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। যেমন: 'ইসলাহ্' নামক সংগঠনটি আল মু'আয়্যিদ পত্রিকার মাধ্যমে তাদের প্রচার কার্য চালাতো। মুস্তাফা কামিল *আল-হিযব আল-ওয়াতানী আল-লিওয়া* পত্রিকার মাধ্যমে সংগঠনের মতাদর্শ প্রচার করতেন। একইভাবে লুৎফী আল-সাইয়্যিদ তাঁর 'হিযব আল-উম্মাহ' দলের পক্ষে '*আল-জারিদাহ*' পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে মিশরের বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজসহ সাধারণ মানুষকে ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে সক্ষম হন। এ পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহের ভাষা সৈরাচারের বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষকে তীব্রতর করার প্রয়োজনে অধিকতর শক্তিশালী ও বলিষ্ঠরূপ নিতে দেখা যায়।[৫৩]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কেবল অন্যান্য লেখক, কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদেরই অধীনেই সাংবাদিকতা সাহিত্য চর্চা করেননি; বরঞ্চ নিজ সম্পাদনায়ও তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সরাসরি প্রকাশ করেন। তাঁর চিন্তা ও দর্শনের আধুনিকতম রূপ তিনি তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দ্বিধা ও সংকোচহীনভাবে ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে প্যান-ইসলামী আন্দোলনের শাইখ জামাল উদ্দীন আফগানী এবং মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে '*আল-হিনদিয়্যাহ্*' ও '*আত্-তাতারিয়্যাহ*' উল্লেখযোগ্য। এ সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়াও মুহাম্মদ 'আবদুহ্মিশরের সরকারি পত্রিকা '*আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিশরিয়্যাহ্*' এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে রাষ্ট্রীয় এ গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

আল 'উরওয়াতু আল- উসকা[৫৪]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ যে সকল পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে আধুনিক সাংবাদিকতা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন '*আল-'উরওয়াতু আল-উসকা*' সেগুলোর অন্যতম। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জামাল উদ্দীন আফগানী কিছুদিনের জন্য লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। অল্প কিছুদিন পর তিনি যখন

---

৫৩ *প্রাগুক্ত*।

৫৪ পত্রিকাটির নাম *العروةالوثقىوالثورةالتحريريةالكبرى* এ পত্রিকাটি ১৩ মার্চ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহকীক করেছেন সালাহুদ্দীন আল-বুসতানী। পরবর্তীতে পত্রিকাটিতে শাইখ মুহাম্মদ আবদুহু এবং সায়্যিদ জামালুদ্দীন আল-আফগানীর ছবিসহ প্রকাশ করা হয়। [*আল-'উরওয়াতু আল-উসকা* (মিশর: দার আল-'আরব, জুলাই, ১৯০৭ খ্রি.) পৃ. ৭, ৯।]

ফ্রান্সের প্যারিসে গমন করেন তখন তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বৈরূত থেকে সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন।এ সময় 'আবদুহ্ তাঁর উস্তাদ আফগানীর সাথে সাংবাদিকতার মাধ্যমে মিশরসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইংরেজদের জুলুম-নির্যাতন, শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কলম যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে তিনি আফগানীর সাথে *'আল 'উরওয়াতু আল-উসকা'* নামক পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেন। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের প্রধান পত্রিকাগুলোতে তাঁদের লেখা প্রকাশ হতে থাকে। রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের প্রাচ্যনীতি, তুরস্ক-মিশরও তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের সমকালীন প্রেক্ষাপট নিয়েও তাঁরা পত্র-পত্রিকায় তাঁদের সাহসী মতামত ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতেন।[৫৫]

ফ্রান্সে কয়েক মাস অবস্থানের পর আফগানী ও 'আবদুহ্ এর সাথে সা'দ জাগলুল ও মির্যা বাকের ইরানিও সেখানে তাঁদের সাথে মিলিত হন। এ সকল বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকের সহযোগিতায় আফগানী 'জাম'ইয়্যাতু আল-উসকা আল-খাইরিয়্যা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মতাদর্শ প্রচার ও সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যম হিসেবে *'আল-'উরওয়াতু আল-উসকা'* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অবিলম্বে তাঁরা পত্রিকাটি প্রকাশও করেন। আফগানীর আর্থিক অবস্থা তখন খুব একটা স্বচ্ছল ছিলনা। অথচ এদের দৃঢ় সংকল্প অর্থের অপেক্ষায় বসে থাকতে মোটেও আগ্রহী ছিলনা। পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর পর এর ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা এমনিতেই হয়ে যায়। পত্রিকাটি ভারতীয় মুসলমানদের অর্থানুকূল্যে এবং মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সহযোগিতায় পূর্ণ উদ্যমে প্রকাশিত হতে লাগলো। বলা হয়ে থাকে যে, এটি প্রকাশের জন্য ভারতের হায়দারাবাদ থেকে আর্থিক সাহায্য আসতো। তথাপি পত্রিকাটির বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বিনামূল্যে তা প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা হতো। এর মাধ্যমে তাঁদের সাহিত্য-সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক তৎপরতা প্রকাশ পেতো। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক মানের উঁচু স্তরের প্রভাবশালী পত্রিকা যার প্রভাব ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকাসহ সমগ্র বিশ্বে পড়েছিল। বিশেষ করে এর প্রভাবে মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহে ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে নব জাগরণ শুরু হয়। এর প্রথম

---

৫৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩ মার্চ ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে; যার শিরোনামের পাতায় আফগানী ও 'আবদুহ্ উভয়ের নামই স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ ছিল। '*আল 'উরওয়াতু আল-উসকা*' এর লেখাসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে যেমন কর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টি করত, তেমনি গাম্ভীর্য অর্জনে ও দৃঢ় মনোবল ধরে রাখতে প্রেরণা যোগাতো।[৫৬]

প্রথম সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাংবাদিকতা জগতে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করে। পত্রিকাটি যদিও 'আরবি ভাষায় প্রকাশিত হতো তথাপি এর সাহিত্যমান, গ্রহণযোগ্যতা ও সর্বজনীনতার কারণে পৃথিবীর বহু ভাষায় তা অনূদিত হতো। 'আবদুহ্ ও আফগানীর লেখনীর উপর মিশরের জনসাধারণ বিশেষ আস্থাশীল থাকায় মিশরে এ পত্রিকাটি সবচেয়ে বেশি সমাদার লাভ করে। আবদুহ্ এর লেখনীমিশরের সমাজ কাঠামোর ভিতকে নাড়িয়ে তুলে। এ পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে মিশরীয় জনগণ নবজাগরণ, উন্নয়ন ও সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়। ফলে তারা ব্রিটিশ উপনিবেশের শৃঙ্খল হতে মুক্তির স্বপ্ন দেখে এবং সমাজ পরিবর্তনের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। এ সকল কারণে মিশরের তৎকালীন মন্ত্রীপরিষদে '*আল-'উরওয়াতু আল-উসকা*' এর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয় এবং মিশরে উক্ত পত্রিকার অনুপ্রবেশের ব্যাপারে তারা চিন্তিত হয়ে উঠেন। অবশেষে মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, '*আল 'উরওয়াতু আল-উসকা*' পত্রিকার প্রবেশ মিশরে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর প্রচারের উপর বিশেষ নজরদারি অব্যাহত রাখবে। রাষ্ট্রীয় এ সিদ্ধান্ত প্রকাশের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডাক বিভাগকে এর প্রচারণা ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে কড়া নির্দেশ প্রদান করে। এমনকি সরকারি গেজেটে এ নির্দেশ প্রকাশিত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ঘোষণাও জারি করা হয় যে, যার কাছেই '*আল 'উরওয়াতু আল-উসকা*' এর কপি পাওয়া যাবে তাকেই পাঁচ থেকে পঁচিশ গিনি পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। এতোসব বাধা-বিপত্তি থাকা সত্তেও ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত আট মাসে পত্রিকাটির সর্বমোট আঠারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ সময় ইংরেজগণ মিশর ও ভারতবর্ষে পত্রিকাটির প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হয়।[৫৭]

---

৫৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

৫৭ আহমাদ আমীন, *যু'আমাউ আল-ইসলাহ্ ফি 'আসর আল-হাদিস* (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-'আরাবি, ১৯৪৮খ্রি.), পৃ. ৩০৭।

আল-'উরওয়াতু আল-উসকা পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার কিছু বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল। এ সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে সঠিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার ছাড়াও মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করা, পবিত্র কোরআনের সঠিক অর্থ অনুধাবনের উদাত্ত আহ্বান এবং খিলাফাতে রাশেদার অনুরূপ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হচ্ছে অন্যতম। পত্রিকাটি মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং মুসলিম সংহতির গুরুত্ব, মুসলমানদের সত্য ইসলামের প্রতি অনুগত হওয়া এবং স্বৈরাচারী সরকার পতনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গঠনমূলক তর্ক-বিতর্কে যুক্ত ছিল।[৫৮]

এ পত্রিকার অন্যতম আরেকটি লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যবাসী; বিশেষ করে মুসলমানদের পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং কর্মবিমুখ মানুষকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে তাদেরকে নিজ কল্যাণের দিকে পরিচালিত করা। আর এর প্রত্যেক পাঠকই জানতো যে, পত্রিকাটি কল্যাণের পথ অবলম্বন করে এবং দৃঢ়তার সাথে ন্যায় বিচারকে সমর্থন করে। মূলত *আল-'উরওয়াতু আল-উসকা* এমন একটি প্রচার মাধ্যম; যা ছিল আফগানী ও 'আবদুহ্ এর বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার এক শক্তিশালী পরিস্ফুটন। এ পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের চিন্তা-দর্শন পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। ইসলামী বিশ্বের ঐক্য, প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও সক্ষমতা অর্জন এবং ইতিবাচক রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করার চেতনাকে জাগ্রত করা ছিল এ পত্রিকার মূল লক্ষ্য। এ পত্রিকার অন্য আরেকটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলসমগ্র প্রাচ্যবাসীকে একতা ও ভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ করা। এ জন্যই পত্রিকাটিতে প্রাচ্য দেশসমূহের অধিবাসীদের অধিকার-স্বাধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের বহু প্রত্যাশিত মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা বারংবার উচ্চারিত হতো। অধিকন্তু সাধারণভাবে প্রাচ্যের জনগণকে; বিশেষত মুসলমানদেরকে ভিনজাতীয় আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সতর্ক করা ছিল এ প্রকাশনার মূল কাজ। মিশরীয়দের প্রতি ইংরেজদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিরোধ এবং তাদেরকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে বহু গঠনমূলক নির্দেশনা এতে বিবৃত হয়েছে। মিশরের শত্রুদের অপচেষ্টাকে রুখে দেয়ার জন্য এটা ছিল একটি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। শুধু মিশরই নয়

৫৮ Sedwick, *Muhammad Abdudh* (Oxford: one world, 2009), p. 53

বরঞ্চ বিশ্বব্যাপী ইসলামের শত্রুদের সকল গোপন রহস্য তুলে ধরার জন্য এ পত্রিকাটি ছিল একটি শক্তিশালী মাধ্যম। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলমানগণ, যারা এক শতাব্দী অবধি ইংরেজদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাদের কর্মপন্থা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নেও পত্রিকাটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

এ জন্যই সেই সময়ে*আল 'উরওয়াতু আল-উসকায়* প্রকাশিত 'আরবি রচনাবলি হিন্দুস্থানে উর্দুতে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হতো। এ ক্ষেত্রে কলকাতা থেকে প্রকাশিত '*দারুস সালতানাত*' ও লাখনৌ থেকে প্রকাশিত '*মুশীর-ই-কায়সার*' সবিশেষ উল্লেখ্য।*আল 'উরওয়াতু আল-উসকা* এভাবে মিশর ও হিন্দুস্থানসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মুক্তিকামী মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে উঠে এবং আধুনিক 'আরবি গদ্য সাহিত্যে সাংবাদিকতা সাহিত্যকে একটি প্রভাবশালী সাহিত্য উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। 'আরবি সাংবাদিকতা সাহিত্যের এ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নেপথ্যে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধা-মনন বিলিয়ে দিয়েছেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।[৫৯]

৫৯ আহমাদ আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
তাফসির সাহিত্যে 'আবদুহ্ এর অবদান

তাফসির আল-মানার এর পরিচিতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

তাফসির আল-মানার যা মূলত *তাফসির আল কোরআন আল-হাকিম* নামে পরিচিত। এটি এমন একটি তাফসির গ্রন্থ যা নিজেকে একটি বিশ্বস্ত বর্ণনামূলক তাফসির হিসেবে পাঠকের নিকট আত্মপ্রকাশ করেছে। এ তাফসিরে নির্ভরযোগ্য ব্যখ্যা এবং মনের অব্যক্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো বলিষ্ঠ বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তদুপরি এ তাফসিরে প্রজ্ঞাপূর্ণ শারী'য়াহ্ এবং আল্লাহর বৈধ আইনকে মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে কোরআন মাজিদকে মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা এবং সকল যুগের ও স্থানের উপর এর কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 'আবদুহ্ এ সকল বিষয়ের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা এভাবে করেন যে, আজকাল মুসলমানরা কোরআন-হাদিস থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তাদের কী অবস্থা? আর পূর্ববর্তী পুণ্যবান ধার্মিক মুসলমানরা ইসলামকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার ফলে তারা কীভাবে সফল হয়েছেন। এটি এমন একটি তাফসির যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়কে কৌশলে এড়িয়ে যায়নি; বরং এ সকল বিষয়ের প্রতি এখানে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যাতে করে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তথা শিক্ষিত জনের দ্বারা যেন ইসলামের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়টি উপেক্ষিত না হয়। এ উপায়টি ইসলামী দার্শনিক মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কর্তৃক *তাফসির আল-মানারে* বিশেষ গুরুত্বের সাথে গৃহীত হয়েছিল।[৬০]

তাফসির আল-মানার মূলত: তিনজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব দ্বারা রচিত; তাঁরা হলেন সাইয়্যিদ জামাল উদ্দীন আফগানী[৬১], শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এবং সাইয়্যিদ রাশিদ রিদা[৬২]। এখানে তাঁরা সমাজের প্রতিবিম্বিত ধারণাগুলো চিত্রায়নের চেষ্টা করেন এবং চলমান স্বীকৃত ধারণাগুলি প্রক্রিয়াকরণের

---

৬০ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *তাফসির আল-কোরআন আল-হাকিম* (মিশর: দার আল-মানার, ১৩৬৬ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১।

৬১ Ibid, Sharif M. M., *A History of Muslim Philosophy*, p. 1463

৬২ রাশিদ রিদা ত্রিপলির নিকটবর্তী কালমুন গ্রামে ১৮ অক্টোবর ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিপলিতে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা, তখন তিনি স্বদেশ ছেড়ে মিশর ও লেবাননে পাড়ি জমান। ১৮৯৪ সালে শাকিব আরসালানের সাথে পরিচিত হন এবং শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কর্তৃক প্রভাবিত হন। তিনি ছিলেন ইসলামী মনোভাবাপন্ন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তিনি ১৯৬৫ সালের ২২ আগস্ট মৃত্যু বরণ করেন। [মুহাম্মদ ইউসুফ কাওকান, *'আলাম আল-নাছর ওয়া আল-শি'র ফি আল-'আছর আল-'আরাবি আল-হাদিস* (মাদ্রাজ: দার-আল-হাফিজা, ১৪৯৪ হি./ ১৯৮৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১-১৯৯]

মাধ্যমে কোরআন মাজিদের আয়াতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। *তাফসির আল-মানার* রচনা করতে গিয়ে যা কিছু তাঁরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং প্রচার-প্রসার করেন এর সব কিছুই ছিল তিনজন দ্বারা স্বীকৃত।

প্রথম দিকে তাফসিরটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল *আল-মানার* ম্যাগাজিনে। সেখানে 'আল-কোরআন আল-হাকিম' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে পবিত্র কোরআনের তাফসির প্রকাশিত হতো; যা মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর বক্তৃতা থেকে গৃহীত হয়েছিল। *তাফসির আল-মানার* রচনার পটভূমি পর্যালোচনা করে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ও রাশিদ রিদাকেই '*তাফসির আল-মানার*' এর রচয়িতা হিসেবে যথাযথভাবে লক্ষ্য করা যায়। শুরুতে *তাফসির আল-মানার* সপ্তাহে একবার, তারপর পনের দিনে একবার, এরও পরবর্তীসময়ে মাসে একবার এবং কখনও কখনও এক বছরে মাত্র নয় খণ্ডে ট্যাবলয়েড আকারে *আল-মানার* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়ে আসছিল।[৬৩]

ম্যাগাজিনটি রাশিদ রিদা তাঁর মৃত্যু অবধি নিজেই প্রকাশ করে আসছিলেন। রাশিদ রিদা যা করেছিলেন তা অন্যদের সমকক্ষ হওয়ার জন্য একটা বড় অর্জন ছিল। যেহেতু ম্যাগাজিনটি চৌত্রিশটি বড় ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছিল; যার প্রতিটি খণ্ড বা ভলিউম একহাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত ম্যাগাজিন হিসেবে সংগৃহীত ছিল। রাশিদ রিদার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার ও সহকর্মীরা ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করতে থাকে, তবে তারা কেবল পয়ত্রিশতম খণ্ডে সংগৃহীত দুটি খণ্ড তখন প্রকাশ করতে পারে।[৬৪]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর তাফসির বক্তৃতা সূরা আল-ফাতিহা থেকে শুরু করে সূরা আন-নিসা এর ১২৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত প্রদান করার সুযোগ পান। মুহাম্মদ রাশিদ রিদা সূরা ইউসুফের ৫৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তাঁর শিক্ষক মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অধিকাংশ পদ্ধতি ও মূল বৈশিষ্ট্য অনুসরণ পূর্বক পবিত্র কোরআনের তাফসির করেন। এ তাফসির গ্রন্থে সূরা আল-ফাতিহা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কোরআন অন্তর্ভুক্ত নয়। তাফসিরটি দুটি অংশে বিস্তৃত; যাতে ১২টি ভলিউম বা খণ্ড রয়েছে। প্রথমত: তাফসিরটি রচনার জন্য মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর পক্ষ থেকে রাশিদ রিদার প্রতি নির্দেশ ছিল।

---

৬৩ *প্রাগুক্ত*।

৬৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

দ্বিতীয়ত: এ তাফসিরটি রাশিদ রিদা তাঁর শিক্ষক মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অনুসরণ করে নিজেই রচনা করেছিলেন।

তাফসির আল-মানার গ্রন্থটি মূলত তাঁর ('আবদুহ্ এর) ছাত্র মুহাম্মদ রাশিদ রিদা কর্তৃক রচিত মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর তাফসির বক্তৃতামালা; যা রিদা একত্রিত করে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। এ বিষয়টি উক্ত তাফসির গ্রন্থের প্রচ্ছদে মুহাম্মদ রাশিদ রিদার স্বীকারোক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়।[৬৫]

এ তাফসির গ্রন্থটি এমন একটি গ্রন্থ যা সহিহ্ হাদিস ছাড়াও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুসংহত করা হয়েছে। তাফসিরটিতে মানব জীবনে বিরাজমান প্রচলিত আইন এবং প্রাকৃতিক আইন বা আল্লাহ প্রদত্ত আইন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া তাফসিরটিতে প্রত্যেক মানুষের জন্য পবিত্র কোরআনকে একটি চিরন্তন পথ-নির্দেশিকা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এতে পবিত্র কোরআনের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাফসির গ্রন্থটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হিদায়াত এবং ফরযের মধ্যে যা অবশ্যই একজন মুসলিম কর্তৃক করা উচিত সে সকল বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে। উক্ত তাফসিরের ব্যাখ্যা কিংবা এর বাক্যের বিন্যাস হৃদয়ঙ্গম খুবই সহজ। তাই সাধারণ মানুষগণ এটি খুব সহজেই বুঝতে পারবে। আর সমাজের বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্যও এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।আর তাফসিরের এ পদ্ধতিটি হাকিম আল-ইসলাম আল উস্তাদ আল-ইমাম মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি; যা তিনি আল-আযহারে তাঁর বক্তৃতা প্রদান করার সময় অবলম্বন করেছিলেন।[৬৬]

এটি ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে *আল-মানার* ম্যাগাজিনে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হতে থাকে। আর মুহাম্মদ 'আবদুহ্ রচিত তাফসির হিসেবে তৃতীয় খণ্ডের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। তাফসির আল-মানার এর বিষয়বস্তু যেমন সামাজিক বক্তৃতা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি মুসলিম জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছিল। 'আবদুহ্ এর উদ্দেশ্য ছিল এ তাফসিরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনকে কার্যকারী নির্দেশিকা হিসেবে মানুষের নিকট উপস্থাপন করা; যাতে করে মানুষ তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান পবিত্র কোরআন থেকে অনুসন্ধান করে।

---

৬৫ *প্রাগুক্ত*।

৬৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০১

'আবদুহ্ এতে তাঁর যুগের মুসলিম পণ্ডিতদের গঠনমূলক সমালোচনা করেছিলেন; যারা পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার পার্থক্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কেবল পূর্বসুরীদের অন্ধ অনুসরণে নিমজ্জিত ছিল। 'আবদুহ্ ধর্মীয় পণ্ডিতদের প্রতি সমাজের জন্য কোনো জটিলতা সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান। এমনকি সাধারণ মানুষ এর প্রতি তাঁদের প্রচারিত ধর্মীয় শিক্ষাচাপিয়ে না দেয়ার আহ্বান জানান; যাতে করে সাধারণ মানুষ এর প্রতি বিমুখ হয়। কেননা তৎকালীন ধর্মীয় পণ্ডিতদের মনোযোগ ছিল কেবলই পবিত্র কোরআনের শাব্দিক অর্থ নির্ভর আয়াত বা নছের দিকে। পবিত্র কোরআনের আয়াতের মর্মার্থ কিংবা এর অন্তর্নিহিত ভাব ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে এ শ্রেণির ধর্মীয় পণ্ডিতগণ খুব কমই মনোনিবেশ করেছেন। এ কারণে 'আবদুহ্ ধর্মীয় পণ্ডিতদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সকলে যেন একটি সংগঠনের ছায়াতলে একত্রিত হয়ে ধর্মীয় এ সকল বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন এবং কোনো বিষয়ের সঠিক উদ্দেশ্যটির অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিটি বিষয়ের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেন।[৬৭]

এভাবে 'আবদুহ্ তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। 'আবদুহ্ রচিত তাফসির আল-মানার তাঁর গৃহীত বিভিন্ন প্রচেষ্টার অন্যতম একটি। ইসলামের প্রকৃত আদর্শ ও শিক্ষা এবং পবিত্র কোরআন নির্দেশিত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আধুনিক শিক্ষা ও জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়ের একটি গভীর সম্পর্ক ও সাদৃশ্য সৃষ্টির একটি শক্তিশালী প্রয়াস তাঁর এ তাফসিরে পরিলক্ষিত হয়। পবিত্র কোরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে এ ধরনের সৃষ্টিশীল বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে, যা আধুনিক তাফসির সাহিত্যে এক ধরনের নতুন মাত্রা সংযোজন করে 'আরবি সাহিত্যকে বহুগূণে সমৃদ্ধ করে তুলে।

তাফসির সাহিত্য ও তাফসির আল-মানার

পবিত্র কোরআন বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। পৃথিবীতে আর কোনো গ্রন্থ এতো ব্যাপকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে সর্বক্ষণ পঠিত হয়না। এ মহাগ্রন্থটি মানব জাতির মুক্তির একমাত্র সনদ। পবিত্র কোরআনের আলোকেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের প্রতিটি কাজ

৬৭ *প্রাগুক্ত*।

সম্পাদন করা একজন মুসলমানের অপরিহার্য দায়িত্ব-কর্তব্য। কিন্তু পবিত্র কোরআন থেকে মানুষ আজ বহু দূরে। পবিত্র কোরআনের ভাষ্য বাব্যাখ্যাই হচ্ছে তাফসির।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনেরঅনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে আসছে। পৃথিবীতে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভাষা নেই যে ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ ও তাফসির প্রকাশিত হয়নি। কোরআনের তাফসির নিয়ে যুগ যুগ ধরে ইসলামী পণ্ডিত ও গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এরধারাবাহিকতা আজ অবধি প্রবহমান। বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অগণন ধারাভাষ্য ও ব্যাখ্যা লিখিত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এভাবে প্রতিনিয়ত তাফসির সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃতি লাভের মাধ্যমে এ সাহিত্যে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম তাফসিরকারক বা তাফসিরের জনক হচ্ছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.)। আর সর্বপ্রথম তাফসির হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদিস। মহানবি (সা.) যা-ই ইরশাদ করেছেন তা মহান আল্লাহর নির্দেশেই করেছেন। বেশিরভাগ হাদিসই হচ্ছে পবিত্র কোরআনেরবিভিন্ন আয়াত ও সূরার তাফসির বা ব্যাখ্যা। এ জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) হাদিস সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এবং তাবি'ঈগণও এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ইরশাদ করা হয়েছে যে,

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ করো এবং তোমাদের যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"[৬৮]

ইসলামের প্রথম দিকে যতদিন পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং জীবিত ছিলেন, ততদিন পবিত্র কোরআনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা ততটা দেখা দেয়নি। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম (রা.)ও ছিলেন 'আরবি ভাষাভাষী; তাই পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে তাঁদেরকে অন্য কোনো ব্যক্তি বা গ্রন্থের দ্বারস্থ হতে হতো না। কোনো শব্দ দ্ব্যর্থক বা দুর্বোধ্য মনে হলে স্বয়ং নবী করিম (সা.) এর কথা বা কাজ

৬৮ *আল-কোরআন*, ৫৯: ০৭

থেকেই এর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত তাঁরা পেয়ে যেতেন। এতে করে কোনো আয়াতের অর্থ, ভাব, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিংবা উদ্দেশ্য বুঝতে তাঁদের কোনো সমস্যা হতোনা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোরআন মাজিদের তাফসির বা ব্যাখ্যা করতেন। তিনি যা কিছু তাফসির বা ব্যাখ্যা করেছেন এর বেশির ভাগ অংশ তাঁর জীবদ্দশায়ই লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিয়দংশ সাহাবায়ে কিরামের বক্ষে সংরক্ষিত থাকে। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে এগুলো অল্প অল্প করে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। 'তাফসির' শিরোনামে কোনো গ্রন্থ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগে সংকলিত বা সম্পাদিত হয়নি। তবে তাঁর বাণী সম্বলিত একটি তাফসির গ্রন্থ সম্পাদনার কথা জানা যায়। তাফসিরটির নাম হচ্ছে '*তাফসির আন-নাবি*'। গ্রন্থটি শাইখ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবন কাসিম আল ফাকিহ্ এর বর্ণনাকৃত হাদিসের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে।[৬৯]

খুলাফায়ে রাশিদীনের খিলাফতের সময়কালে মুসলমানগণ সবচেয়ে বেশি মনোনিবেশ করেছিল পবিত্র কোরআনের হিফজকরণ, হাদিস সংকলন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার উপর। এ জন্য 'তাফসির' শিরোনামে দু'চারটি বিক্ষিপ্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি ব্যতীতএই সময়ে কোনো গ্রন্থ সম্পাদিত কিংবা প্রকাশিত হয়নি। সেই সময় তাফসিরের অবস্থান এমন ছিল যে, কোনো আয়াত কিংবা সূরার তাফসির মানেই অন্য কোনো আয়াত এবং সাথে কোনো হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযোজন হতো।

অনুরূপভাবে তাবি'ঈগণের তাফসির প্রণয়নের রীতি ছিল এই, প্রথমে পবিত্র কোরআনের আয়াত লিখে এর নিচে হাদিস এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈগণের ভাষ্য নকল করতেন। সেই সময়ের তাফসিরে তাঁরা বিভিন্ন কাহিনি কিংবা জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের প্রতি তেমন দৃষ্টিপাত দিতেন না।

এভাবে সময় যতই সামনের দিকে এগোচ্ছিলো, ইসলাম ততোই বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে প্রসারিত হতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ ও নানাবর্ণের মানুষের নিকট পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবনের বিষয়টি তখন আরও জোরালো হয়ে উঠে। ফলে বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হতে থাকে। পবিত্র কোরআনের সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াত ও হাদিস ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং ইসরাঈলি

৬৯ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *তাফসির আল-কোরআন আল-হাকিম*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

জ্ঞানভাণ্ডার ও ঐতিহাসিক কাহিনি দ্বারা তাফসির সাহিত্যের গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ হতে থাকে। বিশেষ করে হিজরি তৃতীয় শতক পরবর্তী সময়ে তাফসির সাহিত্য খুব গতিশীলভাবে বিকাশ লাভ করে। [৭০]

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তাফসির সাহিত্যে যে সকল সাহিত্য সম্পন্ন হয়েছে নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার দাবি রাখে; তথাপি এর মধ্যে কোনো কোনো সাহিত্য এমন রয়েছে, যা প্রকৃত তাফসিরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে। যদিও সময়ের প্রয়োজনে তাফসির সাহিত্যের উন্নয়ন ও বিকাশ খুবই প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীসময়ে এই সকল তাফসির গ্রন্থ কোরআন অধ্যয়ন, অনুধাবন, অনুশীলন ও গবেষণার উপকরণ এবং উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, পরবর্তীযুগে পূর্ববর্তী তাফসির সমূহের উপর ভিত্তি করেই তাফসির শাস্ত্রের অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে।

তাফসির সাহিত্যের অগ্রগতির এ ধারাবাহিকতায় যে সকল পণ্ডিত ও গবেষক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাদের অন্যতম। তৎকালীন বিশ্ব ব্যবস্থায় নানা বৈরী প্রেক্ষাপট ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও তিনি মুসলিম জাতির জন্য যে অমূল্য তাফসির *'তাফসির আল-মানার'* রচনা করে গিয়েছেন সেটা আল্লাহর কিতাবের এক জীবন্ত মু'জিযা সদৃশ। 'আবদুহ্ এর এই অমর স্মৃতি তাফসির সাহিত্যে নতুন ধারার তাফসির সৃষ্টির ব্যাপারে ওলামা, সুধী ও বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। *'তাফসির আল-মানার'* রচনার মধ্য দিয়ে পাঠক সমাজ এমন একটি তাফসির গ্রন্থ তাদের হাতে পেয়েছেন যা পাঠের মাধ্যমে কোনো রকমের ব্যাখ্যা বা টীকার আশ্রয় ছাড়াই তারা পবিত্র কোরআনেরমূল বক্তব্যে পৌঁছে যেতে সক্ষম হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পবিত্র কোরআন নিজ থেকেই পাঠকের সম্মুখে এক একটি জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান উপস্থাপন করছে। তিনি 'আরবি ভাষাভাষী গবেষক, পণ্ডিত ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন ও এর অনুধাবনের পথকে সুগম করে দিয়েছেন। আল-কোরআনের অভীষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এতদিন ধরে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে উপাদানটির অভাব প্রকট ছিল, সামান্য হলেও 'আবদুহ্ সে অভাব পূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর এই তাফসিরটির মাধ্যমে পবিত্র কোরআন গবেষণার ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের সূচনা হয়।[৭১]

---

৭০ *প্রাগুক্ত।*

৭১ *প্রাগুক্ত।*

যারা পবিত্র কোরআন নিয়ে গবেষণা করেন, কোরআনে রচর্চা করেন এবং কোরআন থেকে হিদায়াত ও কল্যাণ লাভের আমৃত্যু সাধনায় নিয়োজিত; উক্ত তাফসির তাঁদের পথ-নির্দেশিকা হিসেবে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

তাফসির আল-মানারের বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এমন এক প্রেক্ষাপটে তাফসির রচনা করছিলেন যখন ইউরোপসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্ব উন্নয়নের দিকে ধাবমান এবং বিশ্ব মুসলমানদের অবস্থা ছিল স্থবির, অনমনীয় এবং উন্নয়ন ও প্রগতির পথে হতাশাব্যাঞ্জক। আর মুসলিম পণ্ডিতগণ কর্তৃক ইজতিহাদের পথকে রুদ্ধ করার নিয়ম তান্ত্রিক চলমান অপচেষ্টা। এ ধরনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ ছিল এই, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ মুসলিম জাতিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোরআন-হাদিস থেকে যোজন যোজন দূরে ঠেলে দেয়। তাছাড়া মুসলিম পণ্ডিতগণ পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক বিষয়ের সঠিক সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে মানুষ ধর্ম তথা ইসলামকে অনমনীয়, সেকেলে এবং উন্নয়ন ও প্রগতিরপথে অন্তরায় ভাবার সুযোগ পায়। যদিও ইসলামের ক্ষেত্রে এর কোনোটিই প্রযোজ্য নয়। এ সকল প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর 'তাফসির আল-মানার' সহ প্রত্যেকটি লেখনী প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সর্বদা পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। একইভাবে পবিত্র কোরআনকে উপলব্ধি করার জন্য তিনি মুসলিম জাতিকে, তাঁদেও মেধা ও বুদ্ধি-বিবেককে কার্যকর করার উদাত্ত আহ্বান জানান। পবিত্র কোরআনের শারীয়াহ্ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি অনুধাবন করেন যে, নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে শারীয়াহ্ আইন প্রয়োগ ও নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন; তাই সর্বদা আইনের শর্তটি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত থাকা উচিত। তাহলেই কেবল আইনের প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও সুশাসন সুরক্ষিত থাকবে। কেননা পরিস্থিতি যখন পরিবর্তিত হয় তখন আইন বা প্রয়োগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বদলে যায়। তাই আল-কোরআনকে বোঝার পর আইনের আয়াতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায়না। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, তৎকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপট এবং মুসলিম জাতির সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় 'আবদুহ্ তাঁর অনবদ্য '*তাফসির আল-মানার*' রচনা করেন। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হলো।

ক. প্রথমত: '*তাফসির আল-মানার*' এমন একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তাফসির যার রচয়িতা দুইজন। পৃথিবীর অন্য কোনো তাফসিরের ক্ষেত্রে সাধারণত এমনটি পরিলক্ষিত হয়না। তাই রচয়িতার দিক থেকে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী তাফসির। এ তাফসিরের রচয়িতা যেমনি দুইজন তেমনিভাবে এর তাফসির পদ্ধতি ও শৈলীর মধ্যে কিছুটা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ উভয় রচয়িতার বিশ্লেষণের মধ্যে পদ্ধতিগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান; যদিও উভয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অনেক ক্ষেত্রেই সাযুজ্য রয়েছে।[৭২]

যেমন: মুহাম্মদ 'আবদুহ্ যে বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে *তাফসির আল-মানার* রচনা করেন,সেটি তাঁর পূর্বের সমস্ত তাফসির রচয়িতা থেকে তাঁকে আলাদা করে দিয়েছে। আর অন্যদিকে রাশিদ রিদা প্রাক্তন অনেক মুফাসসিরের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাফসির রচনা করেছেন। কেননা 'আবদুহ্ থেকে পাঠ নেয়ার সময় তাঁর হৃদয় ও মনের গহীনে যা কিছু চিত্রিত হয়েছে এর সবকিছুই তিনি এতে প্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি *তাফসির আল-মানার* রাশিদ রিদার পদ্ধতির সাথে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর পদ্ধতির মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কেননা ইমাম মুহাম্মদ 'আবদুহ্ হৃদয়ে যা ধারণ করেছিলেন রাশিদ রিদা তা-ই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন এবং মুহাম্মদ 'আবদুহ্ও তাকে মনে-প্রাণে ধারণ করতেন।

খ. মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এই মর্মে পবিত্র কোরআনের তাফসির উপস্থাপন করেন যে, পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো সাধারণ ও সর্বজনীন। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এগুলো প্রয়োজনীয়। তাই তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াতকে সাধারণভাবে বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতেন; কেবল প্রকাশিত কারণের ওপর ভিত্তি করে কোনো তাফসির প্রদান করতেননা।[৭৩]

গ. *তাফসির আল-মানারে* সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় যে, আল-কোরআন হচ্ছে সকল বিশ্বাস ও আইনের উৎস। তাই এখানে পবিত্র কোরআন ও হাদিসকে দৃঢ়ভাবে ধারণের কথা বলা হয় এবং অন্য সকল আইন বা বিধানকে আবশ্যিকভাবে পরিত্যাগ করতে বলা হয়; যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাযহাব থেকে উৎসারিত।

---

৭২ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *তাফসির আল-কোরআন আল-হাকিম*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ০৯।

৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

ঘ. এ তাফসিরে পবিত্র কোরআনের আয়াতকে হৃদয়ঙ্গম বা অনুধাবন করার জন্য হৃদয় ও মনের ব্যাপক ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

ঙ. এ তাফসিরে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর হাদিস এর প্রতি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

চ. *তাফসির আল-মানারে* তাকলিদের নামে অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইসলামী চিন্তাধারায় যেকোনো ধরনের অনৈতিক অন্ধ অনুকরণকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা এবং এর প্রতি এক ধরনের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।[৭৪]

ছ. উক্ত তাফসিরে ইসরাঈলি গল্পকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

জ. তাফসিরটিতে একজন সামাজিক জীব হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ দেয়া হয়েছে; যা পবিত্র কোরআনের ইহলৌকিক দিকনির্দেশনাসমূহের একটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৭৫]

ঝ. পদ্ধতিগত ভিন্নতা ও সাদৃশ্যতা থাকা সত্ত্বেও উক্ত তাফসিরে রিওয়ায়াত এর পরিবর্তে যৌক্তিকতার আধিপত্য প্রবলভাবে দৃশ্যমান।[৭৬]

ঞ. উক্ত তাফসিরে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এবং রাশিদ রিদা ধারাবাহিকভাবে পবিত্র কোরআনের প্রথম সূরা থেকে তাফসির শুরু করেন এবং আয়াতের পর আয়াত এবং সূরার পর সূরার ধারাবাহিক ক্রমানুসারে তাফসির কার্য সম্পাদন করেন। যদিও এতে পবিত্র কোরআনের ত্রিশ পারার তাফসির পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন হয়নি।

ত. মুহাম্মদ 'আবদুহ্ একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাফসির শাস্ত্রে পুনরারম্ভের মাধ্যমে নবায়নের ডাক দেন এবং অন্ধ অনুসরণ সদৃশ তাকলিদের হাতকড়া থেকে মুসলিম জাতিকে মুক্ত করার আন্দোলনে যুক্ত হোন।

---

৭৪ *প্রাগুক্ত*।

৭৫ *প্রাগুক্ত*।

৭৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

থ. মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর তাফসির রচনা এবং কোনো বিষয়ের বিশদ আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর চিন্তা ও মনের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করেন।

দ. *'তাফসির আল-মানার'* রচনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী তাফসিরকারকদের ন্যায় কিংবা প্রাক্তন চিন্তাবিদদের মতো গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করেননি। এমনকি তিনি তাঁর তাফসির প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্বসূরি পণ্ডিতদের চেয়ে ভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর তাফসির পদ্ধতিতে চিন্তার স্বাধীনতার প্রকৃত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৭৭]

কোনো কোনো ধর্মীয় পণ্ডিত *তাফসির আল-মানারে* প্রদত্ত তাফসির পদ্ধতি, এর শৈলী ও ব্যাখ্যা এবং মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কর্তৃকপর্যালোচনার শাণিত গতিধারায় মুগ্ধ হয়ে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাই কোনো পাঠক যদি তাফসিরটি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেন তাহলে তিনি পবিত্র কোরআনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও সিদ্ধান্তাবলি যথার্থ অর্থে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন। সর্বোপরি পবিত্র কোরআন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য নিঃসন্দেহে *তাফসির আল-মানার* একটি স্বতন্ত্র ও প্রামাণ্য তাফসির গ্রন্থ।[৭৮]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর দৃষ্টিতে পবিত্র কোরআন নিছক কোনো শুদ্ধ পৌরাণিক কাহিনি কিংবা ঘটনা সম্বলিত গ্রন্থ নয়; বরং তা ব্যতীত জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক বিষয় এখানে বর্ণিত রয়েছে। যেমন: আল-কোরআনে বর্ণিত সকল বিবরণ কেবল বাস্তব ইতিহাসই নয়; বরং এখানে বর্ণিত এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা ইতিহাসের ফলাফল ও শিক্ষা বর্ণনার জন্য কিংবা বিশদ বর্ণনার জন্য কিংবা বিশদ বর্ণনার প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কোরআন মানবজাতিকে পরামর্শ ও শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে নানাধরনের ঘটনা, বর্ণনা ও ইতিহাস গ্রহণ করে নিয়েছে।

তাফসির সাহিত্যে এ ধরনের মতামত সর্বপ্রথম মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কর্তৃক প্রকাশিত হয়; আর তা ত্বাহা হুসাইন ও মোহাম্মদ আহমদ খালাফুউল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ণতা লাভ করে। তাই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সেই সকল বিদ্বানদের মতই অগ্রগামী একজন; যারা পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ

---

৭৭ *প্রাগুক্ত।*

৭৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

করে যে, এটি শুধুই কোনো ইতিহাসের গ্রন্থ নয়। তাছাড়া মুহাম্মদ 'আবদুহ্ একজন সাহিত্যিকও ছিলেন, তাই তাঁর তাফসিরে মানসম্মত সাহিত্যের ভাবধারা ও সাহিত্যমানও যথেষ্টরূপে পরিস্ফুটিত হয়েছে। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ আরও মত দেন যে, আল-কোরআন কেবল ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থই নয়; বরং নৈতিক মূল্যবোধ কিংবা শিক্ষা গ্রহণ সক্রান্ত অনেক বিষয় এখানে সন্নিবেশিত রয়েছে।[৭৯]

আবদুহ্ এর তাফসির সম্পর্কে উসমান আমিন বলেন, "মুহাম্মদ আবদুহ্ এর তাফসির পবিত্র কোরআনের সর্বজনীন নির্দেশনাবলির প্রতি স্বীকৃতির নিরন্তর উদ্বেগ-প্রকাশক এবং এসবকে তিনি বিবর্তনমূলক ও প্রগতিশীল ধারণার সঙ্গে নিরন্তর সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। পবিত্র কোরআন বিশ্বমানবের প্রতি আহ্বান জানায়, হে বিশ্বাসী মানব!, হে বিশ্ববাসী! এবং হে মানবজাতি! এসব বিষয়ের দিকে নিবন্ধ রেখে এবং পবিত্র কোরআনের বিচিত্র বিষয়বস্তু যেমন: প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, অধিবিদ্যক, জ্ঞানবিদ্যক ও ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে 'আবদুহ্ কোরআনের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[৮০]

---

৭৯ *প্রাগুক্ত।*

৮০ M.M. Sharif (ed.) A History of Muslim Philosophy, p. 1503-1404.; ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (বগুড়া: সহিত্য সোপান, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ৬৩৭।

তৃতীয় অধ্যায়

মিশরীয় জাতীয়তাবাদ ও মুহাম্মদ ‘আবদুহ্

১ম পরিচ্ছেদ

জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায়

২য় পরিচ্ছেদ

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

৩য় পরিচ্ছেদ

ঔপনিবেশিক মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

৪র্থ পরিচ্ছেদ

মিশরে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে
মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ এর ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ
জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায়

দেশপ্রেমের ধারণা ও গভীর উপলব্ধি থেকেই জন্ম নেয় জাতীয়তাবোধ। আর এ জাতীয়তাবোধই এক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। 'জাতি' এবং 'জাতীয়তা' এর ইংরেজি শব্দ যথাক্রমে 'Nation'এবং 'Nationality'। শব্দ দু'টি ল্যাটিন শব্দ'nation'থেকে উদ্ভূত হয়েছে; এর অর্থ হলো 'born' বা জন্ম।[১] উৎপত্তিগত দিক হতে 'জাতি' ও 'জাতীয়তা' শব্দ দুটি একই উৎস হতে উৎসারিত বা নির্গত। শব্দদ্বয় দিয়ে একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টিকেই বোঝায়; যদিও দুটি শব্দের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি আত্মিক ধারণা; যার মূলে রয়েছে মানসিক উপলব্ধি বা অনুভূতি যা জাতিকে সকল বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করার জোরালো প্রয়াস চালায়। এভাবে জাতির প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে সাজাত্যবোধ বা স্বজাতির প্রতি বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি হয়; অবশেষে এ জাতীয় অনুভূতি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর রাজনৈতিক এ আদর্শই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় 'জাতীয়তাবাদ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত।

জাতীয়তাবাদ একটি মানসিক বিষয়। এটা একটা আনুগত্যও বটে, যে আনুগত্য থাকে বিশেষ কিছুর ভিত্তিতে বিশেষ কোনো রাষ্ট্রের প্রতি; যা অন্য কারও মধ্যে সচরাচর পরিলক্ষিত হয়না।[২]

জাতীয়তাবোধ একটি মানসিক ঐক্যভাব, কিন্তু রাষ্ট্র একটি বাস্তব ও আইনগত প্রতিষ্ঠান। জাতীয়তা অনুভব করা বা না করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। জাতীয়ভাব ইচ্ছাপ্রণোদিত হওয়ায় এটি ব্যাপক এবং গভীর অনুভূতি সম্পন্ন। তবে জাতীয়তাবাদের নেপথ্যে ঐক্যের জন্য বিশেষ অনুভূতি প্রবল ভূমিকা পালন করে।[৩] দার্শনিক ম্যাকাইভারের মতে, জাতীয়তাবাদ হলো সম্প্রদায়ের চরম ও পরম জীবনবোধ যেটা কোনো সম্প্রদায় রাজনৈতিক শক্তি বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মাধ্যমে বিশেষ কোনো

---

১ Gilchrist, R. N. *Principles of political Science*(Madras: Orient Longmans, 1962), P. 24

২ Hans Kohan, *Nationalism: Its meaning and History* (Toronto: D. Van Nostrand co. INC, 1955), P. 1-2

৩ Hafiz Habibur Rahman, *Political Science and Government*(Dacca: Ideal publication, 1967), p.117

ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অধিকার করে বা করতে চায়।জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় জনসমাজ আত্মত্যাগ পর্যন্ত করতে প্রস্তুত থাকে। উক্ত জনসমাজের মধ্যে এক বিশেষ ঐক্য গড়ে উঠে; যা অন্যদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা ভাবতে শেখায়।[৪]

জাতীয়তা হলো একটি আধ্যাত্ম চেতনা। কতগুলি লোক যখন একই ভূখণ্ডে বাস করে, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই ঐতিহ্য, একই প্রথা, আচার-ব্যবহার, একই কুল হতেউদ্ভূত, সার্বজনীন স্বার্থ ও রাজনৈতিক ঐক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তখন তাদেরকে একই জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী বলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এ ধরনের বিশেষ অনুভূতিকে আধ্যাত্ম চেতনা হিসেবে অভিহিত করা হয়। ম্যাকাইভারও জাতীয়তাবাদকে একটি অনুভূতির বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৫]

জাতীয়তাবাদ হলো এমন এক মানসিক অনুভূতি; যা কোনো নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠী থেকে নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহ্য, ভাষা-সাহিত্য, জীবনযাত্রা ও কৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করে তোলে এবং অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতে শিক্ষাদান করে।[৬]

লেসলি লিপসন বলেন, জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে একটি বিশেষ ধরনের আবেগ ও অনুভূতি, মনোভাব, আশা, সহানুভূতি, ঘৃণা এবং আত্মিক বন্ধনের মানসিকতা প্রকাশ পায়।[৭]

জাতীয়তাবাদ হলো একটি বিশ্বাস যা একটি জাতির মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়, তখন সে জাতি স্বাধীনভাবে নিজেদের সবকিছুকে গৌরবের সাথে গ্রহণ করে নেয়।[৮]

হ্যারল্ড লাস্কির ভাষায়, জাতীয়তাবাদ মূলত প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর নিজ বাসভূমি, নিজেদের সাদৃশ্য, অন্যের সাথে নিজেদের বৈসাদৃশ্য এবং কুলগত বন্ধনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজ নিজেদের সামাজিক ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে নিজেদের একান্ত সম্পদ বলে

---

৪ Laski, Harold Joseph, *A Grammar of Politics (London*: George Allen and Unwin Ltd. 1967), p. 219.

৫ MacIver, R.M. *Modern State* (London: Oxford University press, 1966), P.123

৬ ঘোষ, নির্মল কান্তি, *আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভূমিকা* (কোলকাতা: ছায়া প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ২২০।

৭ Leslie Lipson, *The Great issues of Politics* (NewYork: Prentice Hall INC. 1954), P. 333

৮ Richard W. Cottam, *Nationalism in Iran* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1967), P. 3

মনে করে। নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তারা সজাগ হয়ে ওঠে। তাছাড়া জাতীয়তাবাদ একটি বিশেষ ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করে।[৯]

আধুনিককালে জাতীয়তাবাদ হলো একটি রাজনৈতিক আদর্শ। এটি একটি ভাবগত ধারণাও বটে। সমভাবাপন্ন জনসমষ্টির মধ্যে এ বোধের সৃষ্টি হয়। এর সাথে দেশপ্রেমের অনুভূতি যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠে এবং অবশেষে তা জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। জাতীয়তাবাদ জাতির প্রাণশক্তি এবং এটি জাতীয় পরিচয় বহন করে। নিজ জাতির প্রতি সম্মানবোধ এবং অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ না ছড়ানোই হলো জাতীয়তাবাদের প্রকৃত শিক্ষা। জাতীয়তাবাদ জাতির গৌরব ও শক্তি। এটি এমন এক শক্তিশালী বন্ধন যার মাধ্যমে জাতির সকল সদস্য ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ লাভ করে; যদিও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আদর্শ জাতীয়তাবাদ সকল জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়। এভাবে জাতীয়তাবাদ বিশ্ব সভ্যতা বিকাশের পথকে আরও অবারিত ও উন্মুক্ত করে।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ বিশ্বসভ্যতা ও ভ্রাতৃত্বের পথে অন্তরায়। নিজ জাতির স্বার্থ-সুবিধা সমুন্নত রাখতে গিয়ে মাঝে-মধ্যেই উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের সূচনা করে। আর এ বিকৃত চেতনা থেকে সাম্রাজ্যবাদ জন্ম নেয়। বিকৃত আবেগ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের মনোমালিন্য সৃষ্টিতে বিভেদের সীমারেখাকে বাড়িয়ে তোলে। বিকৃত এ মানসিকতার মধ্য দিয়ে নিজেরটা শুধু ভাল আর অন্যেরটা মন্দ চোখে দেখা হয়।[১০] জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, এন্টোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়াসহ প্রভৃতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু জাতীয়তাবোধের কারণে এক জাতিকর্তৃক অন্য জাতিকে জোরপূর্বক পদদলিত করা হলে তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হয়।

জাতীয়তাবাদ মূলত একটা অনুভুতি; যা জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। শুধু কুলগত, ভাষাগত বা ধর্মগত ঐক্য থাকলেই যে এ অনুভূতির উদ্ভব হয়, তা নয়। বরং এ অনুভূতি একটা মানবিক স্বাতন্ত্র্যবোধ হতে আসে। স্বাতন্ত্র্যবোধ ও পৃথককরণ এ দু'টি হলো জাতীয়তাবোধের বৈশিষ্ট্য। এর

---

৯ Laski, H. J. *A Grammar of Politics, Ibid,* p. 220

১০ Hafiz Habibur Rahman, *Ibid*, P. 121

ফলে একদিকে যেমন বহুসংখ্যক লোক নিজেদের মধ্যে ঐক্যভাব অনুভব করে বিচ্ছিন্ন হয়। আর অন্যদিকে জাতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায় এবং স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে।

স্বাভাবিক জাতীয়তাবাদের মূলনীতি হলো নিজে উন্নত হও এবং অপরের উন্নতির জন্য সহায়তা কর। এটাই জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি ও প্রধান যুক্তি। বর্তমানকালে কোনো জাতি অন্য জাতি বা রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। বিকৃত জাতীয়তাবাদ অহংকার ও গর্বের মানসিকতার উপর নির্ভরশীল। বিকৃত জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণ নিজেদের ঐতিহ্যকে শেষ্ঠতম মনে করে ভিন্ন জাতিকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবংঅন্যদের সব কিছুকে নস্যাৎকরতে চায়। বিকৃত জাতীয়তাবাদ বিশ্বসভ্যতার জন্য হুমকি স্বরূপ।

সুতরাং জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক ধরনের আত্মিক চেতনা ও মানসিক ধারণা; যা ধর্ম, বর্ণ, কৌলিন্য, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সূত্র ধরে একটি জনসমষ্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে। ফলে তারা নিজেদেরকে অন্য জাতি বা জনসমষ্টি থেকে আলাদা মনে করে এবং তাদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক ঐক্যানুভূতি প্রবলভাবে কাজ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

আদিম উপজাতীয় জীবনে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের চেতনা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে যুগে যুগে নানা স্থানে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা বিকশিত হয়। ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাচীন গ্রীক ও হিব্রু জাতির মধ্যেও এ ধরনের চৈতন্য একটি রাজনৈতিক চেতনা ও আদর্শ হিসেবে আবির্ভূত হয়। আর এ চেতনার উন্মেষ মধ্যযুগীয়[১১] সামন্ততান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে 'জাতি রাষ্ট্র' গড়ে ওঠার পেছনে ষোড়শ শতকের একচ্ছত্র রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে নিছক রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনই নয় বরঞ্চ এর উত্থানে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক ক্রিয়াশীল ভূমিকা রয়েছে; যা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরও প্রসারিত করেছে।

জাতীয়তাবাদ আধুনিক কালের মতবাদ নয়। বিগত কয়েক শতকের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ মতবাদ গড়ে উঠে। সাম্প্রতিক কালের প্রায় প্রত্যেকটি উন্নত রাষ্ট্র জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

---

১১ **মধ্যযুগ:** মধ্যযুগ বলতে কোন যুগকে বুঝায় এর উপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐতিহাসিকদের ভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ চতুর্থ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেউ কেউ পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যুগকে মধ্যযুগ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আবার কেউ কেউ একাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ বলেছেন। ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষণ করলেও সাধারণত ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয় । ৪৭৬ সালে বর্বর জার্মান জাতির হাতে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমের পতন হয়। আর ১৪৫৩ সালে অটোমান তুর্কিদের হাতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের পতন পর্যন্ত মধ্যযুগ হিসেবে পরিচিত । এ সময় গ্রিক রোমানদের ইহজাগতিক চিন্তা-চেতনার স্থলে পারোলৌকিক চিন্তা-চেতনা প্রাধান্য পায়। অনন্ত সুখের আশায় স্বর্গ প্রাপ্তির প্রত্যাশা, চির দুঃখের ঠিকানা নরক হতে মুক্তি লাভের উপায় উদ্ভাবন, একচেটিয়া রাজতন্ত্রের ক্ষমতা লাভ ইত্যাদি ছিল মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগে ইউরোপ জুড়ে গির্জার প্রভাব ছিল প্রবলভাবে বিদ্যমান । গির্জাই তখনকার সংস্কৃতি নির্ধারণ করে দিত এবং প্রয়োজনে তা পরিবর্তনও করত। কিন্তু তা সত্তেও এদের নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল; যা গির্জা বা খ্রিষ্ট ধর্মের চেয়েও বহু পুরাতন। অবশ্য এসব সংস্কৃতি ও রীতিনীতি পালনে গির্জার পূর্বানুমতি ছিল বলেই সেগুলো পালন করা সম্ভব হতো। সে সময় শিক্ষা বলতে কেবল ধর্মীয়জ্ঞান শিক্ষা ও এর অনুশীলনকেই বোঝানো হতো। কেননা ধর্মের প্রভাব তখনকার মানুষের জীবনাচারকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রও ধর্মের প্রভাবে পরিচালিত হতো। এ সময়ে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম কিংবা রাজনীতি কোনো বিষয়েই স্বাধীনভাবে কোনো চিন্তা বা মতামত প্রকাশ করতে পারত না। তাই এ যুগকে ধর্মবিশ্বাসের যুগ বা অন্ধকার যুগ বলা হয়। আর ইতিহাসে এ যুগকেই বলা হয় মধ্যযুগ। [পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, *মধ্যযুগের ইউরোপ (৮০০-১২০০)* (কোলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৫]

হয়। জাতীয়তাবাদের বাণী বিশ শতকের প্রথমভাগে এক জীবন্ত সত্য হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯১৯ সনের ভার্সাই চুক্তির[১২] ভিত্তিমূল ছিল এ মতবাদ এবং এর ফলে ইউরোপের মানচিত্র নূতন ছাঁচে অঙ্কিত হয়। চেক পোল ও শ্লাভজাতি জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির সুযোগ পায়। এভাবে আরও অনেক রাষ্ট্র গড়ে উঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় এবং পশ্চিম আফ্রিকায় জাতীয়তার ভিত্তিতে ডজন খানেকের মত জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানও এই নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠে।

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনগণ বিশ্বমানবকে সহজেই আপন করতে পারে। জাতীয়তাবাদের দর্শনে উজ্জীবীত ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বে আদর্শ জীবনের ক্ষেত্র নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। জাতীয় স্বার্থে যারা প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে; তারা আরও এক ধাপ এগিয়ে সারা বিশ্বকে প্রাণের দরদ ও প্রীতির ছোঁয়ায় মহীয়ান করতে পারে। এ অর্থে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী নয়, বরং এর পরিপূরক।

ষোলো ও সতেরো শতকে জাতীয়তাবাদ ছিল অস্পষ্ট। আঠারো শতকে এটি মুক্তি আন্দোলনের দিশারী হিসেবে আখ্যায়িত হয়। উনিশ শতকে এটি রাষ্ট্র-ধর্ম বলে বিবেচিত হয়। আর বিশ শতকে

---

১২ ভার্সাই চুক্তি (Versaille Pact): প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ এবং পরাজিত জার্মানির মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির প্রথমাংশই বস্তুত লীগ অব নেশনস এর ভিত্তি স্থাপন করে। আর চুক্তির দ্বিতীয়াংশ অনুযায়ী জার্মানি বিপুল এলাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, আলসাস-লোরেইন চলে যায় ফ্রান্সের হাতে, ইউক্রেন মালমেডি বেলজিয়ামের হাতে, আপার সাইলেশিয়ার অংশবিশেষ, পোসেন এবং পশ্চিম প্রুশিয়া পোল্যান্ডের হাতে, মেসেল বন্দর ও তার পশ্চাদভূমি লিথুয়ানিয়ার কাছে, হালচিন চেকাস্লোভাকিয়ার হাতে এবং সেলজউইনের অংশ ডেনমার্কের হাতে। এ চুক্তিতে আরও সাব্যস্ত হয় যে, ডানজিগোর উপর থেকে জার্মান সার্বভৌমত্ব লুপ্ত হবে। জার্মান-অষ্ট্রিয়া সংযুক্তির পরিকল্পনা আপাতত বাতিল হবে, জার্মানি এক লক্ষের বেশি সৈন্য রাখতে পারেব না, জার্মান নৌবহরে ছয়টি যুদ্ধজাহাজ এবং সে অনুযায়ী ক্রুজার ড্রেষ্ট্রয়ার ছাড়া সাবমেরিন বা আর কোনো যুদ্ধজাহাজ থাকবে না। তা ছাড়া জার্মানি কোনো জঙ্গিবিমান বা ভারী কামানও রাখতে পারবে না এবং কোনো দুর্গাদিও নির্মাণ করতে পারবে না। এ ছাড়াও রাইনল্যান্ড ১৫ বছর যাবৎ বিজয়ীদের দখলে থাকবে, সার অন্তর্জাতিক এলাকা হবে, জার্মান নদীসমূহ আন্তর্জাতিকীকৃত হবে এবং জার্মান উপনিবেশসমূহ বিজয়ীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হবে বলেও চুক্তিতে সাব্যস্ত হয়। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় দায়দায়িত্ব জার্মানির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। সর্বোপরি ১৯২১ সালে এ চুক্তি মোতাবেক সাব্যস্ত হয় যে, জার্মানি ৬৬০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। স্বভাবতই এ চুক্তি জার্মানির জন্য শুধু চরম অবমাননাকরই ছিল না বরং জার্মানি অর্থনীতির জন্যও এটা ছিল দুর্বহ। ১৯৩২ সালে জার্মানি ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৩৫ সালেই ভার্সাই চুক্তিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই জার্মানি তার হাতছাড়া হওয়া প্রায় সকল এলাকাই পুনঃদখল করে নেয়। অনেকে মনে করেন যে, ভার্সাই চুক্তির শর্তাবলির দরুনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনেকটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। [হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. পৃ. ৩০০]

এসে তা আন্তর্জাতিকতাবাদের[১৩] সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সর্বজনীন নীতিতে পরিণত হয়।

জাতীয়তাবাদ হলো সেই ধারণা; যা নাগরিক বা জনসমাজকে নিজের দেশের ও জাতির মঙ্গল, গৌরব ও ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হবার মানসিকতা তৈরি করে। মূলত এটা এমন এক অনুভূতি যা জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ কওে তোলে। স্বাতন্ত্র্যবোধ ও পৃথককরণ এ দু'টি হলো জাতীয়তাবোধের বৈশিষ্ট্য। এর ফলে একদিকে যেমন বহুসংখ্যক লোক নিজেদের মধ্যে ঐক্যভাব অনুভব করে; ঠিক অন্যদিকে অপর জাতির লোকদের সাথে পার্থক্য অনুভব করে।

জাতীয়তাবাদ এর বিকৃত রূপ সত্যিই ভয়ঙ্কর। জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে স্বার্থবাদীগণ মানুষকে পশুত্বের স্তরেও নামাতে পারে। জাতীয়তাবাদের বিকৃত এ রূপ থেকেই সম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠে; এর ফলে অনুন্নত জাতিসমূহের উপরশুরু হয় অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন । জাতীয়তাবাদের আরেকটি ইতিবাচক দিক রয়েছে যা মানবতা ও মানবিকতার সাথে জড়িত। আর তা হলো বিশ্বমানবকে

---

১৩ **আন্তর্জাতিকতাবাদ:** আন্তর্জাতিকতাবাদ হলো বিশ্বের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে সংহতি ও মিলনের অনুভূতি। আন্তর্জাতিকত মতবাদ হলো এমন এক রাজনৈতিক দর্শন যা রাষ্ট্রের সংহতি, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং বিশ্বশান্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গোল্ড স্মিথের মতে, আন্তর্জাতিকতাবাদের অনুভূতি মানুষকে কেবল নিজ জাতিরাষ্টের সদস্য হিসেবেই ভাবতে শেখায় না; বরং একজন বিশ্ব নাগরিকরূপেও ভাবতে শেখায়। আন্তর্জাতিকতাবাদ হলো এমন এক ধরনের মানসিকতা ও চেতনা যা জাতীয়তাবাদের উর্দ্ধে উঠে বিশ্বের সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে বিশ্বজনীন কল্যাণের পথে একাত্ম করে। জাতীয় স্বার্থের সাথে মানুষ যখন বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি যত্নবান হয় তখন তা আন্তর্জাতিকতাবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। জাতীয়তাবাদ যেখানে নির্দিষ্ট কোনো জাতির কল্যাণ, মর্যাদা ও সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা করে আন্তর্জাতিকতাবাদ সেখানে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানব জাতির চিন্তায় মগ্ন। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ একে অপরের পরিপূরক। জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আর এ ধারণা আন্তর্জাতিকতাবাদের মহৎ চিন্তা-চেতনায় রূপায়িত হলে তা বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনে আরও বিস্তৃত রূপ লাভ করে। তাই বলা হয়, যিনি দেশ ও জাতির মঙ্গলের কথা ভাবতে পারেন তিনিই বিশ্ব মানবের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারেন। তাই একজন মানুষ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়েও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৌরবমণ্ডিত অবদান রাখতে সমর্থ হয়। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আন্তর্জাতিকতাবাদে জাতীয়তাবাদ কখনও বিলুপ্ত হয় না। আন্তর্জাতিকতাবাদ সকল জাতির স্বকীয়তা বজায় রেখে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ যখন সঠিক পথে পরিচালিত হয় তখন একে অপরের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আধুনিক কালে জাতীয়তাবাদ বহুলাংশে আন্তর্জাতিকতাবাদে রূপ লাভ করেছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে আন্তর্জাতিকতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনাও সম্প্রসারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশ্বের অধিকাংশ জাতি কোনো না কোনো আন্তর্জাতিক জোটের অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিকতাবাদ হলো এমন একটি ধারণা বা মতবাদ যে ধারণা বিভিন্ন রাষ্ট্র বা জাতিকে একই বা ভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। [হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. পৃ. ৬৫; https://qualitycando.com/hsc_civics_viewfinal.php?id=84]

আপন করে নেয়া। কিন্তু মধ্যযুগে এ ভিত্তি স্বীকার করা হতো না। তখন রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্ধারিত হতো রাজা বা বাদশাহের উচ্চাকাঙ্খা ও সামরিক শক্তির উপর।

জাতীয়তাবাদ একটি মানসিক চেতনাও বটে। এ চেতনায় একটি জনসমষ্টি গভীর ঐক্য অনুভব করে এবং অপর লোক হতে স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে। গভীর ঐক্যবোধ ও পৃথককরণ এদু'টি হলো জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এজন্যই জাতি স্বাধিকার অর্জনে বদ্ধপরিকর হয়। পনেরো ও ষোলো শতকে যখন ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তে বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষার ব্যবহার শুরু হয় তখন হতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটতে থাকে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ বহুদিন হতে জাতীয় রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন। তথাপি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। লুথারের সংস্কারের পর জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথ আরও পরিষ্কার হয়।

নীতিভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রথম পুরোধা ছিলেন মেকিয়েভেলি[১৪]। ষোলো শতকে খণ্ড-বিখণ্ড ইতালিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে তিনি জনগণকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তৎকালীন ফ্রান্স ও স্পেনে শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র গঠনও একটি স্মরণীয় ঘটনা। আঠারো শতকে জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও শক্তভাবে দানা বাঁধে। এ শতকে জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্যাপকভাবে বিকাশের ফলেই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে নতুন নতুন জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ১৭৭২ সালে পোল্যান্ড বিভক্ত হবার পূর্বে জাতীয়তার অনুভূতি প্রবল আকার ধারণ করেনি। পোল্যান্ডের বিভাজন জাতীয় জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ইউরোপের সর্বত্র দ্রুত সম্প্রসারণ করে।[১৫]

---

১৪ **মেকিয়েভেলি:** মেকিয়েভেলি (০৩ মে, ১৪৬৯ খ্রি.-২১ জুন, ১৫২৭ খ্রি.) ছিলেন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের একজন ইতালীয় রেনেসাঁর কূটনীতিক; ফ্লোরেনটাইন প্রজাতন্ত্রের সেক্রেটারি। তিনি ছিলেন রেনেসাঁস বা ইউরোপীয় নবজাগরণ যুগের একজন রাজনৈতিক দার্শনিক, সঙ্গীতকার, কবি, রোমান্টিক কমেডি ধাঁচের নাট্যকার এবং একজন জাতীয়তাবাদী লেখক। ১৫১৩ খ্রিষ্টাব্দে রচিত দ্য প্রিন্স বা রাষ্ট্রনায়ক গ্রন্থের জন্য তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁকে আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তাঁর চিন্তাকে ভিত্তি করে 'মেকিয়েভেলিবাদ' নামক চিন্তাধারার উৎপত্তি ঘটে। [সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ* (ঢাকা: প্যাপিরাস, জুলাই, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২৭২; https://www.britannica.com/biography/Niccolo-Machiavelli]

১৫ *Hafiz Habibur Rahman, Ibid,* p. 218

শক্তিশালী রাষ্ট্র রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে পোল্যান্ডের ভাগাভাগি কেবল ইতিহাসের এক বড় কলঙ্কই নয়; বরঞ্চ জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির সন্ধিস্থল হিসেবে এটি এক ঐতিহাসিক সাক্ষীও বটে। তাছাড়া ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী ফরাসি নাগরিকসহ গোটা বিশ্ববাসীকে জাতীয়তাবাদী দর্শনে উজ্জীবিত করে তুলে। জাতীয়তাবাদের বিকাশে এ বিপ্লব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আঠারো শতকে ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ক্ষুধার তীব্র প্রতিক্রিয়াও জাতীয়তাবাদের উজ্জ্বল অধ্যায় রচনায় গভীর প্রভাব ফেলে। বিজিত অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও স্পেনে তাঁর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠে। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে বেলজিয়ামে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠে এবং ইউরোপের সর্বত্র এর জয়ধ্বনি কোনো যায়। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিয় মনীষী ম্যাজিনী ইতালিকে একত্রিত করার জন্য জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ ঘটান। জার্মানিতে বিসমার্কও এ নীতির জয়ধ্বনি ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে জাতীয়তাবোধ হলো এক ধরনের আধ্যাত্ম চেতনা। কতকগুলি লোক যখন একই ভূখণ্ডে বাস করে, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই ঐতিহ্য, একই প্রথা, আচার-ব্যবহার, সর্বজনীন স্বার্থ এবং রাজনৈতিক ঐক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তখন তারা এক জাতি গঠন করে।

জাতীয়তার মূল উপাদান সংহতিবোধ ও মিলনের অসীম আনন্দ। ফরাসি পণ্ডিত রেনান[১৬] বলেন, জাতীয়তাবোধ হচ্ছে একটি মানসিক সত্তা।এটি এক ধরনের সজীব মানসিকতা। ভূখণ্ডের চতুরসীমা, কুল, ধর্ম, এমনকি ইতিহাস বা ঐতিহ্যের মধ্যেও এর সূত্র খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে এর প্রত্যেকটি উপাদানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মনকে মিলন ও ঐক্যের জন্য প্রস্তুত রাখে।

---

১৬ **রেনান:** আর্নেস্ট রেনান (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৩ খ্রি. - ০২ অক্টোবর, ১৮৯২ খ্রি.) ছিলেন একজন ফরাসি লেখক, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ ও ধর্মীয় পণ্ডিত। তাঁর জীবন ছিল বিস্তৃত কর্মময়। লেবানন ও ফিলিস্তিনের বিষয় নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। তিনি যাজকত্বের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তথাপি ১৮৪৫ সালে তিনি এই মনে করে ক্যাথলিক গির্জা ত্যাগ করেন যে, এর শিক্ষাগুলি ঐতিহাসিক সমালোচনার ফলাফলের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। যদিও তিনি ঈশ্বরের প্রতি আধা-খ্রিষ্টান বিশ্বাস বজায় রেখেছিলেন। তাঁর পাঁচ খণ্ডের 'হিস্ট্রি অফ দ্য অরিজিনস অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি' (১৮৬৩-১৮৮০) ও 'লাইফ অফ জিসাস' (১৮৬৩) গির্জার দ্বারা তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল; কিন্তু সাধারণ জনগণের নিকট তা ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে 'ইসরাঈলের মানুষের ইতিহাস' (১৮৮৮-৯৬) সিরিজ ইত্যাদি। [মালুফলুওয়াইস, *আল-মুনজিদ ফি আল-লুগাহ ওয়া আল-আ'লাম* (বৈরূত: আল-কাছুলিকিয়্যা, ২০০৯খ্রি.), পৃ. ৩১৭; https://www.britannica.com/summary/Ernest-Renan]

সংহতিবোধ হচ্ছে এর মূল প্রাণ। এ বোধের মধ্যদিয়ে কতকগুলি লোক মিলে একটি জাতি সৃষ্টি করে এবং তারা সুখে-দুঃখে একে অপরকে সাহায্য করে। আর তারা সহজাত সহানুভূতি ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে বাস করতে সন্তুষ্ট থাকে। এ মনোভাব তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই শাসনামলে বাস করে কিংবা একই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই মানসিকতা গড়ে উঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ এ ঐক্যবোধ অনুভব করতে পারে কিংবা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকগণও এ অনুভূতি লাভ করতে পারে। এটি কোনো বিশিষ্ট উপাদানে সৃষ্টি নয় বরং তা জনসমষ্টির স্বাভাবিক মানসিকতারই ফল।

উনিশ শতক হতে আজ পর্যন্ত যে সকল রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে এর অধিকাংশই হলো জাতীয়রাষ্ট্র। বাংলাদেশের মানুষ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান; অবশেষে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে যে মহান আত্মত্যাগ ও প্রাণোৎসর্গ করে তা বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা থেকেই করে। জাতীয়তাবাদের এজাগ্রত চেতনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রকেও প্রাণবন্ত করেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরও সঞ্জীবিত হয়ে তা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কেননা বাঙালি জাতীয়তাই হলো আমাদের সকল প্রেরণার উৎস। আমাদের এ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী চেতনারই ফসল। যুগে যুগে বহু বিপ্লবী নেতা তাঁদের যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের চেতনায় নতুন নতুন জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টি করেন। মিশরের মুহাম্মদ 'আবদুহ্ও (১৮৪৯-১৯০৫) এর ব্যতিক্রম নয়। সেখানে তিনি তাঁর স্বদেশীয় ভাবনা ও সাজাত্যবোধের মাধ্যমে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মিশরের মুক্তিকামী জনতার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতিরাষ্ট্রের ধারণাকে তরান্বিত করেন। ফলে মিশরের মানুষের মধ্যে জাতীয় একাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়; যা মিশর সহ অত্র অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়। অবশেষে 'আবদুহ্ এর নবজাগরণমূলক জাতীয় চেতনায় উজ্জীবীত হয়ে অতদঅঞ্চলের দেশসমূহ স্বাধীনতার পথে দ্রুত এগিয়ে যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ঔপনিবেশিক মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

আঠারো শতকে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে উসমানীয় তুর্কী খেলাফতের ভাঙন তরান্বিত হয়। পরবর্তীতে উনিশ শতকে তুর্কি অটোম্যান সাম্রাজের সূর্য যখন প্রায় অস্তমিত তখন মুসলিম বিশ্বসহ সারা দুনিয়াতেই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ড দাপটের সাথে উর্ধ্ব গতিতে ক্রমবর্ধমান এগিয়ে যাচ্ছিল। মুসলিম বিরোধী শক্তির লাল চক্ষুর রোষানল ছিল মুসলিম জাহানের সর্বত্র নিপতিত, ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ শাসন তখন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। গোটা ইউরোপ তখন মুসলিম মিল্লাতকে ধ্বংস করার নিত্যনতুন কৌশল প্রয়োগে ব্যস্ত। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির দন্তনখরাঘাতে মুসলিম উম্মাহ ক্ষত-বিক্ষত। মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদভূমি মিশরও এ ঔপনিবেশিক শৃংঙ্খল ও প্রভাবের বাইরে ছিলনা। ক্রমান্বয়ে মিশরেও ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ফলে সারাবিশ্বের ন্যায় ধীরে ধীরে মুসলমানরা এখানেও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। ইসলামী আইন-কানুন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধ ক্রমান্বয়ে পরাজিত হতে থাকে। ফলে মিশরসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মুসলমানরা পরাধীন হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষের দিকে ১৮৮৩ সাল থেকে মিশরের ইতিহাসে শুরু হয় ব্রিটিশ ক্রোমার[১৭] যুগ। ক্রোমার-যুগের ব্যাপ্তি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছর ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। যদিও ১৮৮২ সালের জাতীয়তাবাদী 'উরাবী আন্দোলনের ব্যর্থতার মধ্যদিয়েই মিশরে ব্রিটিশ শাসন জারি হয়। ১৮৭১ সালে গণতান্ত্রিক জার্মানি, ইতালি এবং ফ্রান্সের অভ্যুদয় বিশ্ব পরিস্থিতিতে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অবাধ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ফলে পুঁজিবাদের[১৮] অচল অবস্থা হতে নতুন একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ এবং

---

১৭ **লর্ড ক্রোমার:** মিশরের একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে ব্রিটিশ সরকার অতি সুযোগ্য ও বিচক্ষণ সাবেক মেজর ইভলীন বেয়ারিং লর্ড ক্রোমারকে উপ-প্রতিনিধি হিসেবেমিশরে প্রেরণ করে। উসমানীয় সুলতান ছিলেন নামেমাত্র শাসক এবং তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন খেদিভ, কিন্তু সত্যিকারের ক্ষমতা ছিল লর্ড ক্রোমারের হাতে। ক্রোমারের ছিল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকৃত প্রশাসনের দক্ষতা। তিনি মিশরের প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দূর করেন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনেন। [ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত), *মধ্যপ্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সং.,পৃ. ২৩৪ এবং ভুঁইয়া, ড. গোলাম কিবরিয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৯,৪০]

১৮ **পুঁজিবাদ:** পুঁজিবাদ বা Capitalism মার্কসীয় মতে, সামন্তবাদকে অপসারিত করে তার স্থলাভিষিক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হলো পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি হলো: ক. উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিমালিকানা। খ.

অভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুগের নতুন বৈশিষ্ট্য। এ পটভূমিতে ক্রোমার নিরলসভাবে মিশরে নতুন শক্তিশালী তুলনামূলকভাবে দূর্নীতিমুক্ত প্রশাসনযন্ত্র গড়ে তোলেন, এবং নিপুণতার সাথে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণ করেন।[১৯]

সর্বোপরি মিশরের সার্বিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রোমার একটি শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কেননা তাঁর ভূমি ব্যবস্থা, ভূমি রাজস্ব ও কৃষিনীতি দ্বারা জ্বরাজীর্ণ স্থবির সামন্ত কাঠামোর সংস্কার সাধন করে বাহ্যত এমন একটি সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এ সময় প্যান-ইসলামের[২০] প্রচণ্ড বিস্ফোরণেরও তাতে বড় রকমের চির ধরানো সম্ভব হয়নি।[২১] তাছাড়া খেদিভ

উদ্বৃত্ত মূল্যশোষণ, সময়ে সময়ে সঙ্কট, বেকারত্ব, ব্যাপক জনগণের দারিদ্র্য, অবাধ প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ ইত্যাদিকেই পুঁজিবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়। পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ হলো সামাজিকীকৃত শ্রমরূপের সঙ্গে ভোগের পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত রূপের দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে এ সমাজেরই দুই প্রধান শ্রেণি; বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণির দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। পুঁজিবাদের প্রবক্তারা বাহ্যত রাজনৈতিক সাম্যের কথা ঘোষণা করলেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুন এ ঘোষণা কার্যত প্রহসনেই পরিণত হয়। পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিভূরা রাষ্ট্রযন্ত্রসহ যাবতীয় ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে রাখে, যেন দরিদ্র বা মেহনতি মানুষ কখনোই পুঁজিপতিদের সমকক্ষ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা আইনগত অধিকার ভোগ করতে না পারে। যেমন: তারা নির্বাচনব্যবস্থাকে এমনই একটা ব্যয়বহুল ব্যবস্থা হিসেবে বজায় রাখে, যাতে কাগজে-কলমে যে কেউ নির্বাচিত হতে পারে বলে বলা হলেও, কার্যত শুধু ধনী বা তাদের প্রতিনিধিরাই নির্বাচিত হতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের উদ্ভব। সামন্তবাদের পটভূমিতে এর ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল, কেননা পুঁজিবাদ তখন সামন্তবাদের তুলনায় উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত স্তর সাম্রাজ্যবাদে পৌছে যায়; স্থাপিত হয় একচেটিয়া (Monopoly) এবং কুবেরতন্ত্র এর (Oligarchy) আধিপত্য। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছিল বস্তুত এরই ফলশ্রুতি। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উদ্ভবের ফলে পুঁজিবাদ এক নতুন সংকটের সম্মুখীন হয় এবং পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা আঞ্চলিক যুদ্ধ, স্থানীয় উত্তেজনা সৃষ্টি, স্নায়ুযুদ্ধ, প্রভাববলয় সৃষ্টি, অর্থনৈতিক আগ্রাসন ইত্যাদির মাধ্যমে টিকে থাকার প্রয়াস পায়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সমাজবিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য তারা বিভিন্ন সংস্কারমূলক ও আপোসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিণামে আভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা ও গতিহীনতার দরুন বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকেই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ভিত অতি দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে। অথচ পুঁজিবাদ পরিবর্তিত বিশ্ব ও জাতীয় পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে অধিকতর সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯]

১৯ মুসা আনসারী, *আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮ খ্রি.), ১ম সং., পৃ.১০৬।

২০ **প্যান-ইসলাম:** মুসলিম জাতির ঐক্য (প্যান-ইসলামীজম)। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সকল ইসলামী রাষ্ট্রকে এক খিলাফতের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত করা, যাতে বিদেশি আধিপত্য হতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হয়। জামাল উদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৭) ছিলেন বিশব্যাপী ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের অগ্রদূত । এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো মূলত দু'টি। এক. পৃথিবীর সকল মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। দুই. বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করা। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকে এ আন্দোলন শুরু হয়। তৎকালীন তুরস্কের সুলতানের নেতৃত্বে এ আন্দোলন তীব্রতা লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। ১৯১১ সালে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য সম্মেলন আহ্বান করা হলেও তা-ও শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ মিত্রশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানান। এতে বহু মুসলমান সাড়া দেয়। কিন্তু মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু করা সম্ভবপর হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মুস্তাফা কামাল পাশা (আতাতুর্ক) সুলতানকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। তিনি তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র

ইসমা'ঈল পাশার[২২] রাজত্বের অবসানকাল এবং তাওফীক পাশার[২৩] রাজত্বের সূচনালগ্নে এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে মিশরীয় শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মিশরের উপর; ফলে বিদেশিদের হস্তক্ষেপে এর রাজনৈতিক আকাশ হয়ে পড়ে মেঘাচ্ছন্ন এবং এ ভূখণ্ডে শুরু হয় ব্রিটিশ শাসন-শোষণ। এ অবস্থার মূল কারণ ছিল স্বাধীনতাপূর্ব মিশরের শৃঙ্খল-পরাধীন অবস্থা এবং বিদেশি শাসনের প্রকৃতি সম্পর্কে মিশরের মুষ্টিমেয় সচেতন নাগরিক সমাজ এবং গুটি কয়েক বুদ্ধিজীবী ছাড়া আর কেউই দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আঁচ করতে পারেনি। গোড়ার দিকে এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষে একমাত্র আফগানী ও 'আবদুহ্ই মিশরবাসীকে মুক্তি, স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। মাতৃভূমির জন্য স্বাধীনতার অপরিহার্যতা এবং স্বৈরতন্ত্রের[২৪] অসারতা সম্পর্কে 'আবদুহ্ বলেন:

فلا وطن إلا مع الحرية، ولا وطن في حالة الاستبداد. وكان حد الوطن عند الرومانيين المكان الذي فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية.

ঘোষণা করেন এবং আধুনিকীকরণের নীতি গ্রহণ করেন। ফলে প্যান-ইসলাম আন্দোলন ভাটা পড়ে যায়; কেননা তুরস্কই ছিল এ আন্দোলনের কেন্দ্র। ১৯২৬ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত নিখিল মুসলিম কংগ্রেসে এ প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হলেও কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে প্যান-ইসলাম আন্দোলন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। [সম্পাদনা পরিষদ, *প্রাগুক্ত*, ১৯৯২ খ্রি., ১১শ খণ্ড, ১ম সং., পৃ. ৩৩১, ৩৩৫; হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫]

২১ মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৬।

২২ **ইসমা'ঈল পাশা** (১৮৩০-১৮৯৫ খ্রি.) ছিলেন আধুনিক মিশরের জনক। তিনি মুহাম্মদ আলী পাশার নাতি। ইসমা'ঈল পাশা দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অনেক কাজ করেন। তিনি রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্যাস ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন এবং ডাকঘরের জন্য সুচারু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন। মিশরের জন্য জনকল্যাণমূলক নানা কাজ করলেও খেদিভ ইসমা'ঈল বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে মিশরকে ঋণগ্রস্থ ও বিপদাপন্ন করেন। ১৮৭৯ সালে ইসমা'ঈল সিংহাসনচ্যুত হন এবং তদস্থলে তারই পুত্র তাওফীক সিংহাসনে আরোহণ করেন। [মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.), ৩য় সং., পৃ.১৩৫, ১৩৬]

২৩ **তাওফীক পাশা:** খেদিভ তৌফিক পাশা ১৮৫২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মিশরেই পড়াশোনা করেন। তাঁর মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ছিল প্রবল। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম যে সমস্যাটি মোকাবেলা করেন সেটি ছিল তুরস্কের সঙ্গে মিশরের সম্পর্কের উন্নয়ন। তাওফীক পাশা তাঁর শাসন কালের শুরুতেই অসাংবিধানিক উপায়ে শাসন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। [ভুঁইয়া, ড. গোলাম কিরিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪।]

২৪ **স্বৈরতন্ত্র:** Authoritarianism বা Autocracy বা Despotism-ই হলো স্বৈরতন্ত্র, স্বৈরশাসনবাদ বা স্বেচ্ছাচারবাদ। এ মতবাদের সমর্থকদের মতে, গণতন্ত্র জাতিকে বিভক্ত ও দুর্বল করে। সুতরাং রাষ্ট্রকে সংহত ও শক্তিশালী করার জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী একক বা কতিপয় ব্যক্তিত্বের শাসন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত এবং প্রায়শই গণস্বার্থ বিরোধী। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪১৭]

অর্থঃ স্বাধীনতা ছাড়া কোনো মাতৃভূমি নেই, আর স্বৈরতন্ত্রেও কোনো মাতৃভূমি নেই। রোমবাসীরা এমন এক মাতৃভূমির নাগরিক ছিল যেখানে রাজনৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য ছিল।[২৫]

যদিও পরবর্তীতে সা'দ জাগলুল পাশা[২৬] সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রাক যুদ্ধকালে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি এক প্যান-ইসলামী ঐক্যসূত্র ছাড়া সমাজের সম্মুখে বাস্তব জীবনভিত্তিক কোনো কর্মসূচি উপস্থাপন করতে সমর্থ ছিলনা। সেদিন বৈষয়িক বাস্তবতা ছিল খুবই সংকীর্ণ।[২৭]

অন্যদিকে মিশরসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে আফগানী ও 'আবদুহ্ এর প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা সংগ্রামের যে নতুন বীজ বপন করা হয়েছিল, ধীরে ধীরে তা অঙ্কুরিত হয়ে পত্র-পল্লবে বিকশিত হয় এবং তা এক মহামহীরুহে পরিণত হয়। তাঁদের যোগ্যশিষ্য আহমদ 'উরাবী পাশার[২৮] নেতৃত্বে সমগ্র মিশরে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। কালের আবর্তনে এ আন্দোলনই জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয় এবং 'হিযব আল-ওয়াতান'[২৯] এর ন্যায় একটি স্বাধীনতাকামী অসাম্প্রদায়িক দলের সৃষ্টি হয়। 'আবদুহ্

---

২৫ *আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিসরিয়্যাহ্* (কায়রোঃ ২৮ নভেম্বর, ১৮৮১ খ্রি.), পৃ. ২৫।

২৬ **সা'দ জাগলুল পাশাঃ** মিশরীয় জাতির পিতা সা'দ জাগলুল পাশা ১৮৫৭ (মতান্তরে ১৮৬০) সালে মিশরের গারবিয়া প্রদেশের অন্তর্গত আইবিয়ানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন গ্রাম প্রধান (উমদা) দিলেন, যা তাঁর পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও স্থানীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সনাতন পড়াশুনা শেষ করার পর জাগলুল উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৭১ সালে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। এখানে জাগলুল আফগানী ও 'আবদুহ্ এর শিষ্যে পরিণত হন। ১৮৯২ সালে তিনি আপিল আদালতের বিচারক নিযুক্ত হন। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি মিশরীয়দের শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১০ সালে তাকে আইন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। [এম এ কাউসার, *প্রাগুক্ত*,পৃ.২৮৮]

২৭ মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৬।

২৮ **'উরাবী পাশাঃ** উত্তর মিশরের এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান হওয়া সত্তেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অসাধারণ মেধা, কর্মদক্ষতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দেন। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও তাঁর স্বীয় উদ্যম ও সামরিক বুদ্ধিমত্তার কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কর্নেল পদে উন্নীত হন। মিশরীয় বাহিনীতে যখন তুর্কী ও সিরকাসিয়ান মামলুকদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার প্রতিবাদে মুষ্টিমেয় মিশরীয় সামরিক অফিসারদের নিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করা হয়; তখন 'উরাবী পাশা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। 'উরাবী পাশা এ সমিতির একজন শীর্ষ নেতা ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাগ্মী। আধুনিক মিশরের ইতিহাসে তিনি সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। [অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব*, (ঢাকাঃ নভেল পাবলিশিং হাউস, আগস্ট ২০১০ খ্রি.), তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪০৬-৪০৭]

২৯ **হিযব আল-ওয়াতানঃ** ১৮৯২ সালে তৌফিক পাশার মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আব্বাস হিলমী (১৮৯২-১৯১৪) খেদিভ নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন নাবালক এবং প্রশাসনিক কাজে অনভিজ্ঞ। ফলে মিশরে রাজনৈতিক অচলাবস্থার

জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে স্বাধীনতা অর্জনের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'হিযব আল-ওয়াতান' (জাতীয়তাবাদী দল) গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জাতীয়তাবাদী এ দলের পরিকল্পনা ও লক্ষ্যকে বিধিবদ্ধ করেন এবং এ দলকে একটি অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে গঠনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। কেননা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-দর্শন ছিল এমন যে,

الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني فإنه مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذهب، وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم لغتها منضم إليها .

অর্থ: 'হিযব আল-ওয়াতান' একটি রাজনৈতিক দল, এটি কোনো ধর্মভিত্তিক দল নয়। কেননা এটাকে এমন একটি দল হিসেবে গঠন করা হয়েছে যেখানে ভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদের মানুষ রয়েছে। আর ইহুদী-খ্রিষ্টানসহ সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাও এখানে আছে এবং মিশরের ঐ সকল মানুষও এখানে রয়েছে যারা মিশরের (স্বাধীন) ভূখণ্ডের জন্যে কাজ করে এবং কথা বলে।[৩০] একইভাবে সাম্প্রদায়িক[৩১] সম্প্রীতি এবং জাতীয় ঐক্যের পথ ও পদ্ধতিও তিনি জাতির সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন:

সৃষ্টি হয়। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় প্যারিসে আইন শাস্ত্র অধ্যয়নরত মোস্তফা কামিল নামে এক বুদ্ধিদীপ্ত মিশরীয় তরুণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে মিশরে চলমান ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের অবসান দাবি করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি 'হিযব আল-ওয়াতান' নামে একটি জাতীয় দল গঠন করেন। ১৮৯৬ সালে প্যারিস থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সংবাদপত্র ও স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এ আন্দোলনই ইতিহাসে দ্বিতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর 'হিযব আল-ওয়াতান' এর নেতৃত্ব দেন তাঁর সহকর্মী মোহাম্মদ ফরিদ বে। দ্বিতীয় জাতীয়তাবাদী এই আন্দোলনটি ছিল মূলত নগর ও কতিপয় বুদ্ধিজীবী কেন্দ্রিক। [অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব*, (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, আগস্ট ২০১০ খ্রি.), তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪১৩-৪১৪]

৩০ মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, *আল-'আমাল আল-কামিলাহ্ লি আল-ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: দার আল-সুরক্ব, ১৯৯৩ খ্রি.), ১ম সং., ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

৩১ সাম্প্রদায়িকতা Communalism: ধর্মীয়, জাতিগত বা আঞ্চলিক সংকীর্ণতাকেই বলে সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার অপর বৈশিষ্ট্য হলো অন্য ধর্ম, জাতি বা অঞ্চলের ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা যা প্রায়শই দাঙ্গায় রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ হিসেবে প্যালেষ্টাইনে ইহুদিদের মুসলিমবিদ্বেষ, দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপার্ট-হিড, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপজাতীয় সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত পৃথিবীর প্রায় দেশেই কোনো না কোনো রূপে সাম্প্রদায়িকতার কমবেশি অবস্থিতি রয়েছে। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৬।]

ان خير اوجه الوحدة الوطنية امتناع الخلاف و النزاع فيه .

অর্থ: জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো বা শ্রেষ্ঠ উপায় হলো মতানৈক্য ও বিবাদ এড়িয়ে চলা।[৩২]

'হিযব আল-ওয়াতান' গঠনের মাধ্যমেই মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ আন্দোলন দেশে দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এর মাধ্যমে মিশরের রাজনৈতিক অবস্থার বিস্ফোরন্মুখ হয়। ১৮৮১ সালে 'উরাবী পাশাসহ সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা বিদেশিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক এটা নিশ্চিত হয় যে, এ বিদ্রোহে আফগানী ও 'আবদুহ্ অনুপ্রেরণা যোগায়। এ আন্দোলনের প্রথম দিকে 'আবদুহ্ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী মিশরবাসী যখন জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করে এবং এ আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় আন্দোলন রূপে দানা বাঁধে তখন তিনিও এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্কে তিন বৎসরের জন্য নির্বাসন দেয়া হয়।[৩৩]

এ আন্দোলনের আরও একজন নিবেদিত প্রাণ ছিলেন কবি হাফিজ মুহাম্মদ বেগ ইব্রাহিম[৩৪] (১৮৭২-১৯৩২)। হাফিজ ছিলেন প্যান-ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববিশ্রুত নেতা এবং মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অন্যতম প্রধান ভাবশিষ্য, বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সঙ্গী। হাফি ইব্রাহিমের দেশাত্ববোধ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে ওঠার পেছনে যার সাহচর্য তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্।

---

৩২ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, তা'রীখ আল-উসতায আল-ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্ (কায়রো: ১৯৩১ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

৩৩ *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

৩৪ কবি হাফিজ মুহাম্মদ বেগ ইব্রাহিম (১৮৭২-১৯৩২)। তিনি আধুনিক আরবি কাব্যের পঞ্চস্তম্ভের (বারুদী, সাবরী, শাওকী, হাফিজ ও মুতরান) অন্যতম একজন। তিনি ছিলেন আধুনিক মিশরের একজন দেশ-প্রেমিক, স্বাধীনচেতা ও স্বভাবকবি। তাঁর কবিতায় তিনি মিশরের গণ-মানুষকে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন দেখাতেন। এজন্য তাঁকে মিশরের জাতীয় কবিও বলা হয়। তবে তিনি শা'ইর আল-নীল (নীলনদের কবি) হিসেবেও সমধিক পরিচিত। তিনি নীল পৃষ্ঠে (অর্থ্যাৎ নীল নদের ভাসমান নৌকায়) জন্ম গ্রহণ করেন, তাই তিনি পরবর্তীতে শা'ইর আল-নীল বা 'নীল নদের কবি' হিসেবে সুখ্যাত হন। [আমীন, ড. আহমদ, *মুকাদ্দামাতু দিওয়ানি হাফিজ ইব্রাহীম* (বৈরুত: ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৬]

১৮৯৯ সালে সুদানের এক সেনা বিদ্রোহে হাফিজের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হলে সামরিক আদালতের রায়ে ৩ মে, ১৯০০ সালে তাকে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়।[৩৫] অনেক খোঁজাখুজির পর তিনি কোনো কাজ না পেয়ে চরম হতাশা ও দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হন। জীবনের এমনই এক সংকটকালে তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও সংস্কারক মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সাথে। 'আবদুহ্ ছিলেন তৎকালীন মিশরের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার এবং শুদ্ধি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম পুরোধা। তিনি সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামী এবং দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত করতে আগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কবি হাফিজ ইব্রাহীম 'আবদুহ্ এর সংস্কার, বিপ্লব ও জাতীয় জাগরণমূলক কর্মসূচিতে একাত্মতা পোষণ করে তাঁর সান্নিধ্যে আসেন এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁর সকল কর্মসূচিকে তরান্বিত করার প্রাণপণ চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। 'আবদুহ্ এর বিপ্লবী সাহচর্যে আসার সুবাদে মিশরের কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সংস্কারবাদী বিপ্লবী নেতার সাথে হাফিজের সখ্য গড়ে উঠে। এ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে সা'দ জাগলুল পাশা, মুস্তফা কামিল[৩৬] ও কাসিম অমিন[৩৭] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৮] মিশরের এ সকল বিশিষ্ট নাগরিকের সংস্পর্শ ও সাহচর্য হাফিজের চিন্তা-চেতনা ও মননে গভীর রেখাপাত করে। তিনি তাঁদের দেশাত্মবোধ, জাতীয় জাগরণমূলক

---

৩৫ সিন্দ আল-জুন্দী, ড. আব্দুল হামীদ, *হাফিজ ইব্রাহীম* শা'ইর আল-নীল (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬৮ খ্রি.), ৩য় সং, পৃ. ১৬।

৩৬ **মুস্তফা কামিল:** ১৯০৫ সালে রাশিয়া জাপানের হাতে পরাজয়ের ফলে এবং জার্মানির ক্রমবর্ধমান উত্থানের জন্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অচিন্তনীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ সময় মিশরে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। একদল তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদের প্যান-ইসলামীজম আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং অন্যদল জাতীয় স্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিক সরকারের পক্ষপাতী হয়। এদলের প্রধান মুখপাত্র ছিলেন ফরাসি শিক্ষায় শিক্ষিত আল-ওয়াতান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা আইনজীবী মুস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮)। ১৯০৮ সালে মুস্তফা কামিলের ইন্তেকালের পর আন্দোলন পরিচালনা করেন অন্য আরেকজন আনইনজীবী, যিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন তিনি হলেন সা'দ জাগলুল। [মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৪।]

৩৭ **কাসিম আমিন:** একজন আরব প্রাচ্যবিদ এবং সামাজিক বিষয়ের লেখক। তিনি মিশরে আরব নারী মুক্তি আন্দোলন ত্বরান্বিত করার অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায়। তাঁর মাতা মিশরীয় ও পিতা তুর্কি বংশোদ্ভূত। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ শক্তি মিশর দখল করে এবং 'উরাবী পাশার বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। মিশরে সংস্কার কার্যক্রমের অংশবিশেষ ইতোমধ্যেই বলবৎ করা হয়েছিল। কাসিম আমিন ঐ সংস্কার কার্যক্রমে তাঁর প্রথম অবদান রাখেন। [সম্পাদনা পরিষদ,*প্রাগুক্ত*,২০০৮ খ্রি., ৭ম খণ্ড, ২য় সং.,পৃ.৬৭৯।]

চেতনা ও বুদ্ধিদীপ্ত সংস্কারবাদী আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়ে সমাজ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্রতী হন। এই সময়ে তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদ ও কর্তৃত্ববাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং বহু দেশাত্মবোধক ও জাতীয় জাগরণমূলক কবিতা রচনা করেন। তৎকালীন মিশরের পত্রিকা-মঞ্চ সমূহের রাজনৈতিক প্রবক্তা ছিল তাঁর কবিতা। তাঁর রাজনৈতিক কবিতাসমূহের মধ্যে 'দিনসাওয়াই'[৩৯] এর ঘটনা সম্বলিত কবিতাটি অনুপম।[৪০]তাঁর কবিতা ও রচনাবলি ছিল মিশরীয় জাতির স্বাধীনতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এ সকল কারণে তাঁর কবিতার প্রতিবাদ্য বিষয় খুব সহজেই গণ-মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যেতো। আর পাঠকদের মনে হতো এ যেন তাদেরই হৃদয়ের কথা।[৪১]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর পরে তাঁর এ দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার মশাল প্রজ্জ্বলন করেন তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য মিশরের নব্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা সা'দ জাগলুল পাশা (১৮৫৯-১৯২৭খ্রি.)।[৪২] মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন জনমুখী হয়ে তুঙ্গে আরোহণ করে

---

৩৮ Hafiz Ibrahim, *Encyclopaedia of Islam,* (London: 1986, new edition), vol. iii, p. 59

৩৯ **দিনসাওয়াই ঘটনা:** ১৯০৬ সালে কায়রো থেকে আলেকজান্দ্রিয়া গমন করে কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসার মিনওফিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেন। তারা পাশ্ববর্তী দিনসাওয়াই গ্রামে পাখি শিকারে বের হয়। ঘটনাচক্রে শিকারের সময় স্থানীয় একজন ইমামের স্ত্রী গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় গ্রামবাসী ব্রিটিশ শিকারীদের ঘিরে ফেলে হামলা চালায়। এ আক্রমণে দু'জন ব্রিটিশ অফিসার আহত হয়। অফিসারগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাতে থাকে এবং আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছোঁড়ে। পথিমধ্যে একজন আহত অফিসারের মৃত্যু হয় এবং অপরজন ক্যাম্পে ফিরে আসে। উত্তেজিত ব্রিটিশ সৈন্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে একজন স্থানীয় লোককে হত্যা করে। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা প্রায় বায়ান্ন জন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। সিরিন আল-কুম নামক স্থানে ব্রিটিশ অফিসারদের উপর আক্রমণের জন্য ১৮৯৫ সালে জারীকৃত আইনের বিধান অনুসারে গ্রেফতারকৃত গ্রামবাসীদেরকে আদালতে বিচারের মুখোমুখী করা হয়। ভুটুস গালী পাশা নামক একজন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী হিসেবে বিচার কাজ পরিচালনা করেন। ১৯০৬ সালের ২৭ জুন গ্রেফতারকৃত গ্রামবাসীদের মধ্যে চারজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়; অনেকে কারাবরণ এবং বেত্রাঘাতের দণ্ড লাভ করে। প্রকাশ্যে এ ধরনের নৃশংস সাজা দেওয়া হলে মিশরীয়দের জাতীয় মর্যাদায় চরম আঘাত আসে। এ ঘটনা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মিশরীয়দের উদ্বুদ্ধ করে। উক্ত বর্বরতা ও নৃশংসতার জন্য মোস্তফা কামিল মিশর থেকে ব্রিটিশদের প্রত্যাবর্তনের দাবী জানান। এ ঘটনাটি মিশরের সাধারণ আইন সভায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় এবং সেখানে জোরালো দাবী উঠে যে, বন্দীকৃত দিনসাওয়াই গ্রামের নিরপরাধ গ্রামবাসীদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক। [অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব*(ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, আগস্ট ২০১০ খ্রি.), তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪১৫-৪১৬]

৪০ হাফিজ ইব্রাহীম, *দিওয়ানু হাফিজ ইব্রাহীম* (কায়রো: দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্, ১৯৩৭ খ্রি.), খণ্ড. ২, পৃ. ২১।

৪১ আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *তা'রীখ আল-আদাব আল-'আরাবি* (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ, ১৯৯৫ খ্রি., ২৬ তম সং.), পৃ. ৫০৬।

৪২ Jamal Mohammad Ahad,*The intellectual origin of Egyptian nationalism* (London: 1966), p. 36.

তখন সা'দ জাগলুল পাশা এ গণআন্দোলনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য এবং তৎকালীন সরকারের নিকট থেকে মিশরবাসীর ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে 'আল-ওয়াফদ আল-মিশরী' বা মিশরীয় ডেলিগেশন নামে একটি স্থায়ী পর্ষদ গঠন করেন। 'ওয়াফদ' পার্টির এ আহবানে মিশরীয় জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে উঠে। ফলে ইংরেজ আশির্বাদপুষ্ট মিশরীয় পুতুল সরকার জনতা হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জনমুখী এ গণআন্দোলন গণসংগ্রামে রূপ পরিগ্রহ করে তা শুধু শহুরে ইফেন্দি, পাতি-বুর্জোয়া, শ্রমিক, ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এর উত্তাপ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতাপূর্ব ঔপনিবেশিক মিশরে এরূপ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তা বিকশিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। অবশেষে তৈরি হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী প্রেক্ষাপট; যা মিশরকে চূড়ান্ত বিপ্লব ও পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মিশরে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন পর্যন্ত মুহাম্মদ 'আবদুহ্ (১৮৪৯-১৯০৫) এর জীবনকাল। এতো অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেশ, জাতি ও মানুষের জন্য যা করে গিয়েছেন তা ইতিহাসে বিরল। তিনি ইংরেজদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধে প্যান-ইসলামীজমের প্রবক্তা জামাল উদ্দীন আফগানীর (১৮৩৮-১৮৯৭) পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।[৪৩] তিনি তাঁর রচনায় সমগ্র মুসলিম জাতির বিশেষ করে মিশরীয় জাতির শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের শাসন-শোষণ সম্পর্কে পাঠকদের সম্যক অবহিত করেন। একই সাথে তিনি এ সকল সমস্যা সমাধানের যুগোপযোগী পরামর্শও দান করেন। জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য সকলের ঐক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে 'আবদুহ্ বলেন:

إن بدت منفعة لأيٍّ منهم تضافر الكلُّ علي جلبها، وإن ألمَّت به ملمّة اتحدت قوي الجميع على إبعادها، فحينئذ يعمّ النفع جميع المواطنين،وتثتتبُّ الأمنية، وتتَّسع داءرة المنافع المستديمة .

অর্থ: যদি তাদের সকলেই একে অপরে কল্যাণ পেতে চায় তাহলে প্রত্যেকেই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একে অপরকে (আন্তরিকভাবে) গ্রহণ করে নিবে। আর যদি কোনো বিপদে আপতিত হয় তাহলে সকলের শক্তির একতা দিয়ে তা দূর (প্রতিহত) করবে। আর তখনই সকল নাগরিক সুবিধা প্রাপ্ত হবে, নিরাপত্তা বজায় থাকবে এবং টেকসই উন্নয়নের দ্বার প্রসারিত হবে।[৪৪]

মিশরে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ, বিকাশ, স্বাধীনতা রক্ষা ও মুসলিম জাতির মুক্তির জন্য তিনি আজীবন নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। চতুর্দশ হিজরি সনের প্রারম্ভলগ্নে বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ করে ধর্মীয় অবস্থার যে শোচনীয় অবস্থা

৪৩ Kedourie, Elie, *Afghani and 'Abduh: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam* (London: Frank Cass, 1997), p. 123.

৪৪ *আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিসরিয়্যাহ্*,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

বিরাজমান ছিল তার একটি আশু পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। ঠিক এ সময় কয়েকজন প্রতিভাবান ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী মুসলিম জাতির কান্ডারি হিসেবে এগিয়ে আসেন। তাঁরা মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান তন্দ্রাভাবের কারণ উদঘাটন এবং এ জাতির এহেন দূরাবস্থা নিরসনের কার্যকরী পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কারের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের চিন্তা ও মননের আধুনিকতর রূপ তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেন। এদের মধ্যে প্যান-ইসলামী আন্দোলনের শাইখ জামাল উদ্দীন আফগানী এবং মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে আল-'উরওয়াতু আল-উস্কা, আল-ও'য়াদু আল-মিশরিয়্যাহ্, আল-হিনদিয়্যাহ ও আল-তাতারিয়্যাহ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও শক্তি এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে 'আবদুহ্ বলেন:

أليس من البيّن أنه لا دين الا بدولة، ولا دولة الا بصولة، ولا صولة الا بقوة، ولا قوة الا بثروة .

অর্থ: সর্বজনবিদিত যে, রাষ্ট্র ছাড়া কোনো ধর্ম নেই, ক্ষমতা ছাড়া কোনোরাষ্ট্র নেই, আর শক্তি ছাড়া কোনো অধিকার নেই, সম্পদ ছাড়া কোনো ক্ষমতা নেই।[৪৫]

'আবদুহ্ জীবনের এক যুগ সন্ধিক্ষণে ১৮৭১ সালে শাইখ জামাল উদ্দীন আফগানীর সংস্পর্শে আসেন। আফগানীর সাহচর্যের কল্যাণেই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ জাতির সেবা করার অদম্য অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং তাঁর মধ্যে ধর্মীয়, নৈতিক ও সমাজ সংস্কারের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।[৪৬] আফগানী তাঁর সামনে ইসলামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগ-সমস্যার সঠিক পথ ও পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। তাঁকে সাংবাদিকতাসহ লেখালেখির আধুনিক স্টাইল, বক্তৃতা-ভাষণের সম্মোহনী কলা-কৌশল ইত্যাদি শিখিয়ে দেন। একইভাবে 'আবদুহ্ এরও লেখালেখির মূল লক্ষ্য ছিল মিশরে একদল সংস্কারপন্থী বিপ্লবী তরুণ সৃষ্টি করা; যারা তৎকালীন মিশরের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও বিপ্লব সাধনে কার্যকারী ভূমিকা রাখবে। তাই তিনি মাদ্রাসাতু আল-সুন্নায় আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক

৪৫ *মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, প্রাগুক্ত*,৩য় খণ্ড,পৃ. ২০।

৪৬ Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muhammad 'Abduh* (London: Oxford University Press, 1933), p. 33)

থাকাকালীন ছাত্রদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ধারণা ও রুচিবোধ সৃষ্টি করতেন এবং তাদেরকে প্রবন্ধ রচনার প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন; যাতে করে মিশরের যুবসমাজ আরবি ভাষা ও ইসলামী শিক্ষার পুনরুজ্জীবন দান এবং মিশরের শাসন ব্যবস্থার ভ্রান্ত দিকগুলো সংশোধন করতে পারে।[৪৭]

কিন্তু 'আবদুহ্ এ অগ্রযাত্রায় বেশি দূর অগ্রসর হবার পূর্বেই তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তাঁর কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাঁর এ দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়ে নিজ গ্রামে প্রেরণ করেন এবং তাকে এক ধরনের নজরবন্দি করে রাখা হয়। তিনি তাঁর পদ হারিয়ে যাবার ভয় কখনও করেননি ; বরং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি মিশরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত বিভিন্ন গঠনমূলক প্রবন্ধ লিখতেন এবং মিশরবাসীকে আশুমুক্তি ও পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাতেন। এ সমস্ত প্রবন্ধে তিনি সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনা পূর্বক মিশরীয় জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি বলেন:

وليس للدولة تجارة وصناعة، وانما ثروتها بثروة اهليها، ولا تمكن ثروة الأهالي الا بنشر العلوم فيما بينهم، حتي يتبينوا طرق الاكتساب .

অর্থ: ব্যবসা ও শিল্প রাষ্ট্রের নয়, বরং এর সম্পদ রাষ্ট্রের জনগণের। আর তাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ছাড়া জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয় যতক্ষণ না তারা এটি অর্জনের কৌশল সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।[৪৮]

তাঁর সংস্কারধর্মী পদক্ষেপ ও সমালোচনা হতে সরকারি প্রশাসনসহ কেউই রেহাই পায়নি। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি ছিল; সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি মিশরবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে নিজ নিজ অধিকার ও ন্যায্য দাবি আদায়ের তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন।[৪৯]

---

৪৭ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত*, তৃতীয় খণ্ড (কায়রো: ১৯৩১ খ্রি.), পৃ.২৪।

৪৮ *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০।

৪৯ Amin, Osman. *Muhammad Abduh* (Washington DC: American Council of Learned Societies, 1953), p. 32

এভাবে তিনি মিশরীয় ছাত্র ও যুবসমাজসহ জাতির সচেতন নাগরিকদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতেন।

জাতির কাছে মাতৃভূমি ও প্রকৃত দেশপ্রেমিকের সংজ্ঞা তুলে ধরতে করতে গিয়ে 'রাজনৈতিক জীবন, মাতৃভূমি ও স্বদেশপ্রেম' শীর্ষক এক প্রবন্ধে 'আবদুহ্বলেন:

إن الوطن في اللغة يعني محل الإنسان مطلقاً، فهو السكن بمعنى: استوطن القوم هذه الأرض وتوطنوها، أي اتخذوها سكناً. والوطن عند أهل السياسة مكانُك الذي تُنسَب إليه ويُحفظ حقُّك فيه، وتعلم حقّه عليك، وتأمن فيه على نفسك وآلك ومالك.

অর্থ: মাতৃভূমি বলতে একজন ব্যক্তির সামগ্রিক স্থানকে বুঝায়। সে অর্থে তা ব্যক্তির বাসস্থানকে বুঝায়। যে জাতি এ ভূখণ্ডকে (মাতৃভূমিকে) সংস্থান করেছে; তারাই তাকে স্থায়ী আবাসরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে ; অর্থাৎ বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাজনীতিকরা তোমাদের আবাসস্থল মাতৃভূমিকে তোমাদের নিকট এমন এক সর্ম্পকের দাবিনিয়ে উপস্থাপন করে; যেখানে তোমার অধিকার রক্ষা পাবে এবং তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব জ্ঞাত থাকবে। আর সেখানে তোমার জীবন, আশ্রয় ও সম্পদের নিরাপত্তা থাকবে ।[৫০]

এ সকল পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ 'আবদুহ্কে বিপ্লব-বিদ্রোহে উস্কানিদানের অভিযোগে নানাভাবে হয়রানি করা হয়; অবশেষে তাঁকে মিশর ত্যাগে বাধ্য করা হয়। তাই ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিশর থেকে সর্বপ্রথম বৈরুতে গমন করেন।[৫১] সেখান থেকে যান ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। প্যারিসে তাঁর উস্তাদ শাইখ জামাল উদ্দীন আফগানীর সাথে সাক্ষাত হয়। এরপর মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী নেতা সা'দ জাগলুলও তাঁদের সাথে মিলিত হন। এদিকে অন্য আরেকজন ইরানি নেতা মির্জা বাকেরও লন্ডন থেকে তাঁদের সাথে যুক্ত হন। এ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গুরু-শিষ্য ও বন্ধু-বান্ধবের সমন্বিত প্রয়াসে প্যান ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা আফগানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় জাম'ইয়্যাতু আল-উস্কা আল-খায়রিয়্যাহ্ নামে একটি সংগঠন। এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভের পর তাঁরা যে কাজটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে করতেন তা হচ্ছে,

---

৫০ *আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিসরিয়্যাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৫১ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

ফ্রান্সের স্বাধীন ভূখণ্ড থেকে প্রাচ্যদেশ সমূহে দেশাত্ববোধ, জাগরণ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বার্তা প্রচার করা।

দেশাত্ববোধ, জাগরণ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বার্তা প্রচারের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ প্যারিস থেকে আফগানী ও 'আবদুহ্ উভয়ের পরিচালনা ও সম্পাদনায় আল-'উরওয়াতু আল-উস্কা (মজবুত রশি) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। জাম'ইয়্যাতু আল-উস্কা আল-খায়রিয়্যাহ্ এর মুখপত্র হিসেবে এ পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম দিন থেকেই এ পত্রিকার লেখাসমূহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংবাদিকতা জগতে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করে। যদিও পত্রিকাটি 'আরবি ভাষায় প্রকাশিত হতো; তথাপি এর চিত্তাকর্ষণ, জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তা অনূদিত হতে লাগল। এ পত্রিকার মাধ্যমে তৎকালীন পরাধীন মিশরসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং তিউনিসিয়া, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতবর্ষসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশে দেশাত্ববোধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের চিন্তাধারা অবারিতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব[৫২], পূর্ণ মালিকানা ও গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি লিখেন:

يا أيها المصريون.هذه دياركم وأموالكم وأعراضكم وعقائد دينكم وأخلاقكم وشريعتكم، قبض العدو علي زمام التصرف فيها غيلةٌ واختلاساً.

অর্থ: হে মিশরবাসী! এ (মিশর) তোমাদের ভূখণ্ড এবং তোমাদেরই সম্পদ। আর এটা তোমাদের মর্যাদা, ধর্মীয় চেতনা, চারিত্রিক মাধুর্য ও জীবন-বিধান। শত্রুরা তাকে প্রতিবন্ধকতার লাগাম পরিয়ে হস্তগত করে নিয়েছে; ফলে সেখানে ধোঁকা ও আত্মসাতের (অর্থাৎ পরাধীনতার) পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।[৫৩]

---

৫২ সার্বভৌমত্ব (Sovereignty): এটা হলো রাষ্ট্রের সে বিশেষত্ব, যার দরুন রাষ্ট্র নিজের আয়ত্তাধীন সমগ্র এলাকার আভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সর্বেসর্বা হয় এবং অপর কোনো রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল থাকে না। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উৎপাদন। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি, সকল বস্তু ও সকল ঘটনার উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। আর বহিঃক্ষেত্রের সার্বভৌমত্ব হলো বাইরের যে কোনো শক্তির নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবমুক্ত থাকা। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৩৯৮]

৫৩ জামাল উদ্দীন আফগানী ও মুহাম্মদ 'আবদুহ্, *আল-'উর ওয়াতু আল-উস্কা* (প্যারিস: ১৮৮৪ খ্রি.), পৃ. ৫১৫।

শত্রুদের প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে জাতিকে তিনি জেগে উঠার উদাত্ত আহ্বান জানান:

ولم يبقِ لكم شيئًا إلا الحرمان خدمة أوطانكم التي طالماً دافعتم عنها في الأيام السا بقة فما ذا تخشون منه؟ أنتم واقعون بسكونكم فيما تخافون منه .

অর্থ: আর তোমাদের মাতৃভূমির সেবার পরিবর্তে তোমাদের জন্য বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যে অতীত তোমাদের দাবিয়ে রেখেছে; তোমরা কি সে ভয় করছ? ইতোপূর্বে তোমরা যে ভয় পেয়েছিলে এখনও সে ভয় নিয়েই তোমরা তোমাদের আবাসভূমিতে দিন যাপন করছ।[৫৪]

তাছাড়া দেশের শত্রুদের প্রতিহত করতে তিনি পূর্বপুরুষদের অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেন:

وإن رسخت قدم العدو بينكم لا يبقي فيكم غني إلا افتقر ولا عظيم إلا احتقر . وإن شئتم فانظروا مستقبلكم في مرآة حاضركم واقرأوا حالكم في تواريخ من سبقوكم .

অর্থ: আর শত্রুদের পদচারণা (অবস্থান) যদি তোমাদের মাঝে দৃঢ়মূল হয়ে যায় তাহলে দারিদ্র্য ছাড়া প্রাচূর্যের, আর অপমান ছাড়া সম্মানের কিছুই তোমাদের নিকট অবশিষ্ট থাকবে না। যদি তোমরা চাও তাহলে তোমাদের সামনে আসন্ন অদূর ভবিষ্যতের দিকে একবার লক্ষ্য কর এবং তোমাদের পূর্বসূরীদের ইতিহাস থেকে তোমাদের অবস্থা পর্যালোচনা কর।[৫৫]

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জাগরণমূলক লেখা প্রকাশ করাই ছিল এ পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। এভাবে সর্বত্র ইংরেজ বিরোধী চেতনা ক্রমেক্রমে দানা বাঁধতে থাকলে তৎকালীন ইংরেজ শাসকগণ মিশর ও ভারত উপমহাদেশে পত্রিকাটির প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে; ফলে এর প্রকাশনা

৫৪ আফগানী ও 'আবদুহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫১৫।
৫৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৬।

বন্ধ করে দিতে হয়।[৫৬] শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাকালীন বছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত পত্রিকাটির মোট আঠারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর প্রতিটি সংখ্যাই মুসলিম বিশ্বের শান্ত সমুদ্রে এমন উত্তাল দ্রোহের সৃষ্টি করে যে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ব্রিটিশ বেনিয়া শক্তি এতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে তিনি তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখনীতেই মিশরবাসীকে প্রকৃত সম্মান, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দেশপ্রেমের আবশ্যকতার বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। যেমন: 'জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক তাঁর এক প্রবন্ধে 'আবদুহ্ বলেন:

لاينال الشرف الانساني و السعادة الحقيقه و الثروة الدائمة و النعيم الثابت؛ الا اذا صلح حال وطنه، فتقدم أبناؤه، و تحلّت نفوسهم بالمعارف وصفات الكمال، فيأخذ كلُّ واحد حقَّه، ويؤدِّى الواجب عليه .

অর্থ: একজন ব্যক্তি মানবিক সম্মান, সত্যিকার সুখ, স্থায়ী সম্পদ ও পরম আনন্দ পেতে পারেনা যদি না তার দেশ তার কাছে বন্ধুত্বপূর্ণ হয়, তার সন্তানরা এগিয়ে না যায় এবং তারা জ্ঞানে-গুণে পরিপূর্ণতা লাভের শপথ গ্রহণ না করে। আর প্রত্যেকে তার নিজ নিজ দায়িত্ব গ্রহণ না করে এবং তার ওপর অর্পিত কর্তব্য পালন না করে।[৫৭]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন আধুনিক যুগে মুসলিম জাগরণের একজন অন্যতম পথিকৃৎ, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষাব্রতী, আইনজ্ঞ, মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা এবং সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কারক। তাঁর রচনাবলি ও চিন্তাধারা মানুষের মনের রাজ্যে ও চিন্তার দুয়ারে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিল; বিশেষ করে মিশরসহ গোটা মুসলিম জাতিকে তিনি নতুনভাবে জাগরণ, মুক্তি ও উন্নয়নের পথ দেখাতে শুরু করেছিলেন। পশ্চিমা শিক্ষা-সংস্কৃতি,রাজনীতি ও বিজ্ঞানকে ইউরোপের সম্পদ ও শক্তির মাপকাঠি মনে করে তিনি মিশরসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। ফলে এ মহান পণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক মিশরীয়

---

৫৬ আহমাদ আমিন, *যু'আমাউ আল-ইসলাহ্ফি 'আসর আল-হাদিস* (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-'আরাবি, ১৯৪৮খ্রি.), পৃ. ৩০৭।

৫৭ *আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিসরিয়্যাহ্*, ০৬ মার্চ, ১৮৮১ খ্রি., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে এখনও অমর হয়ে আছেন। এজন্যই তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার লর্ড ক্রোমার তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, 'আবদুহ্ এর দেশপ্রেম ছিল সন্দেহের উর্ধ্বে।[৫৮] তাঁর চিন্তা-দর্শন আধুনিক মুসলিম বিশ্বেও তাঁকে একজন প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং প্রথাবিরোধী ও যুক্তিবাদের মহান প্রবর্তক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং প্যান-ইসলামী আন্দোলন উভয়ের সাথেই রয়েছে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশে প্যান-ইসলামী চেতনা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আদর্শের বিচারে স্বাধীন রাষ্ট্রের কল্পনা যে জাতীয়তাবাদের মূল সূত্র; এর পূর্ব ভিত হিসেবে কাজ করেছিল প্যান-ইসলামী চেতনা। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিক হিসেবে ধর্মীয় চেতনা তাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। প্যান-ইসলামী ঐক্য ভাবনা এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ ছিল মিশরীয় জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক স্তর। সামাজিক সুবিচার, অর্থনৈতিক মুক্তি, মানুষের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উপনিবেশবাদী আধিপত্য রুখে দাঁড়ানো ইত্যাদি বিষয়গুলি ছিল প্যান-ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের খুবই সাযুজ্যপূর্ণ বিষয়। যদিও মিশরে প্যান-ইসলাম ও জাতীয়বাদী আন্দোলন দুটি ভিন্ন ধারায় আবির্ভূত হয়েছে, প্রকৃতঅর্থে এ দু'টি আন্দোলনের বেশ কিছু অভিন্ন লক্ষ্য ও অনুঘটক এজেন্ডা রয়েছে। এ অভিন্ন এজেন্ডাগুলিই মিশরে জাতীয়বাদী আন্দোলনকে আরও গতিশীল করেছে। ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিপরীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বহুগূণ শক্তি লাভ করেছে। পরিবর্তিত এ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও দ্রোহ রূপ নিয়েছে জাতীয় আন্দোলনে এবং তা সংগঠিত হয়েছে প্যান-ইসলামী উপাদান এবং এর অনুরূপ কাঠামোর মধ্য দিয়ে। এজন্য মিশরের অগণিত গণ-মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল; বিশেষ করে সাধারণ মানুষ, ছাত্র ও কৃষক সমাজের নিকট।

---

৫৮ Cromer Lord, *Modern Egypt,* Volume II (London: Macmillan and Co. Ltd, 1908), p.181.

মিশরে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ উভয় শক্তিই ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। 'আবদুহ্ গণ-মানুষকে একথা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, ইসলাম ধর্ম ও মিশরীয়রা একই সুতোয় বাধা এবং পরস্পর সমার্থক। এভাবে তিনি পাশ্চাত্য শক্তির গতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। তাই দলমত নির্বিশেষে মিশরীয়রা ব্রিটিশ তাবেদারদেরকে দেশ, জাতি ও ইসলামের শত্রু হিসেবেই জানত। 'আবদুহ্ মিশরে প্যান-ইসলামী চিন্তাধারা এবং জাতীয়তাবোধের মধ্যে একটি ঐক্য বন্ধন স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি মিশরীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সহায়ক ভাবাবেগ সঞ্চারণ করেন একই সাথে ইসলামেরশ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁদের জাতীয় চেতনাকে আরও হৃষ্টপুষ্ট করে তুলেন। ফলে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বেড়েছিল, ঠিক তেমনি নিখাদ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের প্রতিও মিশরীয়রা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কারণ ইসলামকে তাঁরা ঐক্য ও সংহতির নিয়ামক শক্তি এবং স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবোধকে নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হিসেবে অনুধাবন করতে শিখেছিল।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর প্যান-ইসলামী ভাবধারা এবং জাতীয় ঐক্য কেন্দ্রিক চিন্তাধারা মিশরীয়দের মানসে স্বাধীনতা লাভের জন্য যেমন অদম্য স্পৃহা জাগিয়ে তোলে তেমনিভাবে পৃথিবীর যে জনপদেই মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেই এ চিন্তাধারা তাঁদেরকে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখাতে থাকে। এ আন্দোলনের ফলেই পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানরা জাতীয় আবাসভূমি গড়তে সক্ষম হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে দেশ, জাতি ও ইসলাম নিয়ে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ের সমন্বিত এ চিন্তাদর্শন দেশে দেশে মুসলিম জাগরণে গতি সঞ্চার করেছিল। জাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগলিক সহাবস্থান ইত্যাদি কারণে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ ছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলির নিকট দুর্বল দেশগুলো শোষণ করার এক মোক্ষম হাতিয়ার। এ সময় ইউরোপ জুড়ে যে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়েছিল তা গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদের অঘোষিত জয় মিছিলে মিশরীয় মুসলমানরাও যুক্ত হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে জাতীয়তাবাদী ধারণা সমূহের বিকাশ ঘটে। এগুলির মধ্যে বিদেশী রাজনৈতিক প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বিপর্যয়, বর্ণ বৈষম্য, পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার, ধর্মীয় প্রেরণা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সব কারণগুলির মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণার যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।[৫৯] 'আবদুহ্ ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী চেতনার মিলগুলি খুঁজে বের করেন এবং এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কেননা গোঁড়া মুসলমানদের দৃষ্টিতে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের চেয়ে ইসলামের বিশ্বজনীনতা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি দেশ, জাতি ও মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। এ ধরনের একটি ঐক্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি মিশরকে চূড়ান্ত স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যান। এজন্য তাঁকে স্বাধীন মিশরের চিন্তা নায়কও বলা যেতে পারে।

৫৯ জহর সেন, *দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস* (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৬ খ্রি.), দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ.১৮১।

চতুর্থ অধ্যায়

মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ এর সমাজ সংস্কার আন্দোলন

১ম পরিচ্ছেদঃ
চিন্তার মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস

২য় পরিচ্ছেদঃ
ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন

৩য় পরিচ্ছেদঃ
তাকলিদ সম্পর্কে মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ এর চিন্তাধারা

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ
পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে তাকলিদের যৌক্তিকতা

৫ম পরিচ্ছেদঃ
শারী‘য়াহ্ ‘আদালতের সংস্কার

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ
নারী অধিকার আন্দোলন

৭ম পরিচ্ছেদঃ
পবিত্র কোরআন ও হাদিসে হিযাবের যৌক্তিকতা

প্রথম পরিচ্ছেদ
চিন্তার মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস

মানুষ মাত্রই চিন্তাশীল। চিন্তার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। চিন্তা করা থেকে একজন মানুষকে কোনোভাবেই ফিরিয়ে রাখা যায়না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের চিন্তাকে লুকায়িত রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের চিন্তার শক্তি ও লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। যদি তার এ চিন্তা প্রকাশিত না হয় তাহলে মানুষের কাছে তা কোনো গুরুত্বই বহন করেনা। মানবজাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য চিন্তার স্বাধীনতা পূর্বশর্ত। চিন্তার স্বাধীনতা মানব স্বভাবের এক স্বত:সিদ্ধ চিরন্তন বাস্তবতা। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে এর অবদান অনস্বীকার্য। কেননা মানব সমাজে যদি চিন্তার স্বাধীনতা কিংবা মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রয়োজনীয় সুযোগ না থাকে তাহলে উন্নয়ন ও অগ্রগতি মুখ থুবড়ে পড়বে। মানুষ অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে কুসংস্কারের পথে পা বাড়াবে। অধিকন্তু স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ব্যাহত হবে। যেমনটি ঘটেছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে।

এ সময়ে খ্রিষ্টীয় বন্দিশালায় যুক্তি বন্দিত্ব গ্রহণ করেছিল। শুরু হয়েছিল হাজার বছরের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ (আনুমানিক ৫০০-১৫০০ খ্রি.)। ইতিহাসে এ সময়টাকেই মধ্যযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ সময়ে খ্রিষ্টধর্মের উত্থানের সাথে সাথে গ্রিক ও রোমান সভ্যতার পতন ঘটে। এর ফলশ্রুতিতে প্রায় এক হাজার বছর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

মধ্যযুগের অন্ধকার দূরীভূত করে নতুন সোনালি প্রভাতের প্রত্যাশায় তেরো শতকে ইতালিতে শুরু হয় রেনেসাঁস। আর রেনেঁসাকে ঘিরে এর পরপরই শুরু হয় খ্রিষ্টধর্ম সংস্কার আন্দোলন। যে সংস্কারের ফলে খ্রিষ্টীয় ধর্মের চর্চা,অনুশীলন ও বিশ্বাসে কিছুটা সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয় এবং চিন্তার মুক্তি ও যুক্তিবাদের ক্রমবিকাশের ধারা খানিকটা অব্যাহত থাকে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল পোপতন্ত্র[১] (Papacy)। ইউরোপের উপর যতোদিন পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল

---

১ **পোপতন্ত্র (Papacy):** একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পবিত্র রোমান সম্রাট (Holy Roman Emperor) পোপও অন্যান্য ধর্মযাজককে নিযুক্ত করতেন। কিন্তু ১০৫৯ সালে পোপ দ্বিতীয় নিকোলাস এ মর্মে এক ডিক্রি জারি করেন যে, এখন থেকে কার্ডিনালদের একটি পরিষদই (College of Cardinals) ধর্মযাজকদের নিয়োগ প্রদান

ততোদিন পর্যন্ত গোটা ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এ সময়ে ধর্মযাজকগণ সাধারণ মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা শিক্ষা-সচেতনতামূলক প্রেরণা দানকারী সকল প্রচেষ্টাকে বলপূর্বক দমন-পীড়ন করার চেষ্টা করেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত করার অপরাধে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে পর্যন্ত নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। তদুপরি চারদিক থেকে একের পর এক জাগরণের প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং কোনো প্রতিবন্ধকতাই মুক্ত বিজ্ঞান চর্চার পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি।[২]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালিতে যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তনের গতি সঞ্চার করেছিল। ফলে মানুষ নিঃসংকোচে তাদের নিজস্ব মতামত ও চিন্তাধারা প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এবার তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করতে শুরু করে এবং দেশ-জাতি নির্বিশেষে সমাজের প্রায় প্রতিটি মানুষ তার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে অনুভব করতে শিখে। মধ্যযুগের কুয়াশা কেটে যাওয়ার পর মানুষের নিকট একনতুন জগৎ হাতছানি দেয়, তা হলো মানুষ এক অনাগত পৃথিবীর নতুন সমাজ বাস্তবতায় নিজেকে মেলে ধরবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। পৃথিবী ধীরে ধীরে এমন এক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যায় যেখানে মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টীয় ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় এক নতুন জীবনচেতনা ও পরিমার্জিত মূল্যবোধ। সৃষ্টি হয় এক নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত; যার ফলে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ আরও অবারিত হয়। আর ধর্মীয় স্বাধীনতা

করবে। ১০৭৩ সালে পোপ সপ্তম গ্রেগরি ঘোষণা করেন যে, পোপ শুধু চার্চেরই প্রধান না, জাগতিক বিচারেরও প্রধান। পোপ গ্রেগরি তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার জন্য ইউরোপের সকল রাজদরবারে দূত প্রেরণ করেন। উইলিম দি কঙ্কারার সঙ্গে সঙ্গেই তা মেনে নেন। চতুর্থ হেনরী পোপের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করলে পোপ তাঁকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করেন এবং তাঁকে উৎখাত করার জন্য জার্মান রাজন্যবর্গের প্রতি আহ্বান জানান। চতুর্থ হেনরি ক্ষমা চেয়ে সে যাত্রায় রক্ষা পান। এভাবে সারা ইউরোপ জুড়ে পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পোপই সমস্ত রাজরাজড়াদের নিয়োগ ও অপসারণের অধিকর্তা হয়ে দাঁড়ান। পোপের এ কর্তৃত্বই পোপতন্ত্র বা প্যাপাসি বলে পরিচিত। ১২৭৩ সালে হ্যাপসবার্গের রুডলফ সম্রাট নির্বাচিত হওয়ার প্রথা অনুযায়ী রোমে গিয়ে পোপের হাত থেকে রাজমুকুট পরতে অস্বীকার করেন। এ ঘটনা থেকেই রাজতন্ত্র পোপতন্ত্র থেকে আলাদা হতে শুরু করে এবং শুরু হয় রাজতন্ত্রের সঙ্গে পোপতন্ত্রের দ্বন্দ্বের অধ্যায়। পরবর্তীতে পোপদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটলেও সুদীর্ঘ ২০০ বছর যাবৎ পোপরা তাঁদের দোর্দণ্ড প্রতাপ অব্যাহত রাখেন। [হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. পৃ. ২৪৪]

২ উসমানী, মুফতি মাওলানা তাকী (মাওলানা শামসুল আলম অনূদিত), *ইসলাম ও আধুনিকতা* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৭ খ্রি.) পৃ. ৪৪।

পূর্বের তুলনায় আরও বেশি মুক্তি লাভ করে। কেননা মত প্রকাশের স্বাধীনতার পথে ধর্মের স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইউরোপীয় রেনেসাঁস বিশ্ব সভ্যতাকে যা কিছু ভালো উপহার দিয়েছে এর মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা অন্যতম। রেনেসাঁস উত্তর নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে পুনরায় অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ফলে মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও চিন্তার স্বাধীনতার মিছিলে আরও অগণিত মানুষ একত্রিত হয়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস একদিকে যেমন মানব সভ্যতার বিকাশের রুদ্ধ দ্বারকে উন্মোচন কওে দেয়; অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মের অস্তিত্বকে টিকে থাকার ঝুঁকিতে ফেলে দেয়।পরিবর্তিত নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় গোঁড়া খ্রিষ্ট ধর্মবাদীরা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে কিছুটা এড়িয়ে যেতে পারলেও একে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারছিলনা। প্রতিদিনই ধর্মের উপর টিকে থাকা তাদের জন্য কঠিন হয়ে উঠছিল। আধুনিকায়ন তাদের জন্য একটি অপ্রত্যাশিত বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল, যা নিত্যদিনই তাদেরকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে বাধ্য করতো। এতে করে খ্রিষ্টধর্মের পণ্ডিতেরা তাদের মনগড়া পরিমার্জিত বিকৃত ধর্মীয় ব্যবস্থা ও নীতিমালা সমূহকে নতুন করে পুনর্বিবেচনা ও মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়। তৎকালীন খ্রিষ্টধর্মে আধুনিক যুগচাহিদা ও যুগজিজ্ঞাসার সমাধান দিতে পারে এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার দাবি মোকাবেলা করতে পারে এতোটুকু জীবনীশক্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলনা। এ কারণে বিজ্ঞান খ্রিষ্টধর্মের সামনে এক মহা সংকট হিসেবে অবির্ভূত হয়। এ প্রেক্ষাপটে তাদের গির্জার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে বিজ্ঞান নয় বরঞ্চ তাদের ধর্মের মধ্যেই পুনঃ পরিবর্তন ও পরিমার্জনের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়।[৩]

খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে শুরু হয় সংস্কার আন্দোলন। গির্জার প্রভাব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। ধর্মীয় যাজকদের জন্য ধর্মের বিকৃতিপূর্বক একে কাট-ছাট করে নতুন নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করা ছাড়া আর কোনো পথ অবশিষ্ট রইল না। এই সময়ে খ্রিষ্টধর্মের পণ্ডিতগণ যুক্তি ও বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের ধর্মকে অত্যন্ত অপ্রাকৃতিক ও অগ্রহণযোগ্য ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করে।

৩ উসমানী, মুফতি মাওলানা তাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

রেনেসাঁসের সময়টা ছিল মুসলমানদের পক্ষে এক সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনীকাল। রেনেসাঁস পূর্ববর্তী মধ্যযুগে খ্রিষ্টীয় কয়েদখানায় যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধি বন্দিত্ব বরণ করলেও এই সময়ে ইসলাম কিছুদিনের জন্য সে অন্ধকার মোচন করে যুক্তিকে মুক্ত করে। এর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম রুক্ষ 'আরবভূমি থেকে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তখনও মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা মুক্তচিন্তার চর্চা ছিল। মুক্তচিন্তার অধিকারী আবু রুশদ (১১২৬-১১৯৮) এ সময়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। সে সকল গ্রন্থ পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়; বিশেষ করে মুক্তচিন্তার স্বপ্ন লালনকারী পাঠকদের মধ্যে। আবু রুশদের গ্রন্থগুলো পশ্চিমা দেশগুলিতে যুক্তিবাদের এক শক্তিশালী ঢেউ তুলেছিল। যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার পক্ষে তাঁর জোরালো অবস্থানের কারণে স্পেনের খলিফার দরবার থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়। বহিষ্কার পরবর্তীসময়ে তিনি যখন ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন; সে সময় তাঁর মুক্তচিন্তা-দর্শনে উজ্জীবিত হয়ে সেখানে মুক্তচিন্তাবিদদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠে। ইবন রুশদ[৪] সর্বপ্রথম ইউরোপে যুক্তিবাদের প্রচার শুরু করেন। তিনি এ্যারিস্টটলের[৫] রচনাবলির উপর টীকা-টিপ্পনী লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।[৬]

---

৪ **ইবন রুশদ:** স্পেনের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইবন রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.)। তিনি কর্দোভায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ বংশানুক্রমে ফাকীহ্ বা আইনজীবী হিসেবে কর্দোভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই কর্দোভায় কাযী নিযুক্ত ছিলেন। ইবন রুশদ কর্দোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি পবিত্র কোরআন, হাদিস, ফিক্হ ও 'ইলম-আল-কালামের সংগে চিকিৎসাবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতিতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। ১১৬৯ খ্রি. তিনি সেভিলে এবং এর দুই বৎসর পরে কর্দোভায় কাযী পদে নিযুক্ত হন। কর্দোভায় প্রায় বারো বৎসর বেশ যোগ্যতার সঙ্গে ইবন রুশদ বিচারকার্য নির্বাহ করেন। তিনি ১০ ডিসেম্বর ১১৯৮ খ্রি. বাহাত্তর বৎসর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । ইবন রুশদের লিখিত গ্রন্থসংখ্যা আজও নির্ণীত হয়নি। 'কুল্লিয়াত ফি আল-তিব্ব' ভেষজবিদ্যায় তাঁর প্রধান রচনা। কিন্তু চিকিৎসক ইবন রুশদের চেয়ে দার্শনিক ইবন রুশদের খ্যাতিই অনেক বেশি। এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, ইউরোপীয় দর্শনে মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইবন রুশদ। ইবন রুশদ গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। অ্যারিস্টটল ও প্লোটোর উপর তাঁর লিখিত ভাষ্য আজও সুপ্রসদ্ধি। চিরন্তন সত্তা ও আল্লাহর জ্ঞানের স্বরূপ, তাঁর গায়েবের জ্ঞান, জীবাত্মা ও জ্ঞানের পূর্ণতা, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর দার্শনিক মতামতের জন্য কেউ কেউ তাঁকে নাস্তিক বলে মনে করত। তাঁর মতে কোনো বস্তুই অনস্তিত্ব থেকে একবার মাত্র সৃষ্টি হয়েই চিরস্থায়ী হয় না, বরং প্রতি মুহূর্তেই তা নবতর রূপ পরিগ্রহ করে। এজন্যই পৃথিবী স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তনশীল। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে যে, একটি সৃজনশীল শক্তি দুনিয়ার সঙ্গে থেকে একে স্থায়ী ও গতিশীল রাখছে। মহাশূন্যে তারকাদের আকৃতি ও অবস্থান তাদের গতির ফলেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই গতির উৎস হলো সেই শক্তি, যা আদিকাল থেকে এদের ওপর ক্রিয়াশীল রয়েছে। আল্লাহতত্ত্ব সম্পর্কে ইবন রুশদের মত হলো, "আদি কারণ কেবল নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন"। তিনি স্বীকার করেন যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজ সত্তায় বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান রক্ষা করছেন; কিন্তু তাঁর জ্ঞান সামগ্রিক বা আংশিক কোনোটিই নয়, কেননা তাঁর জ্ঞান মানুষের জ্ঞানের চাইতে উচ্চতর পর্যায়ের জ্ঞান। মানবাত্মা সম্পর্কে তাঁর মত হলো এই যে, প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর পর তা বিশ্ব বা পরমাত্মায় যায়।

এই সময়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ আধুনিকতার আগমনকে অবশ্যম্ভাভী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের আবির্ভাবকে বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। গোটা বিশ্ব যখন যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমুখী ভবিষ্যত নিয়ে প্রতিদিন জীবনকে তাড়া করছিল তখন মুসলিম পণ্ডিতগণ আধুনিক সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনকে ইসলামী নীতি-দর্শন ও পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করার উপায় অনুসন্ধান করতে থাকে এবং এটাকে তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে তাঁরা গ্রহণ করে নেয়। গোটা মুসলিম বিশ্ব জুড়ে তখন চলছিল ইসলাহ্ ও তাজদিদ আন্দোলন। আর মুসলিম পণ্ডিতদের এ আন্দোলনগুলি ছিল বিপ্লব ও উন্নয়নমুখী। দৃষ্টান্তস্বরূপ দামেস্কের আহমাদ ইবন তাইমিয়ার (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) ন্যায় একজন সংস্কারক ইজতিহাদের দুয়ার রুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার বিষয়ে অস্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে সংকোচ প্রকাশের দৃঢ় সাহসিকতা প্রকাশ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মূল শিক্ষাসমূহকে নতুন করে উদ্ভাবন করা এবং ধর্মীয় মতামত সমূহের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ প্রয়োগের প্রেরণায় মানুষকে উজ্জীবিত করা। তাঁর মতে প্রত্যেকের উচিত বিভিন্ন মতবাদকে নিজের প্রচেষ্টায় জেনে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করা। তাছাড়া যে কোনো যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণক ব্যতীত অন্যের কর্তৃত্ব বা মতামতকে গ্রহণ না করা।[৭]

তিনি পরকালে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এ সম্পর্কে বহুল প্রচলিত কাহিনী ও বর্ণনাসমূহকে তিনি অশুদ্ধ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 'ওহি' বা প্রত্যাদেশ দুই প্রকার। যথা: ক. দার্শনিক সত্যমূলক খ. ধর্মীয় সত্যমূলক। ফলে কোরআনের কোনো বক্তব্য যদি সাধারণ অর্থে অগ্রহণীয় হয়, তা বুঝতে হবে যে, তার কোনো নিগূঢ় অর্থ আছে এবং সেটাকে খুঁজে পাওয়াই হবে দার্শনিকের কাজ। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় আবু রুশদ Averroes নামে পরিচিত। [আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৫১; হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪]

৫ এ্যারিস্টটল (Aristotle): এ্যারিস্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত। তিনি গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন। জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের আবদান অতুলনীয়। প্রাচীন গ্রিক দর্শন এ্যারিস্টটলের হাতে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। নিজ শিক্ষা জীবনে এ্যারিস্টটল প্লেটোর শিষ্য ছিলেন। এ্যারিস্টটল খ্রি. পূ. ৩২২ অব্দে মারা যান।'পোয়েটিকস' তাঁর অনন্য সমালোচনা গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি ক্লাসিক্যাল গ্রিক নাটকের প্লট, চরিত্র এবং ভাবনার বিশ্লেষণ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এ্যারিস্টটলের আবদান স্মরণীয়। তিনিই প্রথম দেহের রোগ নিরাময়ের জন্য অস্ত্রোপচার এবং দেহ ব্যবচ্ছেদের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এ্যারিস্টটলের শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে, তাঁর সময় পর্যন্ত বিকশিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রকে তিনি সুসংহত আকারে লিপিবদ্ধকরার চেষ্টা করেন। [করিম, *দর্শনকোষ*, পৃ.৬৫-৬৮; আবদুল হাই,*পরিভাষাকোষ*, ১/পৃ. ৭০-৭২]

৬ মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমান* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১১০।

৭ ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৯ খ্রি.), পৃ.৩১৪।

ইউরোপে বিজ্ঞানের উত্থানে রয়েছে মুসলমানদের বিশেষ অবদান। নতুনকে আবিষ্কারের এক অদম্য চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ গবেষণালব্ধ এমন সব নিত্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন; যা ইউরোপসহ গোটা বিশ্বকে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের পথ ও পদ্ধতি বাতলে দেয়। তৎকালীন মুসলিম পণ্ডিতদের বিজ্ঞান-মনস্ক দিকনির্দেশনা আগামী দিনের বিজ্ঞান ভাবনা এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে নিশ্চিতভাবে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে এগিয়ে নিয়ে যেতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় মধ্যযুগে মুসলমানগণ উল্লেখযোগ্য দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। এ অবদানের উপর ভিত্তি করেই মুসলমানগণ এক সময় বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিয়েছিল। আজকের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক শাখা-প্রশাখা মধ্যযুগের মুসলমানদের গবেষণারই ফসল। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতিতে রয়েছে মুসলমানদের অবদান। যাদের অবদানের কারণে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ইবন সিনা অন্যতম। এই সময়ের চিকিৎসাবিদদের মধ্যে ইবন সিনা[৮] (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) ছিলেন সর্বাধিক খ্যাত। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দর্শনে তিনি এমন কিছু অমর গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলি ইউরোপসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও ভাষাতত্ত্ব, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র, চিকিৎসা প্রণালি এবং শল্যচিকিৎসার আলোকবর্তিকা

---

৮ ইবন সীনা (Ibn-Sina): মধ্য এশিয়ার বুখারার আবু 'আলী ইবন সীনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) ইউরোপে দার্শনিক আভিসেনা নামে পরিচিত। দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী ইবন সীনার জীবন ছিল বিপুল জ্ঞানরাশিতে সমৃদ্ধ এবং ঘটনায় বিচিত্র। অতি অল্প বয়সে তাঁর বুদ্ধির আশ্চর্য দীপ্তি প্রকাশ পায়। দশ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কোরআনের হাফিজ এবং ষোলো বছরে চিকিৎসার একটি নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারক হিসেবে সকলের বিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'আরব সভ্যতায় প্রাচীন গ্রিসের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনকে সংযোজিত করে 'আরব সভ্যতার মাধ্যমে ইউরোপে সেই অমর জ্ঞানসম্ভারকে পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে ইবন সীনার অবদান অতুলনীয়। ইবন সীনা ইউক্লিডের জ্যামিতিকে 'আরবি ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন এবং এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার নতুনত্বের বিকাশ সাধন করেন। ইবন সীনার অবদানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো চিকিৎসা তত্ত্বে অমিশ্র বা সহজতর ঔষধাদি, রোগের সাধারণ প্রকার, রোগের নিরাময় ব্যবস্থা এবং মিশ্র ঔষধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর পাঁচ খণ্ডে রচিত 'কানুন' এ ইবন সীনা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব এরূপভাবে পেশ করেন যে, তাঁর এ গ্রন্থ চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরু হিসেবে পরিচিত হয় এবং গ্যালেনের গ্রন্থসমূহকে অতিক্রম করে যায়।উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থটি পাঁচ শতাধিক বছর ধরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। [আবদুল হাই,*পরিভাষাকোষ*, ১/৩২৯-৩৩১; করিম, *দর্শনকোষ*,পৃ. ২৪৫-২৪৬; আমিনুল ইসলাম, *ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, পৃ. ১৫৭-১৬৯]

মনে করা হয়। তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের অমর গ্রন্থ 'আল-কানুন ফি আল-তিব'। এটি একটি মেডিক্যাল বিশ্বকোষ; কোনো কোনো অমুসলিম পণ্ডিত একে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাইবেল হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। বারো শতকে গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। গ্রন্থটি পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইউরোপের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি প্রামাণিক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং পাঁচ শতক ধরে তা পাশ্চাত্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রধান পথ নির্দেশক গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা রাখে।[৯] এ সময়ে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় রসায়নশাস্ত্রেও মুসলমানদের অবদান ছিল প্রশংসনীয়। রসায়নশাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবন হাইয়ান (৭২২-৮১৫ খ্রি.), আল-কিন্দি (৮০১-৮৭৪ খ্রি.), জুননুন মিসরি (৭৯৬-৮৫৯ খ্রি.) এবং ইবন আব্দুল মালিক আল-কামি বিশেষ অবদান রাখেন। এ সকল মুসলিম বিজ্ঞানীর হাত ধরেই রসায়ন শাস্ত্র আজ উন্নতির উচ্চশিখরে সমাসীন। জাবির ইবন হাইয়ান কুফা নগরীতে একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রসায়নকে বিজ্ঞানের একটি পরিপূর্ণ শাখা হিসেবে উপস্থাপন করেন। এ জন্য তাঁকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয়। একইভাবে বিজ্ঞানের মূল শাখা গণিতেও মুসলমানদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আল-খাওয়ারেযমি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.), ইবন হায়সাম (৯৬৫-১০৪৪ খ্রি.), উমর খৈয়াম (১০৪৮-১১২২ খ্রি.) ও নাসির উদ্দিন তুসিসহ আরও অনেক মুসলিম মনীষী গণিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মুহাম্মদ ইবন মুসা আল-খাওয়ারেযমি ছিলেন গণিতশাস্ত্রের সর্বাধিক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তিনি বীজগণিতের আবিষ্কারক। তাঁর রচিত 'হিসাব আল-জাবর ওয়া আল-মুকাবালাহ্' গ্রন্থের নামানুসারেই ইউরোপীয়রা বীজগণিত শাস্ত্রকে আল-জেবরা নামকরণ করে। এজন্য তাঁকে গণিত শাস্ত্রের জনক বলা হয়। এই সময়ে র আরও একজন খ্যাতিমান মুসলিম বিজ্ঞানী হলেন হাসান ইবন হায়সাম (৯৬৫-১০৪৪ খ্রি.); যিনি মধ্যযুগে আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা প্রদান করেন। 'কিতাব আল-মানামি' নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সময়ে এটিই ছিল

৯ ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কিত একমাত্র গ্রন্থ। আধুনিককালের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করলেও মুসলিম বিজ্ঞানী ইবন হায়সামই এ বিষয়ের পথপ্রদর্শক।

মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতি,জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রভাব স্পেন ছাপিয়ে ক্রমেক্রমে পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে; এভাবে গোটা ইউরোপ মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা কল্যাণ লাভ করে। যদিও সিসিলি ও স্পেন ছিল মুসলমানদের জ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল। 'আরব মুসলমানগণ কয়েক শতাব্দী অবধি স্পেন শাসন করেন। তাঁরা সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যম হিসেবে 'আরবি ভাষাকেই বেছে নেন। চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের নানা শাখায় তারা 'আরবি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন। যদিও পরবর্তীকালে মুসলমানদের উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারিভাষিক ভাষাতে ইউরোপীয় ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটানোর নিষ্ফল চেষ্টা করা হয়েছিল; চূড়ান্তভাবে সে চেষ্টা ততটা সফল হয়নি।

আজকের বিশ্বে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি যেমন শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাদান ও পঠন-পাঠনের অন্যতম প্রভাবশালী ভাষা মাধ্যম; একইভাবে তখনকার দিনে 'আরবি ভাষাই ছিল সমগ্র বিশ্বে বিদ্যা শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এই সময়ে খোদ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়গুলিতে 'আরবি ভাষাতে পাঠ দান শুরু হয়। বিশেষত টলেডো, নারবোন, নেপলস, বোলোনা ও প্যারিসসহ বিভিন্ন শহরে যে সকল বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'আরবিকে শিক্ষার ভাষা মাধ্যম হিসেবে সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল।[১০] কেবল মধ্যযুগ কেন? সকল যুগেই নতুন কোনো সৃষ্টিশীল বিষয়, নতুন উদ্ভাবন কিংবা নতুন আবিষ্কারকে ইসলাম সর্বদা স্বাগত জানিয়েছে। কেননা ইসলাম এমন কোনো সেকেলে অচল কিংবা অকার্যকর ধর্ম নয় যেটি আসন্ন ভবিষ্যতের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেনা; আর না হয় উদ্ভাবিত বিষয়কে অস্বীকার করবে। বরঞ্চ এটি এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যার পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনে

১০ মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩৩।

কোনো কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।[১১]

ইসলাম ধর্মের বিষয়গুলো অন্য সকল ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। এটা প্রকৃতির ধর্ম এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকার জন্যই এর আবির্ভাব। এর মৌলিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসমূহ প্রত্যেক যুগের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। তাই বিজ্ঞান ইসলামের জন্য কখনও কোনো শঙ্কার কারণ হয়নি কিংবা হবেওনা। বরং আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি যে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন কিংবা আবিষ্কার ইসলামের প্রতি সকলের বিশ্বাস ও আস্থার জায়গাটিকে আরও সুদৃঢ় ও গভীর করে তুলছে। ফলে ইসলামের শিক্ষা আরও বেশি পরিশীলিত, পরিচ্ছন্ন ও দ্বিধামুক্ত হয়ে মানুষের নিকট প্রকাশিত হচ্ছে। তাই বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধে জড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়না এবং এ ধর্মে কোনো পরিবর্তন বা পরিমার্জন আনয়নের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়না। এ জন্যই ইসলামের পণ্ডিতগণকে পাদ্রীদের ন্যায় বিজ্ঞানের সাথে কোনো বিরোধপূর্ণ সম্পর্কে জড়াতে হয়নি। এর কারণ হচ্ছে ইসলামী পণ্ডিতগণ এ বিষয়টি খুব ভাল করেই জানেন যে, মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের উদ্ভাবন যতো বেশি উন্মোচিত ও বিকশিত হবে ইসলাম নির্দেশিত দর্শন ও নীতি ততোই প্রস্ফুটিত ও পরিস্ফুট হবে। তাছাড়া ইসলাম এমন কোনো নির্জীব কিংবা নিষ্প্রাণ জীবনব্যবস্থা নয় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে তা হুমকির মুখে কিংবা কোনো অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।[১২]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে মুসলমানদের বিচরণ নেই।মানব উন্নয়ন ও বিশ্বসভ্যতার বিকাশে সকল শাখাতেই রয়েছে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নয়শত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরাকের বাগদাদ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাদভূমি। ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদের পতন অবধি এটি ছিল বিশ্বসভ্যতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। অষ্টম ও নবম শতকে কনস্টান্টিনোপল যখন ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচনায়

---

১১ *আল-কোরআন*, ৬: ৩৮ ।

১২ উসমানী, মুফতি মাওলানা তাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭।

সচেষ্ট, বাগদাদ তখন গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রভূমি হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করে। বাগদাদ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চারণভূমি ও বিখ্যাত শহরে পরিণত হলো, তখন চিকিৎসক ও পণ্ডিতগণ গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য,বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়ন এবং'আরবিতে অনুবাদের জন্য বাগদাদে ভিড় জমাতেন। সেখানে তাঁরা দিনের পর দিনঅবস্থান করতেন। আর এ অনুবাদকর্ম উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌছে আব্বসী খলিফা আল-মামুনের সময়। তিনি ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে 'হাউস অব উইসডম' (বাইত আল-হিকমাহ্) প্রতিষ্ঠা করেন; যেটি একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, একাডেমি ও অনুবাদ কেন্দ্র হিসেবে বিদ্বানদের নিকট পরিচিতি লাভ করে।[১৩]

বিশ্ব সভ্যতার জন্য অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, ত্রয়োদশ শতকে গোবি মরুভূমি থেকে আত্মপ্রকাশিত দুর্ধর্ষ মঙ্গোলীয় নেতা চেঙ্গিস খান ও তার দুর্বৃত্তদল এশিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা চালায়। এতে করে মুসলমানরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কেননা মঙ্গোলীয় এ তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলা বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশকে পশ্চাতে ঠেলে দেয়। বিশেষ করে বহুযুগ ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন ও আবিষ্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনাবলি নিমিষেই হারিয়ে যায়। এ সময় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, গবেষণাগার ও পাঠাগারসহ বহু জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। মঙ্গোলীয় এ দুর্বৃত্তরা শত শত শিক্ষার্থী ও পণ্ডিতদের নির্বিচারে হত্যা করে। জ্ঞানচর্চাকেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ এবং জ্ঞানী-পণ্ডিতদের অকাল প্রয়াণে পৃথিবী যেন এক বধ্যভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, মুক্তবুদ্ধি চর্চা এবংস্বাধীন মতামত প্রকাশের বিষয়গুলোতে এক ধরণের বন্ধ্যত্ব নেমে আসে। এ পরিণতি বিশ্ব সভ্যতার উৎকর্ষতার ইতিহাসে মুসলমানদেরকে এমনভাবে পিছিয়ে দেয় যে, বিংশ শতক অবধি হৃত গৌরব অর্জনের জন্য তাদের অগ্রগতি ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার আর কোনো দ্বিতীয় সুযোগ হয়ে উঠেনি।

---

১৩ Gates, Jean Key. *Introduction to Librarianship* (University of California: McGraw-Hill,1976), p.29

ঐতিহাসিকদের অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন যে, হিজরি দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উদার মনোভাব প্রকাশ করে। এ সময় মুসলিম পণ্ডিতগণ গ্রিক দর্শন অধ্যয়ন শুরু করেন এবং তাঁরা 'আরবি ভাষাতে এর কিছু অনুবাদকর্মও শুরু করেন। মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন কোনোকোনোউদার মুসলিম পণ্ডিতগণ সে সময় থেকেই গ্রিক দর্শন ও সংস্কৃতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হতে থাকেন। গ্রিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার অনুসারী তৎকালীন সে সকল মুসলিম পণ্ডিতকেই পরবর্তীকালে ইহিহাসে মু'তাজিলা[১৪] হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।[১৫] আব্বাসী খলিফা মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হাউস অব উইসডম' বা 'বাইত আল-হিকমাহ্' বিশ্বসভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সে সময়'বাইত আল-হিকমাহ্' এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলি 'আরবিতে অনুবাদ করা হয়।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, খলিফা আল-মামুন যদি এ্যারিস্টটল, প্লেটো, ইউক্লিড ও টলেমীসহ প্রমুখ গ্রিক পণ্ডিতদের গ্রন্থাবলি অনুবাদ না করতেন এবং সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যদি এগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করতেন; তাহলে ইউরোপীয় রেনেঁসা কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবজাগরণ আদৌ সফলতার মুখ দেখতে পারতো কিনা? এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় ও

---

১৪ **মু'তাজিলা:** ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতার পথিকৃৎ ছিল মু'তাজিলারা। হাসান আল-বসরির শিষ্য ওয়াসিল বিন আতা ছিলেন এ মদবাদের উদগাতা। প্রায় সকল মুসলমানই আল্লাহর যে ৯৯টি গুনে বিশ্বাস করেন; মু'তাজিলারা বলে যে, এটা আল্লাহর একত্ব এবং শাশ্বত্বের বিরোধী। সুতারাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। মু'তাজিলারা কোরআনের সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ছিল বদ্ধপরিকর। তাদের মতে আল্লাহ স্বেচ্ছাচারী নন; সুতরাং পাপ-পুণ্যের দায়দায়িত্ব ব্যক্তির নিজস্ব। তারা বলে যে, আল্লাহর যেহেতু শরীর বা আকৃতি নেই, সেহেতু আল্লাহকে কখনোই দেখা যাবে না; "পূণ্যবানরা বেহেস্তে আল্লাহর দর্শন লাভ করবে" কোরআনের এ বাক্যের তাৎপর্য হলো পুণ্যবানরা আধ্যাত্মিকভাবেই আল্লাহর দর্শনলাভ করবে, ইন্দ্রিয়গতভাবে নয়। মু'তাজিলাদের মতে, আল্লাহ কোনো অন্যায় করতে পারেন না; তাই আমাদের দুর্ভোগের জন্যও মহান ও দয়াবান আল্লাহ দায়ী হতে পারেন না। মু'তাজিলারা কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অ্যারিস্টোটলীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে বলে যে, বিশ্ব একাধারে সৃষ্ট এবং শাশ্বত। অনন্তকাল ধরে বিশ্ব স্থির ছিল এবং আল্লাহ্ একে গতি দেয়ার ফলেই দেহ এবং প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। এ কথা সত্যি নয়। কারণ এ চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটেছে মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের সংস্পর্শে আসার অনেক আগে। যেমন: হযরত আয়েশা (রা.)-ও বিশ্বাস করতেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আসমানে আরোহণ বা মিরাজ কোনো সশরীরে আরোহণের ব্যাপার ছিল না; এটা ছিল নিতান্তই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.), ইবনে মাসুদ (রা.) প্রমুখও এ ধরনের চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। মু'তাজিলাদের স্বর্ণযুগ ছিল খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকাল, কারণ তিনি এ মতবাদকে রাষ্ট্রীয় মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মামুনের পরবর্তী খলিফারা বিশেষত মুতাওয়াক্কিল ও আল কাদির মু'তাজিলাদের প্রতি ছিলেন ভীষণভাবে বিরূপ। তাই মামুনের মৃত্যুর পরই শুরু হয় মু'তাজিলাদের অবক্ষয়ের কাল। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৫।]

১৫ মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *প্রাগুক্ত*, ২০০৮, পৃ. ৬১।

অনিশ্চয়তার অবকাশ রয়েছে।তাই মুসলমানদেরকে ইউরোপীয় রেনেঁসার জন্মদাতা বললেও অত্যুক্তি হবেনা।[১৬] মধ্যযুগে মুসলমানদের এ প্রগতি ও অগ্রগতির পরপরই সূচিত হয় পতনযুগ (১২৫০-১৮৫০ খ্রি.)। এ সময়কালটিতেই সূচিত হয় পশ্চিম এশিয়ায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উত্থান। ইতোমধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'আরবি থেকে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়।[১৭] তৎকালীন মুসলমানদের পশ্চাদপদতার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো; তাদের জীবনাচার ছিল কুসংস্কার দ্বারা পদে পদে বাধাগ্রস্ত। আর মুসলমানদের কেউ কেউ এমন তাত্ত্বিক জীবন-দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যে; স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানচর্চা থেকে তাঁরা বহুদূরে সরে পড়ে। অবশেষে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের পথে সূচিত হয় এক দুর্বিষহ অবনমন। অথচ একটা সময় ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন ও গণিতশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীগণ বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। ফলে মুসলিমগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের এ অবদানের কথা মানব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

---

১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

১৭ ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পদভূমি বাগদাদ[১৮] ধ্বংস হওয়ার পরপরই ইমাম ইবন তাইমিয়ার[১৯] আবির্ভাব হয়। সেই সময়ে তিনিই সর্বপ্রথম ইজতিহাদের উৎপত্তির মূলে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ তথাকথিত বিদ'আতের[২০] মুখোমুখি হন এবং এর মূলোচ্ছেদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সবচেয়ে বড়

---

১৮ **বাগদাদ:** বাগদাদ দিজলা (টাইগ্রিস) নদীর তীরে অবস্থিত। খ্রিষ্টীয় ৮ম শতকে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠার পর হতে 'আব্বাসী খিলাফতের পতন পর্যন্ত এ নগরী ছিল বহু বিষয়েরপ্রধান কেন্দ্র এবং দীর্ঘ শতাব্দী পর্যন্ত এটাই ছিল মুসলিম দুনিয়ার তামাদ্দুনিক রাজধানী। ১২৫৮ খ্রি. এর পর বাগদাদ প্রাদেশিক রাজধানী এবং 'উসমানী শাসনামলে এটি বিলায়াতের কেন্দ্র হয়ে উঠে।১৯২১ খ্রি. এটি আধুনিক ইরাকের রাজধানী হয়। বাগদাদ শহরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ছিল অগণিত মসজিদ আর হাম্মাম বা গোসলখানা। বাগদাদ ছিল তামাদ্দুনিক কর্মকাণ্ড ও এর বিকাশের এক বড় কেন্দ্র। হানাফি ও হাম্বালি মাযহাবের বড় কেন্দ্র ছিল এখানে। এখানেই ছিল গ্রিক, সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র। তাছাড়া এখানে বায়ত আল-হিকমাহ্সহ বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত চর্চা ও গবেষণা হতো। এখানকার মসজিদগুলি, বিশেষ করে আল-মানসুর এর জামি' ছিল বিশাল এক জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র। বিরাট সংখ্যক কুতুবখানা বা বইয়ের দোকান হতে তামাদ্দুনিক ক্রিয়া-কাণ্ডের ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ বইয়ের দোকানগুলিতে মাঝে মাঝে সাহিত্যচর্চাও হতো। এখানে কবি, ঐতিহাসিক আর বিদ্বান ব্যক্তির সংখ্যা যে কতো ছিল তার উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না। বাগদাদে পাঁচটি ঐতিহাসিক যাদুঘর এবং একটি প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘর আছে। এখানকার সুপ্রাচীন আরব ঐতিহ্যের যাদুঘর (Museum of Arab Antiquity)বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [*ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ১৯৮৮খ্রি., ১৫শ খণ্ড, পৃ.৩৬২-৩৭০,৩৮১-৩৮৭।]

১৯ **ইবন তাইমিয়া:** একজন 'আরব দেশীয় দ্বীনি 'আলিম এবং ফাকীহ্ ছিলেন। তিনি দামিশ্ক এর নিকটবর্তী হাররান শহরে সোমবার ১০ রাবীউ'ল-আওওয়াল, ৬৬১ হি./২৩ জানুয়ারী, ১২৬৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশে সাত-আট পুরুষ হতে শিক্ষা-দীক্ষার ধারা চলে আসছিল এবং সকল লোক জ্ঞান ও সাধনায় উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ইমাম যাহাবী লিখেছেন যে, ইবন তাইমিয়া (র.) পরিণত বয়সের পূর্বেই পবিত্র কোরআন, ফিক্হ, মুনাজারা এবং ফাতওয়া দানে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন এবং শীর্ষ স্থানীয় 'আলিমদের মধ্যে গণ্য হয়েছিলেন। তাঁর স্বাধীন মতামতের দরুন অন্যান্য দৃঢ় 'আক্বীদা সম্পন্ন মাযহাবসমূহের বহু 'আলিম তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর বয়স তিরিশ বৎসর পূর্ণ না হতেই তাঁকে তৎকালীন সরকার প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ২০ যুল-কাদা,৭২৮ হি./২৬-২৭ সেপ্টেম্বর, ১৩২৮ খ্রি. তিনি ইনতিকাল করেন। ইবন তাইমিয়া (র.) ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (র.) এর অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর অন্ধ অনুসরণ করতেন না। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থে তিনি পবিত্র কোরআন ও হাদিসের হুকুমসমূহের শাব্দিক অনুসরণ করেন; তবে বিতর্কিত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কিয়াস এর প্রয়োগ অবৈধ মনে করেননি। তিনি বিদ'আতের ঘোর শত্রু ছিলেন। ইবন তাইমিয়া প্রায় পাঁচশত গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। [*ইসলামী বিশ্বকোষ*,প্রাগুক্ত,১৯৮৬খ্রি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১-৫।]

২০ **বিদ'আ:** আভিধানিক অর্থে যে কোনো নূতন বিষয়কে বিদ'আ বলা হয়। এটি 'আরবি শব্দ البدع হতে উদগত। লিসান আল-'আরাব অভিধান গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে البدع (আল-বুদ'উ) শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিনব বিষয়। আল-বিদ'আ এরূপ কোনো নূতন বিষয় বা নূতন 'আক্বীদা বা নূতন কার্য বা নূতন প্রথা, যার সমর্থনে কোরআন-সুন্নায় কোনো রূপ দলিল-প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও এটাকে দীন এবং শারী'য়াতে আমদানি করা হয়েছে। بدعة শব্দটি محدثة শব্দটির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে সংকীর্ণতার অর্থে দীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কোরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী কোনো নূতন 'আক্বীদা অথবা 'আমলকে এর মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেয়ার নাম বিদ'আ। বিদ'আ শব্দটি 'মুহ্দাছা' শব্দের সমার্থক। এতে

কীর্তি ছিল তিনি তার পূর্ববর্তী চারটি প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের প্রদর্শিত নীতিকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ইজতিহাদের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে এর দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে দৃঢ়মত পোষণ করেন। এর ফলে মুসলিম মানস ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পুনর্বার স্বাধীনভাবে চিন্তা ও গবেষণা করার সুযোগ লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় উনবিংশ শতাব্দীতে মিশরে মুহাম্মদ আবদুহ্ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কেননা মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এটা পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইজতিহাদের দরজা খোলা থাকলে ইসলামের মহান বিধানগুলোর ভিত্তিতে এবং ইজতিহাদের আলোকে যুগে যুগে মানব জীবনে উদ্ভূত সমস্যাসমূহের শারীয়াহ্[২১] সম্মত যুগোপযোগী সমাধান দেয়া যাবে। তাছাড়া মানুষের চিন্তা হচ্ছে বাস্তবমুখী। ইসলাম শুরু থেকেই বাস্তবতা, যৌক্তিকতা ও আধুনিকতাকে উৎসাহ দিয়ে আসছে। ইসলাম বাস্তবতা ও সমসাময়িক আধুনিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছে বলেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হতে সুদীর্ঘ তেইশ বছর সময় লেগেছে। তাই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সমকালীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনে প্রয়াস চালান। ইজতিহাদের মাধ্যমে চিন্তাধারার নতুন নতুন পথ যখন খুলে যাবে, তখন চার মাযহাবের ইমামরা ইতোপূর্বে ধর্মীয় যে সকল সমাধান দিয়েছেন তার থেকে ভিন্ন; কিংবা তার চেয়ে অধিকতর যুক্তিসহ শারীয়াহ্ সম্মত সমাধান বা মতামত উদ্ভাবিত হওয়া মোটেও কোনো বিচিত্র বিষয় নয়। আর ইসলামের সিদ্ধান্ত ও মতামতসমূহ যুক্তির দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার যে চেষ্টা ও সাধনা তা কোনো নতুন বিষয় নয়; তা শুরু হয়েছিল স্বয়ং রাসূল (সা.) এর সময় থেকেই। তাঁর সাথে তাঁর সাহাবীগণও ইসলামী চিন্তাধারা, সিদ্ধান্ত ও ভাবধারাসমূহ সুসামঞ্জস্য ও সুসংহত করতে একাগ্রভাবে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন।

বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিতে এরূপ কোনো বিষয় লোকদের মধ্যে প্রচলিত করে, যার ভিত্তি ইসলামের সর্বসম্মত উৎসসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে ব্যক্তি মুব্তাদি' বা বিদ'আতি। [*ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ১৯৮৮ খ্রি., ১৬শ খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ. ২২২।]

২১ **শারী'য়াহ্ :** শারী'য়াহ্ শব্দের অর্থ হলো পানি পান করার ঘাট, চলার পথ ইত্যাদি। শারী'য়াহ্ বলতে সেসব পথ-নির্দেশকে বুঝায়, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি জারি করেছেন। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জীবন যাপন করার পথ-নির্দেশকেই শারী'য়াহ্ বলা হয়। [ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৭৩৩-৭৩৪।]

মিশরে ঔপনিবেশিক শাসনামলে মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের করুণ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মর্মাহত হন। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ঘূণেধরা জীর্ণ-শীর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে আদর্শিক ছাঁচে পুনর্গঠনের জন্য একজন মহান সংস্কারক হিসেবে তিনি মুসলিম জাতির নিকট আবির্ভূত হন। ইসলামী চিন্তাধারার পুনর্গঠনে যখন বন্ধ্যাত্ব ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, চারিদিকে যখন শুধু হতাশা আর নৈরাজ্য; ঠিক সেই সময়ই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ একজন আলোকবর্তিকা হিসেবে মহান সংস্কারকের ভূমিকায় জাতির সামনে অবতীর্ণ হন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনি শুধু যে ইমাম গায্যালী[২২], ইবন রুশদ[২৩] ও ইমাম ইবন তাইমিয়ার[২৪] দর্শন ও চিন্তাধারাকেই পুনর্জাগরিত করেছে তা নয়; বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখিত মহাপুরুষদের চিন্তাধারাকেও আরো শাণিত করেছে। তাঁর চিন্তাধারা ছিল মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাধারার স্ফূরণের সহায়ক। তাই মিশরের জাতীয় কবি হাফিজ ইব্রাহীম[২৫] বলেন,

---

২২ ইমাম আল-গায্যালী: আল-গায্যালী ৪৫০ হি./১০৫৮ খ্রি. খোরাসানের অন্তর্গত তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু হামিদ মোহাম্মদ ইবনে-তাউস-আহাম্মদ আল-তুসী আল-শাফী আল-নিশাপুরী। পণ্ডিতদের মতে তাঁর নিস্বা বা উপাধি জন্মপল্লী গাযালা থেকে গৃহীত। ১০৭৭ বা ১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিশাপুরের বিখ্যাত নিযামীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং প্রধান 'আলেম 'আবদুল মা'আলী ইমাম আল-হারামায়েনের নিকট ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। গায্যালীর চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষা ও জ্ঞান-সাধনার মৌলিক ও সর্বপ্রধান ভিত্তি হিসেবে নীতিশিক্ষার (Morality) দিকে আকর্ষণ করা। তিনি বেশ উপলব্ধি করেছিলেন যে, তদানীন্তন মুসলিম সমাজ পার্থিব জ্ঞান ও সম্পদ অর্জনে যেরূপ অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছে, তার সংগে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সংযোগ না হলে পতন অবশ্যম্ভাবী। তাঁর প্রভাবেই সূফীবাদ ইজমার স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাঁর শিক্ষার মহিমায় ইসলাম লোকধর্মরূপে নতুন উদ্দীপনা লাভ করে। গায্যালীর শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে احياء علوم الدين বা ধর্মের নবরূপায়ন। সূফীরা 'ইহইয়া'কে দ্বিতীয় কোআনের মর্যাদা দান করেন। [আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ খ্রি.), ৪র্থ সং., পৃ. ১১৯-১২৫।]

২৩ *প্রাগুক্ত*, আবদুল মওদুদ, পৃ. ১৪৩-১৫১; হারুনুর রশীদ, পৃ. ৮৪।

২৪ প্রাগুক্ত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৯৮৬ খ্রি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১-৫।

২৫ কবি হাফিজ মুহাম্মদ বেগ ইব্রাহিম (১৮৭২-১৯৩২)। তিনি আধুনিক আরবি কাব্যের পঞ্চস্তম্ভের (বারুদী, সাবরী, শাওকী, হাফিজ ও মুতরান) অন্যতম একজন। তিনি ছিলেন আধুনিক মিশরের একজন দেশ-প্রেমিক, স্বাধীনচেতা ও স্বভাবকবি। তাঁর কবিতায় তিনি মিশরের গণ-মানুষকে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন দেখাতেন। এজন্য তাঁকে মিশরের জাতীয় কবিও বলা হয়। তবে তিনি শা'ইর আল-নীল (নীলনদের কবি) হিসেবেও সমধিক পরিচিত। তিনি নীল পৃষ্ঠে (অর্থ্যাৎ নীল নদের ভাসমান নৌকায়) জন্ম গ্রহণ করেন, তাই তিনি পরবর্তীতে শা'ইর আল-নীল বা 'নীল

لقد كنتَ فيهم كوكبا في غَياهِب ** ومَعرِفة في أنفُس نَكِرات

অর্থ: তাঁদের মাঝে তুমি ছিলে অনেক অন্ধকারের মাঝে একটি তারকা (সদৃশ) এবং অজ্ঞাত ব্যক্তিবর্গের মাঝে এক পরিচিত ব্যক্তিত্ব।[২৬]

ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর মৌলিক অবদান হচ্ছে, মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাব বা অনুসরণীয় ইমামগণের অনুসারীদের মধ্যে সীমাহীন মতবিরোধের প্রাচীর অপসারণের প্রচেষ্টা। তিনি ফিকহ্ এর ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন। মাযহাবি বিরোধ দূর করে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে তিনি ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং মুসলমানদের নিকট ঐক্যের পথ ও পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। তাই তিনি কোনো বিশেষ মাযহাবের পক্ষাবলম্বন করেনি; আবার বিরোধিতাও করেনি। সকল মাযহাবের প্রতিই যথাযথ সম্মান রেখে তিনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথে অগ্রসর হন। যদিও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ জীবনের শুরুর দিকে মালিকিয়্যা[২৭] ফিক্হ এর অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুফতি পদ গ্রহণের পর তিনি হানাফি ফিক্হ অনুযায়ী ফাতওয়া দিতেন। তাঁর মতে, প্রয়োজনের তাগিদে চারটি মাযহাবের মুজতাহিদ

নদের কবি' হিসেবে সুখ্যাত হন। [আমীন, ড. আহমদ, *মুকাদ্দামাতু দিওয়ানি হাফিজ ইব্রাহীম* (বৈরুত: ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৬।]

২৬ হাফিজ ইব্রাহীম, *দিওয়ানু হাফিজ ইব্রাহীম* (কায়রো:দার আল-কুতুবআল-মিসরিয়্যাহ্, ১৯৩৭ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭।

২৭ **মালিকিয়্যা:** আহল আল-সুন্নাহ্ ওয়া আল-জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ইমাম মালিক ইবন আনাস আল-আসহাবী (র.) এর অনুসারীগণ মালিকি মাযহাবের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। কুফার ফিক্হ অধ্যয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে যেভাবে ইমাম আবু হানিফা (র.) এর ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হওয়া যায়, অনুরূপভাবে মদিনার শিক্ষায়তনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমাম মালিক (র.)। ইমাম মালিক (র.) 'উমার ইবন আল- খাত্তাব (রা.), আয়েশা (রা.), ইবন 'আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণের 'ইলম দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। তিনি রাবী'আ ইবন 'আবদ আল-রাহমান এর নিকট ফিক্হ এবং ইবন 'উমার (রা.) এর মুক্ত দাস নাফে', ইমাম যুহরী, আবু আল-যিনাদ আবদুল্লাহ্ ইবন যাকওয়ান ও ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী এর নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম মালিক (র.) এর উসতাদগণের মধ্যে আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ ও তাবি'ঈ-তাবি'ঈন এর নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ ও স্মারকলিপিতে যদিও ইমাম মালিক (র.) এর কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর মৌলিক ও জগদ্বিখ্যাত সংকলন হলো আল-মুওয়াত্তা। মালিকি ফিক্হ এর সংকলনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে দু'টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ অত্যাবশ্যক তা হলো: (১) আল-মুওয়াত্তা ও (২) আল-মুদাওওয়ানাত আল-কুবরা। এ দু'টি কিতাব মালিকি ফিক্হের ভিত্তিস্বরূপ এবং তা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ। ইমাম মালিক (র.) একাধারে যুক্তিবাদী ফাকীহ্ এবং মুহাদ্দিস ফাকীহ্ ছিলেন। প্রাথমিক যুগের 'আলিমগণ তাঁকে যুক্তিবাদী ফাকীহ্গণের অন্তর্ভুক্ত করেন। [শাহ এমরান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩৪-৬৩৫।]

ইমামগণের ফাতওয়া ও মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।[২৮] এভাবে তিনি মুসলমানদেরকে মাযহাবি বিরোধ নিষ্পত্তির পথ ও পদ্ধতি নির্দেশপূর্বক ইজতিহাদের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। কেননা প্রত্যেক যুগেই নতুন নতুন অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এর সমাধানকল্পে ইজতিহাদের বিকল্প নেই। তাই মুহাম্মদ 'আবদুহ মনে করেন মুসলিম জাতির ইজতিহাদের প্রাণশক্তির ক্ষীয়মাণতা এবং অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা দূরীকরণে ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। যুগ-জিজ্ঞাসার ধর্মীয় সমাধানকল্পে তিনি ইজতিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়োপযোগী ফাতওয়াও প্রদান করেন। এজন্য মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর ইন্তিকালে কবি হাফিজ ইব্রাহীম তাঁর সম্পর্কে বলেন,

وياويح للفُتيَا إذا قيل من لها؟ ** وياويح للخيرات والصدَقات

অর্থ: আফসোস ফাতওয়ার জন্য, যখন বলা হয়, "কে আছে ফাতওয়া দেয়ার?" তদ্রূপ মহৎ কাজসমূহ ও দান-দক্ষিণার জন্যও বড় আফসোস।

بكى عالَم الإسلام عالِم عصره ** سراج الدَياجي هادم الشبُهات

অর্থ: ইসলামী জগৎ তার যুগের পণ্ডিত, অন্ধকারের প্রদীপ ও সংশয়ের মূলোৎপাটনকারীর শোকে কাঁদল।[২৯]

২৮ আহমাদ আমিন, *য়ু'আমাউ আল-ইসলাহ্ফি 'আসর আল-হাদিস*(বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-'আরাবি, ১৯৪৮খ্রি.), পৃ. ৩২৯।

২৯ হাফিজ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
তাকলিদ সম্পর্কে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর চিন্তাধারা

মধ্যযুগে ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় থেকে অদ্যাবধি মানুষের চিন্তা, মনন ও অভিজ্ঞতায় সাধিত হয়েছে বিশেষ উন্নতি ও অগ্রগতি। সময়ের আবর্তনে পুনর্গঠিত হয়েছে নতুন নতুন চিন্তাধারা; উদ্ভব হয়েছে নতুন মতবাদের। আর পুরোনো সমস্যাগুলো নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে সমাধান পেয়েছে পৌনঃপুনিকভাবে। ফলে মানবজাতি ইসলামের প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়েছে এবং ধর্মে-কর্মে তাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক চিন্তাধারার উৎকর্ষের সাথে সাথে আমাদের বোধ ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধীয় ধারণায়ও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গত পাঁচশত বছর ধরে ইসলামে ধর্মীয় চিন্তা একরূপ গতিহীন হয়ে আছে। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন ইউরোপীয় চিন্তাধারা প্রেরণা পেয়েছিল মুসলিম জাহান থেকে।[৩০] বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানদের মধ্যে যখন স্বাধীন মুক্তবুদ্ধি চর্চা স্থবির হয়ে পড়ে এবং ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনে মতামত প্রকাশে তাদের মধ্যে চরম সংকোচবোধ, দ্বিধা ও শঙ্কার সৃষ্টি হয়; তখন মুহাম্মদ 'আবদুহ একজন ধর্মীয় সংস্কারকের ভূমিকায় আবির্ভূত হন। তিনি সবসময়ই চিন্তা করতেন যে, ইসলামের পুনর্জাগরণের সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকাসহ গোটা আধুনিক বিশ্ব কোনো প্রক্রিয়ায় অগ্রসরমান? তাই সমকালীন সিদ্ধান্ত বা সমাধানগুলো যদি ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার শোধনে পুনর্গঠন করা হয় তাহলে মুসলিম জাতি কতটুকু কল্যাণ লাভ করতে পারবে? তাই তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কারের পরিবর্তে ধর্মের পথেই মুসলমানদের সংশোধন ও সংস্কার অত্যন্ত সহজ হবে। যেহেতু মুসলমানদের ধর্মই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন ও কাজে-কর্মে সঠিকতা আনয়নে সক্ষম, ইহজগত ও পরকালের সার্বিক কল্যাণ দানে সমর্থ; তাই তা পরিত্যাগ করে অন্য কোনো পথ-পদ্ধতি অবলম্বন করা নিজেদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত

৩০ ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল, *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন* (ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮১ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ৩২।

করা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩১] এ বিষয়গুলো আমলে নিয়েই তিনি গবেষণাধর্মী স্বাধীন মনোভাব নিয়ে শারী'য়াহ্কে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। কেননা ইসলামী আদর্শ ও আধুনিক বাস্তবতা কখনও পরস্পরে বিরোধপূর্ণ নয়। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মনে করেন ইসলামকে মানুষের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে ধর্মের আদর্শকে সর্বজনীন ও কল্যাণমুখী করতে হবে এবং ইসলামের মূলনীতির আলোকে আধুনিকতা ও বাস্তবতার ইতিবাচক ও কল্যাণকর দিকগুলো আবিষ্কার করতে হবে। এভাবে তিনি ধর্ম ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাই তিনি মুসলিম জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বলেন,

ولا تمكن ثروة الأهالي الا بنشر العلوم فيما بينهم، حتي يتبينوا طرق الاكتساب.

অর্থ: আর তাদের (মুসলমানদের) পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ছাড়া (নিজ) জাতির সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। অবশেষে তারা এটি অর্জনের পদ্ধতি আবিষ্কার করবে।[৩২]তাই কবি হাফিজ ইব্রাহীম তাঁর সম্পর্কে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন,

أبنتَ لنا التنزيل حكما وحكمة ** وفرَّقت بين النور والظلمات

অর্থ: প্রজ্ঞা ও বিধানরূপে তুমি আমাদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থের (আল-কোরআনের) ব্যাখ্যা করেছিলে এবং আলো ও অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছিলে।[৩৩]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মুসলিম জাতিকে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের মূলনীতির আলোকে যে কোনো সমস্যার মোকাবেলায় স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি প্রয়োগের আহ্বান জানান। তাছাড়া 'আক্বীদা

৩১ আহমদ আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।

৩২ মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, *আল-'আমাল আল-কামিলাহ্ লি আল-ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: দার আল-সুরক্ব, ১৯৯৩ খ্রি.), ৩য় খণ্ড , পৃ. ২০।

৩৩ হাফিজ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*।

সংশোধনের জন্য তিনি কোরআন মাজীদকে সর্বপ্রথম মাপকাঠি হিসেবে ঘোষণা দেন।[৩৪] কবি হাফিজ ইব্রাহীম তাঁর ধীশক্তি, ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

ووفَّقتَ بين الدين والعلم والحِجَى ** فأطلعتَ نورا من ثلاث جهات

অর্থ: তুমি ধর্ম, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মাঝে সমন্বয় সাধন করেছিলে এবং তিন দিক থেকে এক (বিশেষ) আলোর উদয় ঘটিয়েছিলে।[৩৫] ইসলামী চিন্তাধারার গতিশীলতা স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি তাকলিদকে[৩৬] অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাই মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে তাকলিদ বা অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে তিনি জোরালো ভূমিকা রাখেন। তাঁর দৃষ্টিতে অনুসরণীয় ইমামগণের তাকলিদ করা কোনো অপরাধের বিষয় নয় বরং সাধারণের জন্য তা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তাকলিদের দোহাই দিয়ে মুক্তবুদ্ধি বা ইজতিহাদের[৩৭] দ্বারকে বন্ধ করে রাখা

---

৩৪ আহমদ আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯।

৩৫ হাফিজ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*।

৩৬ তাকলিদ: তাকলিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ গলায় বেল্ট জাতীয় কিছু ঝুলিয়ে দেয়া। ইসলামের প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত এই পারিভাষিক শব্দটি মক্কা নগরীর পবিত্র এলাকায় হারামের সীমানার মধ্যে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট পশুর গলায় বিশেষ কিছু কিংবা কোনো বস্তু ঝুলানো অর্থ প্রকাশ করে। ইসলামী শরীয়াহর পরিভাষায় তাকলিদ বলা হয়, কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী শরীয়াহ-এর উৎসসমূহ থেকে সরাসরি মাস'আলা উদ্ভাবন কিংবা শরঈ' বিষয়ে কোনো সমস্যার সমাধানে অক্ষম এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই কোনো মুজতাহিদ ইমাম বা ফকীহ-এর অনুসরণ করা। তাকলিদ শব্দ দ্বারা ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব দ্বারা আবৃত, অর্থও নির্দেশ করা হয়। এটি হচ্ছে কোনো প্রকার কারণ সন্ধান ব্যতিরেকেই অপর কারো বক্তব্য বা কর্মকে সম্পূর্ণ সঠিকরূপে বিশ্বাস করে গ্রহণ করা। এই অর্থে তাকলিদ হচ্ছে ইজতিহাদের বিপরীত অর্থবোধক। তাকলিদের ঐতিহাসিক সূচনা ধর্মীয় আইনগত মাযহাবের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই হয়, যা আংশিকভাবে কিংবা পূর্ণাঙ্গভাবে খ্যাতিমান ফিক্‌হশাস্ত্রের ইমামগণের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়। যখন হিজরি তৃতীয় শতাব্দী থেকে সীমাহীন ইজতিহাদের অবসান হয় এবং পরবর্তী সময়ে অপরাপর সব প্রকার ইজতিহাদের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন থেকে পরবর্তী 'আলিমগণ ও সাধারণ জনগণের জন্য পূর্বতন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণের তাকলিদ বা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ফিক্‌হ এর উন্নয়ন ও বিকাশধারার প্রেরণায় হ্রাসপ্রাপ্তির জন্য একে দায়ী করা ঠিক নয়। [(দ্র. আল- ামা তাকী উসমানী, উসুলুল ইফতা (ঢাকা: মাকতাবাতু শাইখুল ইসলাম, ১৪২৬খ্রি.), পৃ. ৫১-৫২; শাহ এমরান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫।]

৩৭ ইজতিহাদ: কোনো কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা। ইসলামী পরিভাষায় শারী'য়াতের কোনো নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে কিয়াস প্রয়োগ করে ইজতিহাদ করা হয়ে থাকে। ইসলামের প্রথম যুগে কিয়াস এবং ইজতিহাদ একই অর্থে ব্যবহৃত হতো। যিনি ইজতিহাদ করেন তাঁকে মুজতাহিদ বলা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকে অপরের মত মেনে নেয়, তাকে মুকাল্লিদ বলা হয়। সাধারণত মনে করা হয় যে, বর্তমান কালে ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ, কারও পক্ষে এ যুগে ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা বর্তমান যুগে যদি কেউ

মুসলিম জাতির চিন্তাধারার গতিশীলতাকে বিনষ্ট করে দেয়ারই নামান্তর। এতে করে যুগের চাহিদা অনুযায়ী মুসলিম সমাজে যে সকল নিত্য নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হবে সে সকল বিষয়ের সমাধান কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হতাশা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং ধর্ম মানুষের নিকট বারবার অকার্যকর ও ব্যর্থ হিসেবে প্রকাশিত হবে। অথচ ইসলাম ধর্মে সবকিছুরই সুস্পষ্ট সমাধান অন্তর্নিহিত রয়েছে।

তাকলিদ সম্পর্কে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকদের মধ্যে যাতে করে কোনো বিরূপ ধারণা সৃষ্টি না করে তাই পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে তাকলিদের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

ইজতিহাদের জন্য আবশ্যক যাবতীয় গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী হন তাহলে নির্দ্দিষ্ট সীমা ও শর্তাধীনে ইজতিহাদ করা তাঁর পক্ষে অবৈধ ও অসম্ভব কিছু নয় । [দ্র. ইবরাহীম মাদকূর, আল-মুজামূল ওয়াসীত (দিলি- : কুতুবখানা হোসাইনিয়া, দেওবন্দ, তা.বি.), পৃ. ১৪২; আবু হাবীব সাদী, আল-কামুস আল-ফিকহী (পাকিস্তান: ইদারাতুল কুরআন আল-উলুম আল-ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৭১; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, *প্রাগুক্ত*, ১৯৮৬ খ্রি., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৩৬৩।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে তাকলিদের যৌক্তিকতা

সকল যুগেই মানুষ বিজ্ঞজনদের প্রদর্শিত পথ তথা মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে। মহানবী (সা.) এর যুগে সাহাবাগণও তাঁকে অনুসরণ করেছেন। আর কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা কিংবা প্রতিবন্ধকতার কারণে সরাসরি রাসূল (সা.) এর শরণাপন্ন না হতে পারলে সে সকল সাহাবী রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁদের মধ্য হতে বিজ্ঞজনদের অনুসরণ-অনুকরণ কিংবা তাকলিদ করতেন। পরবর্তী যুগেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। যুগে যুগে সকলেই এভাবে নিজ নিজ সহজবোধ্য, বোধগম্য, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বিজ্ঞদের অনুসরণ করেই চলতে থাকেন। কোনো বিষয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞজনদের অনুসরণ কিংবা তাকলিদ করা একটি প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ব্যাপার। সকল বিষয়েই এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত অনিবার্য বিষয়। জীবনের এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে কারও অনুসরণ ব্যতীতএক পা-ও রাখা যায়না। তাই ইসলাম ধর্মের এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয় আছে যেখানে বুৎপত্তিসম্পন্ন বিজ্ঞজনের অনুসরণ কিংবা তাকলিদ ছাড়া এক কদমও এগুনো যায়না। সর্বক্ষেত্রেই একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য কোনো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুসরণ কিংবা তাকলীদ করতে হয়। অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও পবিত্র কোরআন-হাদিস গবেষণা করে আধুনিক ও সমসাময়িক জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান উৎঘাটনে অক্ষম ব্যক্তিগণের জন্য বুৎপত্তিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিজ্ঞ-অভিজ্ঞজনদের তাকলিদ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। আর এ সকল বুৎপত্তিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তিদের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক প্রদর্শিত এবং প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার নামই হচ্ছে মাযহাব। এর উপর ভিত্তি করে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে সকল মুসলিম উম্মাহ চার মাযহাবের কোনো একটি মাযহাবের অনুসরণ বা তাকলিদ করার প্রতি ইজমা (ঐকমত্য) পোষণ করেন। এজন্য দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে সাধারণ মুসলমান ছাড়া ইসলামী পণ্ডিতগণও বরাবরই কোনো না কোনো মাযহাবের তাকলিদ করে আসছেন। দৃষ্টান্ত সরূপ বলা যায়, আমাদের এ উপমহাদেশে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই প্রায় সব মুসলামানই হানাফি মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে। পবিত্র কোরআন

ও হাদিসেও তাকলিদের বিষয়ে বিশেষ দিক নির্দেশনা রয়েছে। পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর আলোকে তাকলিদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো।

পবিত্র কোরআনের আলোকে তাকলিদ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের। আর তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর' বা বিজ্ঞ তাঁদের।"[৩৮] পবিত্র কোরআনের অন্য এক আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আর পথ অনুসরণ করুন আমার প্রতি মনোনিবেশকারীর।[৩৯]

তাফসীরবীদগণের মতে, উপরোক্ত আয়াতে 'উলুল আমর' (أولي الأمر) -এর আনুগত্য করার করার বৈধতা দান করা হয়েছে এবং উলুল আমর দ্বারা ফকীহ আলিমগণকেই বুঝানো হয়েছে।[৪০]

বিজ্ঞজনদের কাছ থেকে জানার বিষয়ে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

অর্থ: "যদি শারী'য়াতের বিধি-বিধান তোমাদের জানা না থাকে; তাহলে যাঁরা জানে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করো।"[৪১] সূরা ফাতিাহার অপর এক আয়াতে আল্লাহ মুসলমানদের এ প্রার্থনা শিখিয়ে দিয়েছেন যে, (হে আল্লাহ) আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাঁদের পথ যাঁদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন।[৪২] আর যাদেরকে আল্লাহ নিয়ামত দান করেছনে তাদের পরিচয় সূরা আল-নিসায় আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন, "যাদেরকে আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন তাঁরা হলো নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ।[৪৩] পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে,

---

৩৮ *আল-কোরআন*, ৪: ৫৯।

৩৯ *প্রাগুক্ত*, ৩১: ১৫।

৪০ মাওলানা মহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ৫০২।

৪১ *প্রাগুক্ত*, ১৬: ৪৩, ২১: ৭।

৪২ *প্রাগুক্ত*, ১: ৬-৭।

৪৩ *প্রাগুক্ত*, ৪: ৬৯।

প্রথমত: সূরা আন-নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পাশাপাশি 'উলিল আমর' এর আনুগত্যকেও আবশ্যক করা হয়েছে। অর্থাৎ 'উলিল আমর' এ পরিভাষাটির মাধ্যমে পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ও গুণের অধিকারী ফাকীহ্ ও মুজতাহিদ ইমামগণকেই বোঝানো হয়েছে। প্রখ্যাত তাফসিরকার ইমাম ইবনে কাসীরসহ প্রসিদ্ধ সকল তাফসিরকারই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তাই আলোচ্য আয়াতে 'উলিল আমর' বলতে ফাকীহ্ ও মুজতাহিদ ইমামগণ হওয়াটাই অধিক শ্রেয়।

দ্বিতীয়ত: সূরা লোকমানের পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অভিমুখীদের পথ অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ অভিমুখী বলতে মুমিনগণের পথ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে মুমিনগণের পথ অনুসরণ করতে হবে। এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর পর আল্লাহ অভিমুখীদের প্রথম সারিতেই রয়েছেন তাবেঈগণ। তাঁদের পর তাবে-তাবেঈগণ; আর এতদুভয়ের সর্বাগ্রে রয়েছেন মুজতাহিদ চার ইমাম।

তৃতীয়ত: সূরা আম্বিয়ার সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞদের থেকে জেনে নেওয়ার নির্দেশ দেন। সুতরাং এ আয়াতটি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, অনভিজ্ঞদের জন্য বিজ্ঞদের নিকট থেকে জেনে নেয়া আবশ্যক। আর জানার প্রক্রিয়া হলো বিজ্ঞজনদের জিজ্ঞাসা করা এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করা। আর বাস্তবিক অর্থে এটাই হচ্ছে তাকলিদ।

চতুথর্ত: সূরা আল-ফাতিহার ৬-৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে তাঁর নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন তাঁদের পথ প্রাপ্তির জন্য মুমিনদেরকে প্রার্থনা শিখিয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরা হলেন চারটি দল তথা নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের পথই হলো সরল-সঠিক পথ। তাই তাঁরা সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। আর যারা তাঁদের তাকলিদ করবে তাঁরাও নিশ্চিতভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হবে। আর এ অনুসরণ প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে তাকলিদ। যারা এদের অনুসরণ কিংবা তাকলিদ করবেনা তারাই ভ্রান্ত পথের পথিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

হাদিসের আলোকে তাকলিদ

প্রথমত: তিরমিযি শরিফের সুদীর্ঘ হাদিসের একাংশে মহানবি (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য হতে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা অসংখ্য ইখতিলাফ (মতানৈক্য) প্রত্যক্ষ করবে,

এমতাবস্থায় অবশ্যই তোমরা নবোদ্ভাবিত বিষয়াদি বর্জন করবে। কেননা, তা গোমরাহীর মূল। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা এসব ফিতনা ও বিদ'আতসমূহ প্রত্যক্ষ করবে, তাদের জন্য আমার এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সাহাবাগণের সুন্নাতের অনুসরণ করা ওয়াজিব ও একান্ত অপরিহার্য। সেগুলোকে তোমরা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে।[৪৪] মহানবি (সা.) এ হাদিসে নিজ সুন্নাতের সাথে সাথে সাহাবাগণের সুন্নাত ও তাঁদের আদর্শ আঁকড়ে ধরার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সকল মুসলমানের জন্য খোলায়ায়ে রাশেদীনের তাকলিদ ওয়াজিব করেছেন। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণের অবর্তমানে শারী'য়াতের জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ও বুৎপত্তিসম্পন্ন ইসলামী পণ্ডিতের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। আর এর নামই হচ্ছে তাকলিদ।

দ্বিতীয়তঃ হযরত হোযাইফা রা. কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা.)এর খেদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, জানি না, কতোদিন তোমাদের মাঝে আমি, বেঁচে থাকব! তবে আমার পরে তোমরা দু'জনের ইকতিদা (আনুগত্য) করে যাবে। একজন আবু বকর আর অপরজন 'উমর।[৪৫] এ হাদিসে ইকতিদা শব্দটি ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এর শাব্দিক অর্থ হলো আনুগত্য করা। আর কোরআন ও হাদিসের পরিভাষায় কেবল ধর্মীয় কাজে আনুগেত্যর অর্থেই এর ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রশাসনিক আনুগত্যের অর্থে এ শব্দের ব্যববহার হয় না। সুতরাং ধর্মীয় কাজে আবু বকর (রা.) ও 'উমর (রা.) এর আনুগত্যের নির্দেশ করাই উপরোক্ত হাদিসের লক্ষ্য। আর এ আনুগত্যের নামই হচ্ছে তাকলিদ। এতেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন-হাদিসের কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে এর সমাধানের ক্ষেত্রে আবু বকর (রা.) ও 'উমর (রা.) এর তাকলিদ বা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। তাই রাসূল (সা.) এর অবর্তমানে যে কারণে আবু বকর (রা.) ও 'উমর (রা.) এর তাকলিদ করা ওয়াজিব সে কারণেই উক্ত দুই সাহাবীর অবর্তমানে বিজ্ঞ মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলিদ করা এ হাদিসের আলোকে ওয়াজিব বলে প্রমাণিত হয়।

---

৪৪ *তিরমিযি*, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৩, হা.২৬৭৬, 'ইলম অধ্যায়, এ হাদিস সম্পর্কে তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান ও সহিহ্। *আবু দাউদ*/৫/১৩ হা. ৪৬০৭ সুন্নাহ অধ্যায়, *ইবনে মাজাহ* ১/৩২ হা. ৪৩ সুন্নাত অধ্যায়, *মুসনাদে আহমদ* ৪/১২৬-১২৭, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

৪৫ *তিরমিযি*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৭০ হা.৩৬৬৩, মানাক্বিবে আবু বকর ও 'উমর। হাদিসটিকে তিনি হাসান (শুদ্ধ) বলেছেন।

তৃতীয়তঃ ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান আল-আযারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ন্যায়পরায়ণ প্রতিটি উত্তরসূরিই পূর্বসূরিদের কাছ থেকে দ্বীনি 'ইলমের বাহক হবেন এবং অতিরঞ্জিতকারীদের বাড়াবাড়ি ও বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং জাহিলদের অপব্যাখ্যা ও দ্বীন থেকে দূরীভূত করবেন।[৪৬] কোরআন-সুন্নাহ তথা শারী'য়াতে যে কোনো বিষয়ে মূর্খ-জাহিলদের মনগড়া তা'বীল, মিথ্যাচার ও অপব্যাখ্যা ইত্যাদি থেকে কোরআন-সুন্নাহ তথা 'ইলমে দ্বীনকে রক্ষা করা প্রত্যেক যুগের নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ আলিম সমাজের পবিত্র দায়িত্ব। এতে বোঝা যায় যে, কোরআন-সুন্নাহর সঠিক ও নির্ভুল অনুসরণের জন্য সকলকে বিজ্ঞ ও যোগ্য 'আলিমগণেরই শরণাপন্ন হতে হবে এবং তাঁদের দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাকে চলতে হবে। এরই নামই তাকলিদ। অতএব, এ হাদিসের আলোকে স্বাভাবিকভাবেই প্রামণিত হয় যে, অনভিজ্ঞরা শারী'য়াত সম্পর্কে কোনো সমাধান পেশ না করে অবশ্যই শারী'য়াত বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হবে এবং তাঁরা যে সমাধান পেশ করেন, তা অনুসরণ করে যাবে। আর এ অনুসরণের নামই তাকলিদ করা।

চতুর্থতঃ ইবনে সীরীন (র.) বলেন, ইসলামী শারী'য়াতের ইলম হলো দ্বীন। সুতরাং তোমরা এ মূল্যবান দ্বীন কেমন ব্যক্তি থেকে অর্জন করছো, তা লক্ষ্য করো।[৪৭] এ উক্তিটির সরাকথা হলো, দ্বীন-ধর্ম সব শ্রেণির লোক থেকে গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি স্ব-ঘোষিত কোনো মুজতাহিদ থেকেও গ্রহণ করা যাবে না; বরং সুযোগ্য শারী'য়াত বিশেষজ্ঞদের থেকে তা গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা হবেন মুজতাহিদ ইমাম ও দ্বীন-ধর্মে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। আর অবশিষ্টরা হবে তাদের অনুসারী ও মুকাল্লিদ। এ ধরনের অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'তাকলিদ' করা ও 'মাযহাব' মানার বৈধতা এবং এর আবশ্যকতাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত করে। উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকলের 'ক্বিয়াস' বা গবেষণা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং যোগ্য মুজতাহিদ ও মুত্তাকি আলিমদের গবেষণাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য এবং কেবল তাঁদের অনুসরণ করাই ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। আর যাঁদের গবেষণা গ্রহণযোগ্য হবে, তাঁরা হলেন মুজতাহিদ বা অনুসরণীয়; কিন্তু যাদের গবেষণা বা মতামত গ্রহণযোগ্য নয়, তারা হলেন মুকাল্লিদ বা

৪৬ *বায়হাকি*, আস সুনান ১০/২০৯, হাদিস ২০৯১১ (মুরসাল)।

৪৭ *সহিহ মুসলিম*, মুকাদ্দামা, পৃ. ১৪।

অনুসরণকারী। সুতরাং মুকাল্লিদবা অনুসরণকারীদের জন্য কোরআন ও হাদিসের নির্দেশ অনুসারে মুজতাহিদ বা যোগ্য ইমামদের অনুসরণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অবস্থান

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ইসলামের আক্বীদা-বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নৈতিকতা, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কিত সকল প্রকার নব্য জাহিলিয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেন। তিনি মুসলমানদের যাবতীয় ত্রুটির উৎস এবং এর সংশোধনের পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ করেন। চিন্তা ও আচরণে গোঁড়ামিবাদের[৪৮] অনুসরণ এবং ধর্মান্ধতা ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি প্রচলিত শারী'য়াহ বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান সংশোধনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর সংস্কারধর্মী পদক্ষেপ ও সমালোচনা হতে সরকারি প্রশাসনসহ কেউই রক্ষা পায়নি।[৪৯]

গোঁড়ামি কিংবা ধর্মান্ধতা কোনো জাতি বা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং প্রত্যেক জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। ব্যক্তির গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতা ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট ধর্ম ও সম্প্রদায়কে কলঙ্ক লেপন করছে। এভাবে প্রতিনিয়তই এক শ্রেণির ব্যক্তি ধর্মকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তৎকালীন ধর্মীয় মতবাদগুলো স্থবিরতা ও হীনম্মন্যতার অন্ধ অনুকরণে এমনরূপে নিমজ্জিত ছিল যে, যার মধ্যে ছিল গতানুগতিক ইসলামের দুর্বল বৈশিষ্ট্য। আর সেই সময়ে ধর্মকে এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হতো যেখানে বিজ্ঞানকে আধুনিক বিশ্বের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন হিসেবে মোটেও উপস্থাপন করা

---

৪৮ গোঁড়ামিবাদ (Dogmatism): বৈজ্ঞানিক যুক্তির ধার না ধেরে কোনো বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাসকেই বলে গোঁড়ামিবাদ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত উৎপাদন, উৎপাদন-সম্পর্ক, সামাজিক কাঠামো ও পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি, এমনকি বিশ্বপরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটে চলছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমস্যার বৈশিষ্ট্য ও সমাধানের রূপরেখাও ভিন্নতর হতে বাধ্য। এ বৈজ্ঞানিক সত্যকে কার্যত উপেক্ষা করে, পূর্ববর্তী বা ভিন্ন পরিস্থিতির কোনো মতবাদ, চিন্তাধারা বা কৌশলকে আঁকড়ে থাকা এবং স্থান-কালের ভিন্নতাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে সেটাকেই প্রয়োগ করতে উদ্যত হওয়াকেই বলে গোঁড়ামিবাদ। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই গোঁড়ামিবাদের দর্শন মেলে। হিটলারের 'আর্য আভিজাত্য'ও ছিল এক ধরনের গোঁড়ামিবাদ। পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে এশিয়া-আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহে ঐই গণতন্ত্র হুবহু কায়েমের চিন্তাকেও অনেকে এক ধরনের গোঁড়মি বলে মনে করেন। অনুরূপভাবে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ষ্ট্যালিন, মাও সে তুং প্রমুখের বক্তব্যকে ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যের মতো অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করে সকল স্থান ও কালে একইভাবে তা প্রয়োগের প্রবণতাও এক ধরনের গোঁড়ামি। [দ্র. হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭]

৪৯ Amin, Osman. *Muhammad Abduh* (Washington DC: American Council of Learned Societies,1953), p. 32.

হতো না।[৫০] এভাবে গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা মুসলমানদেরকে পশ্চাতে ঠেলে দিচ্ছে; সৃজনশীলতা, উন্নয়ন ও উৎপাদনকে বাধাগ্রস্থ করছে। গোঁড়ামির কারণে আজ অজ্ঞ মানুষেরাও মনে করছে যে, রাষ্ট্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হবে, মানুষ অধিকার বঞ্চিত হবে। আর এর মূল কারণ হলো, ইসলাম যে একটি উদার, সহনশীল ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা মুসলমানরা তা নিজেরা বুঝতে ও অন্যকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ একটা সময়ে অমুসলিমরা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকেই তাদের জান-মালের রক্ষাকবচ মনে করত। তাই কে কোনো ধর্মের অনুসারী তা বিচার-বিশ্লেষণ না করে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সকলকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। এজন্যই কবি হাফিজ ইব্রাহীম বলেন,

مّلاذ عَيايِيل ثِمال أرامِل ** غِياث ذَوِي عُدم إمام هُداة

অর্থ: (তিনি ছিলেন) গরীব-দুঃখীর আশ্রয়, বিধবাদের তত্ত্বাবধানকারী, অভাবগ্রস্তদের সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শকদের নেতা।[৫১]

৫০ Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age* (Great Britain: Oxford University Press, 1962), P. 137.

৫১ হাফিজ ইব্রাহীম, *প্রাগুক্ত*।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
শারী'য়াহ্ 'আদালতের সংস্কার

১৮৮১ সালে মিশরে 'আরাবী পাশাসহ[৫২] সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা বিদেশিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক এটা নিশ্চিত হয় যে, এ বিদ্রোহে জামাল উদ্দীন আফগানী ও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ অনুপ্রেরণা যোগায়। এ আন্দোলনের শুরুতে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্বাধীন ও মুক্তিকামী মিশরবাসী যখন জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করে এবং এ আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় আন্দোলন রূপে দানা বাঁধে তখন তিনিও এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে মুহাম্মদ 'আবদুহ্কে তিন বছরের জন্য নির্বাসন দেয়া হয়। এরপর ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বৈরূতে চলে যান।[৫৩] প্রায় তিন বছর নির্বাসনে থাকার পর মিশরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশ এবং তৎকালীন ব্রিটিশ হাই কমিশনারের হস্তক্ষেপে খেদিব তাওফীক পাশা[৫৪] তাঁকে পুনরায় দেশে আগমনের অনুমতি প্রদান করেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মিশর প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে প্রাথমিক দেওয়ানী 'আদালতের বিচারক নিযুক্ত করা হয়।[৫৫]

ইতোমধ্যে মিশরে মুসলমানদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছিল। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ উপলব্ধি করতে পারেন যে, মিশরে বিপ্লবের চেয়ে সংস্কারই বেশি প্রয়োজন। কারণ সেই সময়ে দেশে দুটি মতবাদ ছিল। একদিকে আল-আযহার কেন্দ্রিক পুরাতন ধ্যান-ধারণা সমৃদ্ধ ধর্মীয় মতবাদ গড়ে

---

৫২ আহমদ 'আরাবী পাশা: জনৈক কৃষকের পুত্র কর্নেল আহমদ 'আরাবী পাশা যিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন। 'আরাবী পাশা ১৮০০০ সৈন্যের নিযুক্তি দাবি করেন। তিনি "মিশর মিশরীদের জন্য" এ শ্লোগান দেন এবং দেশবাসীদের কাছে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন। তিনি এশিয়ার অগ্নিপুরুষ জামাল উদ্দীন আফগানীর ভাবশিষ্য ছিলেন। ১৮৮২ সালের ১১ জুন আলেকজান্দ্রিয়া শহরে বিক্ষোভ দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়; তখন ইউরোপীয় ও তুর্কী দূতাবাস আক্রান্ত হয়। ব্রিটিশ এবার 'আরাবী পাশার বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে উঠে। ১৩ই সেপ্টেম্বর তেলুলকেবির নামক স্থানে কিছু অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকতায় 'আরাবী পাশা পরাজিত হয়ে ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হন। [মোহাম্মদ গোলাম রসুল,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৩৭]

৫৩ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

৫৪ তাওফীক পাশা: খেদিভ তাওফীক পাশা ১৮৫২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মিশরেই পড়াশোনা করেন। তাঁর মধ্যে নৈতিক মুল্যবোধ ছিল প্রবল। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম যে সমস্যাটি মোকাবেলা করেন সেটি ছিল তুরস্কের সঙ্গে মিশরের সম্পর্কের উন্নয়ন। তাওফীক পাশা তাঁর শাসন কালের শুরুতেই অসাংবিধানিক উপায়ে শাসন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। [ভুঁইয়া, ড. গোলাম কিরিয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩৪।]

৫৫ Osman Amin, *Ibid*,P. 74.

ওঠে, আর অন্যদিকে ইউরোপীয় ধাঁচে আধুনিক মতবাদ গড়ে উঠে; যা বিদেশি মিশন কিংবা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। আর এ দুই মতবাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্তোষজনক কোনো সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না।[৫৬] আর তিনি মর্মেমর্মে এটাও হৃদয়ঙ্গম করেন যে, সংস্কার, পরিবর্তন, আধুনিকায়ন ও সমাজ বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত কোনো পথ নেই। তাই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিদেশি দখলদারিত্বের কারণে বেড়ে ওঠা বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার মোকাবেলা তাঁকে করতে হবে। তাই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে ইসলামী আইন ও শিক্ষা সংস্কারে বেশি গুরুত্বারোপ করেন। পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর গভীর জ্ঞান এবং দেশ-বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপ সফরের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর মেধা-মনন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও দর্শনের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে; যা পরবর্তীসময়ে তাঁকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ও ইসলামী শারী'য়াহ্'আদালতের সংস্কার সাধনে আগ্রহী করে তোলে। এ সময় সা'দ জাগলুল[৫৭] ও কাসিম আমিনসহ[৫৮] প্রমুখ দেশ বরেণ্য বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদগণও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ শারী'য়াহ্ 'আদালতের সংস্কার এবং বিচার প্রশাসন আধুনিকীকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেসময় প্রাথমিক 'আদালতসমূহের কর্মপদ্ধতির মূল ভিত্তি ছিল ফরাসি আইন। তাই ফরাসি ভাষা শিক্ষা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় ছিল না এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এ ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন।[৫৯] তিনি ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ

---

৫৬ Hourani, *Ibid*, p. 137.

৫৭ সা'দ জাগলুল পাশা: মিশরীয় জাতির পিতা সা'দ জাগলুল পাশা ১৮৫৭ (মতান্তরে ১৮৬০) সালে মিশরের গারবিয়া প্রদেশের অন্তর্গত আইবিয়ানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন গ্রাম প্রধান (উমদা) দিলেন, যা তাঁর পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও স্থানীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সনাতন পড়াশুনা শেষ করার পর জাগলুল উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৭১ সালে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। এখানে জাগলুল আফগানী ও 'আবদুহ্ এর শিষ্যে পরিণত হন। ১৮৯২ সালে তিনি আপিল আদালতের বিচারক নিযুক্ত হন। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি মিশরীয়দের শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১০ সালে তাকে আইন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। [এম এ কাউসার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮]

৫৮ কাসিম আমিন:একজন আরব প্রাচ্যবিদ এবং সামাজিক বিষয়ের লেখক। তিনি মিশরে আরব নারী মুক্তি আন্দোলন ত্বরান্বিত করার অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায়। তাঁর মাতা মিশরীয় ও পিতা তুর্কি বংশোদ্ভূত। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ শক্তি মিশর দখল করে এবং 'উরাবী পাশার বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। মিশরে সংস্কার কার্যক্রমের অংশবিশেষ ইতোমধ্যেই বলবৎ করা হয়েছিল। কাসিম আমিন ঐ সংস্কার কার্যক্রমে তাঁর প্রথম অবদান রাখেন। [সম্পাদনা পরিষদ,*প্রাগুক্ত*,২০০৮ খ্রি., ৭ম খণ্ড, ২য় সং., পৃ. ৬৭৯।]

৫৯ Osman Amin, *Ibid*, P. 75.

বুঝতে পেরে শারী'য়াহ্ 'আদালত সংস্কারের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ 'উলামাদের সংস্কারের লক্ষ্যেও কাজ করেন, বিশেষ করে আল-আযহারের পাঠ্যক্রম ও ধর্মীয় 'আদালতের সংস্কার চেয়েছিলেন তিনি।

সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আধুনিক বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে তিনি ইসলামী আইনের ব্যাপক পর্যালোচনার বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, মিশরীয় সমাজ ভেঙ্গে পড়েছে, তাই প্রথাগত ইসলামী রীতিনীতির আধুনিক আইনি ও সাংবিধানিক বিকাশ সংযুক্ত করার প্রয়োজন ছিল ; নইলে পাশ্চাত্য ধ্যন-ধারণার প্রতি যথেষ্ট উন্মুক্ত মিশরের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো অর্থই করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ; শুরাহর (পরামর্শ) নীতিমালাকে গণতন্ত্রের সাথে মানানসই হিসেবে দেখা যেতে পারে এবং ইজমা'[৬০] (ঐক্যমত) এখন থেকে জনগণকে সাংবিধানিক নিয়ম-কানুন বুঝতে সাহায্য করতে পারে; এভাবে জনমত শাসকের ক্ষমতাকে সীমিত করতে পারবে বলে তিনি মনে করেন।[৬১] পরবর্তীতে তিনি হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবেও দায়িত্বপালন করেন। 'আদালতগুলোতে তাঁর দীর্ঘ কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং শারী'য়াহ্ আইন সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা তাঁকে মিশরসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একজন ইসলামী আইনজ্ঞ ও সুপণ্ডিত হিসেবে পরিচিত করে তোলে। তাই 'আদালতসমূহে কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তাঁর গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি প্রথাগত চলমান শারী'য়াহ্ 'আদালতের কার্যাবলি ও নীতিমালা সংশোধনের সুপারিশ সম্বলিত গ্রন্থ 'তাকরীর ফি ইসলাহ্ আল-মাকাম আল-শারীয়াহ্' প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

---

৬০ ইজমা': ইজমা' ইসলামী শারী'য়াতের চারটি মূল উৎসের মধ্যে তৃতীয় এবং কার্যত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইজমা' শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো ব্যাপারে একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায়, শারী'য়াতের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মাতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষকদের) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা' বলা হয়। আল্লাহর আরোপিত কোনো বিধান (হুকুম) সম্পর্কে উম্মাতের সর্বসম্মত ঐকমত্যই হচ্ছে ইজমা'। ইজমা' মহানবি (সা.) এর পরবর্তী যে কোনো যুগে হতে পারে। সাহাবীগণ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইজমা' কোরআন-সুন্নাহ সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা ও নি'য়ামত। [*ইসলামী বিশ্বকোষ*, *প্রাগুক্ত*, ১৯৮৬ খ্রি., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।]

৬১ Hourani, *Ibid*, P. 144.

১৮৯৯ সালে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মিশরের প্রধান মুফতির পদ অলংকৃত করেন। এ পদে নিয়োগ লাভের পর তিনি এ পদকে আরো মহিমান্বিত করেন। মিশর ছাড়াও সমগ্র মুসলিম বিশ্ব হতে তাঁর নিকট ফাতওয়া[৬২] চাওয়া হতো। ইসলামী আইনের সংস্কারের যুক্তির অবতারণা করে তিনি বলেছিলেন যে, আল্লাহর উপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন কানুন অপরিবর্তনীয় হলেও ইসলামের সামাজিক বিধানসমূহ উল্লেখযোগ্যভাবে পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিচারের উপযুক্ত। মিশরের মুফতি (প্রধান ধর্মীয় নেতা) হিসেবে মুহাম্মদ 'আবদুহ্র সরকারি মতামত ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদের অনুমোদনযোগ্যতা থেকে শুরু করে সঞ্চয়, মুনাফা, সুদ, ব্যাংকিং, বিয়ে ও তালাকের মতো ব্যাপক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে"।[৬৩] তাঁর সকল ফাতওয়ার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি ফাতওয়া ছিল খুবই বিখ্যাত। যেমন: তিনি ফাতওয়া প্রদান করেন যে,

الأولي تبيح للمسلمين ادخار أموالهم وأخذ الفوائد والأرباح عليها؛ والثانية تبيح لهم أن يأكلوا من ذبائح غير المسمين؛ والثالثة تبيح لهم أن يتزيوا بزي غير زيهم التقليدي.

অর্থ: প্রথমত, মুসলমানদের জন্য বৈধ হবে সম্পদ সঞ্চয় করা এবং সঞ্চয়কৃত সম্পদের ওপর মুনাফা ও লাভ গ্রহণ করা।দ্বিতীয়ত, তাদের (মুসলমানদের) জন্য অমুসলিমের জবাই করা (প্রাণীর মাংস) ভক্ষণ করা বৈধ হবে। তৃতীয়ত, তাদের স্থানীয় প্রথাগত পোশাকের বাইরেও তারা অন্য পোশাক পরিধান করতে পারবে।[৬৪]

---

৬২ ফাতওয়া: ফাকীহ্ কর্তৃক অভিমতকে 'ফাতওয়া' বলা হয়। 'ফাতওয়া' একটি 'আরবি শব্দ। অভিধান রচয়িতাদের মতে এটি **الفتوة** (আল-ফুতুয়াতু) শব্দ হতে গৃহীত হয়েছে; যার অর্থ হলো অনুগ্রহ, বদান্যতা, দানশীলতা, মনুষ্যত্ব ও শক্তি প্রদর্শন। ফাতওয়াকে ফাতওয়া বলে এজন্যই নামকরণ করা হয়েছে; যেহেতু মুফতি বা ফাতাওয়াদাতা নিজের লব্ধ বদান্যতা, মনুষ্যত্ব ও প্রজ্ঞা দ্বারা কোনো দ্বীনী বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধানকল্পে 'ফাতওয়া' প্রদান করে থাকেন। ইবন আল-আছীর এর মতে, কোনো বিষয়ের অনুমতির বৈধতা বর্ণনা করে দেয়ার নামই ফাতওয়া। আকস্মিক নব উদ্ভাবিত কোনো ঘটনার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পেশকৃত দ্বীনী সিদ্ধান্তসমূহকে যেহেতু মুফতি সাহেব নিজের প্রামাণিক দলিলাদির দ্বারা মজবুত ও সুদৃঢ় করে থাকেন তাই ফাতওয়া এক স্বতঃসিদ্ধ অমোঘ বিধানরূপে পরিগণিত হয়। ফাতওয়া সাধারণত ইসলামী শারী'য়াতে এমন এক প্রাসঙ্গিক বিষয় যার সম্বন্ধে পূর্ববতী কোনো মুজতাহিদ অথবা তাঁর সহকর্মী অনুসারীদের মধ্যে কারও নিকট হতে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। পরবর্তী 'উলামায়ে কিরাম নিজেদের সাধনা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এর সমাধান করে থাকেন এমন বিষয়ই হচ্ছে ফাতওয়া। [*ইসলামী বিশ্বকোষ*, *প্রাগুক্ত*, ১৯৮৮ খ্রি.,১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৪।]

৬৩ জন এল, এসপাসিতো (শওকত হোসেন অনূদিত), দ্য ইসলামিক থ্রেট মিথ অর রিয়েলিটি? (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ৮৮-৮৯।

৬৪ রাশিদ রিদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১৭।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
নারী অধিকার আন্দোলন

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সর্বদা নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে মুসলিম নারীদের অবনমন করে রাখা এক ধরনের ইসলামী নীতি বিরুদ্ধ কাজ এবং পরিবার, সমাজ ও জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে এ অবনমন একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। তাই সামগ্রিক অনুন্নয়ন ও পশ্চাৎপদতার একটি প্রধান কারণ হিসেবে তিনি নারীর অনগ্রসরতাকে দায়ী করেন। নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো এদের প্রতি সম্মানজনক মনোভাব পোষণ করা। সৃষ্টির বিচারে নর ও নারী কারও মধ্যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে তারতম্য না করা। একজন নর যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, নারীও তেমন একই আল্লাহর সৃষ্টি। উভয়েই এক মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। সৃষ্টিলগ্ন থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ হিসেবে উভয়ই সমমর্যাদার অধিকারী। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা এ উভয় জাতির মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানব জাতির বংশ বিস্তার ঘটিয়েছেন। এতে কারও কোনো একক কৃতিত্ব নেই। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করা হয়েছে,

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم إن اللّه عليم خبير.

অর্থ: হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে এবং তোমাদেরকে (বিভক্ত) করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে; যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। নিশ্চই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।[৬৫]

নারীগণ স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে এবং মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাদের রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। তাই কাজের সময় এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের রয়েছে সমানাধিকার। এই সমানাধিকারের যুক্তির ভিত্তিমূলে রয়েছে সকলে একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং মানুষ

৬৫ *আল-কোরআন*, ৪৯: ১৩।

ও মানবিকতার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং কর্মক্ষেত্রেও একের ওপর অন্যের কোনো প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। পবিত্র কোরআনেও ইরশাদ করা হয়েছে,

ولهن مثل الذي علَيهِن بالمعروف وللرجال علَيهن درجة والله عزيز حكيم.

অর্থ: নারীদের তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের একটি মর্যাদা আছে, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৬৬]

শিক্ষা ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ নারী শিক্ষার বিষয়ে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। নারীদের শিক্ষার অধিকার আদায়ে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি সবসময় নারী জাতিকে নিয়ে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতেন এবং মানুষের মর্মবোধে নারীর প্রতি মহিমাময় মর্যাদা প্রদর্শন এবং নারীকে ইসলাম নির্দেশিত পূর্ণঅধিকার প্রদানের বিষয়ে তিনি মুসলিম জাতির মধ্যে সম্যক উপলব্ধি ও চেতনাবোধ জাগ্রত করতেন। তিনি মনে করেন যে, ইসলাম নারীকে সম্মান প্রদর্শন ও অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে যদিও অগ্রগামী; কিন্তু এখনও মুসলমানরা নারীকে শিক্ষাদান ও তাঁর অধিকারবোধ জাগ্রত করার বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীন।[৬৭] এভাবে তিনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনসহ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম নির্দেশিত নারী অধিকার ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। কেননা নারী জাতির প্রতি সম্মানবোধ একজন মানুষের উত্তম মানসিকতার পরিচায়কও বটে। তাই তিনি শিক্ষা ও রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে উন্নয়ন ও জাগরণের প্রতি আহ্বান জানান। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বলেন:

تنهض القلة المستنيرة من النساء المتعلمات بتكوين جمعية نسائية، تقيم المدارس لتعليم البنات، وحبذ هذا الدور لهنّ على ما يشغلهن من أمور السياسة، واستقبال علية القوم في الصالونات.

অর্থ: কতিপয় শিক্ষিত আলোকিত নারী মিলে একটি নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উদ্যমী হবে; মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করবে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

৬৬ *প্রাগুক্ত*, ২: ২২৮।

৬৭ এসপাসিতো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

থাকবে। আর (তাঁরা) অভ্যর্থনাকক্ষে নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্তদের অভ্যর্থনা জানাতেও এগিয়ে আসবে।[৬৮]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মুসলিম নারীদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামের মৌলিক নারী অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তাই তিনি প্রচলিত আইন ও শিক্ষা সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি বহুবিবাহের বিপক্ষে অবস্থান করেন এবং মুসলিম পরিবার ও সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক যুক্তি দেখান যে, মহানবি (সা.) এর সময়ে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে এটা একটি বিশেষ ব্যবস্থা ছিল মাত্র। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর এই মতামত পৃথিবীর অনেক মুসলিম সংস্কারকগণই মেনে নিয়েছিলেন।[৬৯] তাই পরবর্তীতে পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশেই মুসলিম শাসকগণ বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে কিংবা তা নিরুৎসাহিত করে মুসলিম পারিবরিক আইন সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর এ আইন সংস্কারের পিছনে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর আধুনিক চিন্তাধারাই মুসলিম দেশে দেশে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম সবসময়ই নারীসহ সকলের পক্ষে সাম্য ও ন্যায়বিচারের কথা বলে। মুহাম্মদ 'আবদুহ্, রাশিদ রিদা (১৮৬৫-১৯৬৫ খ্রি.) ও কাসিম আমিনসহ (১৮৬৩-১৯০৮ খ্রি.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নারী উন্নয়নমূলক চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টার কারণেই মিশরের তৎকালীন নারীদের অবস্থার কিছুটা উন্নয়ন ঘটে। যেমন: এ সময়ে তৎকালীন খেদিভ মুহাম্মদ ইসমাইল পাশা (১৮৩০-১৮৯৫ খ্রি.) মিশরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মেয়েদের প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন। তাছাড়া ১৮৭৫ সাল নাগাদ প্রায় তিন হাজার মিশরীয় মেয়ে মিশন স্কুলে পড়াশুনা করে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ১৮৭৩ সালে সরকার মেয়েদের জন্য প্রথম রাষ্ট্রীয় প্রাথমিক স্কুল এবং পরের বছর একটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করে। উল্লেখ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ মিশরীয় নারীরা পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন; এমনকি তাঁরা চিকিৎসক ও শিক্ষক পর্যন্ত হওয়া শুরু করেন। এভাবে 'আবদুহ্ ও তাঁর শিষ্যরা মিশরে নারী উন্নয়নের ধারায়

---

৬৮ মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮১।

৬৯ এসপাসিতো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

এক নতুন মাত্রা যোগ করেন।[৭০] পরবর্তীতে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর নারী উন্নয়নমূলক চিন্তাধারাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁরই সহযোগী মিশরের প্রখ্যাত আইনবিদ ও বিচারক কাসিম আমিন (১৮৬৩-১৯০৮ খ্রি.)। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর পর তিনিই ইসলামী আধুনিকতাবাদের নারীবাদী মাত্রার বিকাশ ঘটান।

হিযাব সম্পর্কে 'আবদুহ্ এর দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের পূর্বে সকল জাতিই পুরুষকে অসামান্য প্রাধান্য দিয়েছিল এবং নারীকে নরের তৈজসপত্র বা খেলার পুতুল বানিয়ে রেখেছিল। কোনো কোনো ধর্মে নারীকে ধর্ম পালনের অধিকারও দেয়া হয়নি; যা ইসলাম দিয়েছে। তাই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোরআন আল্লাহর চোখে নারী-পুরুষকে সমান হিসেবে উপস্থাপন করেছে, তালাক[৭১] ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথাগত বিধি ইসলামে আবশ্যক নয়; এগুলো পুনর্বিবেচনা কিংবা পুনরালোচনা করা সম্ভব।[৭২] তাছাড়া তিনি মুসলিম নারীদের প্রচলিত হিযাব ব্যবস্থার সমালোচনাপূর্বক ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বলেন,

لكننا لا نجد في الشريعة نصا يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة وانما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الامم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء.

---

৭০ ক্যারেন আর্মস্ট্রং (অনুবাদ: শওকত হোসেন), *মৌলবাদের ইতিহাস* (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ২৩৭।

৭১ তালাক: তালাক শব্দের অর্থ বন্ধনমুক্ত করা। শারী'য়াতের পরিভাষায় বিশেষ শব্দের মাধ্যমে বিয়ে বন্ধন ছিন্ন করাকে তালাক বলা হয়। ইসলামে তালাক সবচেয়ে ঘৃণিত বৈধ কাজ। ইসলামে তালাককে অপছন্দ করা হয়েছে। তালাক দেয়ার অধিকার পুরুষর অর্থাৎ স্বামীর। আর স্ত্রীর অধিকার খুলা' করার। খুলা'র আভিধানিক অর্থ খসিয়ে নেওয়া, টেনে বের করে ফেলা। আর শারী'য়াতের পরিভাষায় স্বামীকে কিছু মাল দিয়ে নিজকে স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে নেয়া। (দ্র. *আল-কোরআন:* ২: ২২৯; আবু দাউদ সিজিস্তানী, *সুনানু আবু দাউদ*, হা: ২১৭৮; শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ, তাকী উসমানী, অনুবাদ, মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, *বিবাহ ও তালাক* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১৫খ্রি./১৪৩৬হি.), পৃ. ৭৭।)

৭২ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (London: 1992), P. 139-140.

অর্থঃ আমরা শারী'য়াতে এমন কোনো বিধান পাই না যা বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে হিযাবের আবশ্যকতার কথা বলে। বরং এটি (হিযাব) এমন একটি প্রথা যা বিভিন্ন জাতির সাথে তাদের (মুসলমানদের) মেলামেশার জন্য আরোপ করা হয়েছে। অতঃপর তারা (মুসলমানরা) এটাকে ভাল মনে করে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং (গ্রহণ করতে গিয়ে) তারা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আর তারা এটাকে (হিযাব প্রথাকে) ধর্মের পোশাক হিসেবে পরিধান করিয়েছে; যা (সাধারণ) মানুষের মাঝে ধর্মের নামে প্রচলিত (অন্যান্য) সকল কুপ্রথার মত। অথচ ধর্ম এসব থেকে (সম্পূর্ণরূপে) মুক্ত।[৭৩]

মুসলিম নারীদের প্রচলিত হিযাব ব্যবস্থা সম্পর্কে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর ভিন্ন মতামত অধ্যয়নের পর পাঠকদের মনে হয়তোবা হিযাব সম্পর্কে একটি নেতিবাচক কিংবা বিরূপ ধারণা জাগ্রত হতে পারে। হিযাব সম্পর্কিত 'আবদুহ্ এর এ ভিন্ন মত কারো মধ্যে যেন কোনো বিরূপ ধারণার উদ্রেক না করে তাই পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে পরবর্তী পরিচ্ছেদে হিযাবের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

৭৩ 'আমারাহ্, *প্রাগুক্ত*, (১৯৯১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
পবিত্র কোরআন ও হাদিসে হিযাবের যৌক্তিকতা

ইসলামে হিযাব বা পর্দা তেমন ফরজ যেমন-সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ ফরজ। বাহ্যিকভাবে বোরকা বা জিলবাব কিংবা নেকাব দ্বারা যেমন হিযাব বা পর্দা করা ফরজ তেমনি অন্তর দ্বারা খারাপ কাজের ইচ্ছা-পোষণ না করাও ফরজ। হিযাব বা পর্দা নারী জাতির ভূষণ। যতদিন পৃথিবীতে হিযাব বা পর্দা পালিত হবে ততোদিন নারী জাতি থাকবে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। সকল মহৎ গুণের মধ্যে লজ্জাশীলতা অন্যতম একটি মহৎ গুণ। আল্লাহর রাসূল (সা.) লজ্জাকে ঈমানের একটি অঙ্গ হিসেবে তুলে ধরেছেন। লজ্জা হচ্ছে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ঈমানের অনেকগুলো শাখার মধ্যে এটি অন্যতম শাখা। ষাটটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা নিয়ে ঈমান গঠিত। রাসূল (সা.) বলেন, লজ্জা ও ঈমান হচ্ছে একটি যৌথ খুঁটি। যখন তাদের একটি তুলে নেয়া হয় তখন অন্যটি অনায়াসে উঠে যায়।[৭৪] শালীনতাবোধ মূলত ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা অনুশীলকৃত। নারীদের উচিত তাদের লজ্জা নিবারণ করা এবং ঐ সব সামাজিক আচার-আচরণ মেনে চলা যা বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদ থেকে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। আর এ সব পালন করা সম্ভব, মুখমণ্ডল ও ঐ সকল সৌন্দর্যমণ্ডিত অঙ্গ যা স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ সৃষ্টিকারী তা ঢেকে রাখার মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে শালীনতার সর্বশেষ রূপ। যে কেউ এটি মেনে চললে সে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে চিরকাল আবদ্ধ থাকবে এবং সমাজে ফিতনা-ফাসাদ দূরীভূত হবে। তাই সমাজদেহকে কলুষমুক্ত রাখতে এবং অন্তরকে শয়তানী চিন্তা-ভাবনা থেকে পবিত্র রাখতে ইসলাম নারীকে পর্দার বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নির্দেশ দেন:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৭৪ *আল-মুসতাদরাক*-১/২২, আল হাকিম এটাকে সহিহ্ বলেছেন, *আল-আদাব আল-মুফরাদ*-১/৯৮৬।

অর্থ: "আর ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাঁদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে। তাঁরা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ব্যতীত তাঁদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তাঁরা যেন তাঁদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তাঁরা যেন তাঁদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁদের ব্যতীত কারও কাছে তাঁদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তাঁরা যেন তাঁদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[৭৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই প্রমাণ করে যে, একজন নারী কোনো পুরুষের (মুহাররাম ছাড়া) সামনে হিযাব পরিধান করা বাধ্যতামূলক। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দেন, "তাঁরা তাঁদের সৌন্দর্যকে যেন প্রকাশ না করে। কিন্তু যা তাঁদের থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়।"[৭৬] আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, জাহেলি যুগের ন্যায় তোমার সৌন্দর্যকে প্রদর্শন না করে নিজ ঘরে অবস্থান করো।[৭৭]

মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেন:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

অর্থ: "আর যখন তোমরা তাদের কাছে কোনো কিছু চাইবে তখন হিযাব বা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটাই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতার কারণ।[৭৮]

উল্লেখিত আয়াত শুধু নবি পরিবারের জন্য নয়, বরং সকল মুমিনদের জন্যও প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে খুব সচেতনতার সাথেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

৭৫ *আল-কোরআন*, ২৪: ৩১।
৭৬ *প্রাগুক্ত*, ৩৩: ৩১।
৭৭ *প্রাগুক্ত*, ৩৩: ৩৩।
৭৮ *প্রাগুক্ত*, ৩৩: ৫৩।

অর্থ: "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তাঁরা যেন তাঁদের চাদরের কিয়দংশ নিজের উপর টেনে নেয়, এতে তাঁদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাঁদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৭৯]

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন কোনো নারী প্রয়োজনীয় কোনো কাজে বাড়ির বাহিরে যাবে তখন তাঁদের মাথার শীর্ষস্থান থেকে মুখমণ্ডল হয়ে সারা শরীর যেন তারা জিলবাব বা হিযাব দিয়ে ঢেকে নেয়। আধুনিক পরিভাষায় যাকে হিযাব বলে। তবে তাঁরা শুধু একটা চোখ খোলা রাখতে পারে। অর্থাৎ রাস্তা দেখে পথ চলার জন্য শুধু এতোটুকু অনুমতি দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নারী জাতি গোপনীয় বস্তু।[৮০] তাই অবশ্যই নারী জাতিকে হিযাব বা পর্দা করতে হবে। মহানবী (সা.) অন্যত্র ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা গোপনীয় (লজ্জাশীল)। তাই তিনি লজ্জাশীলতা অর্থাৎ হিযাব বা পর্দাকে ভালোবাসেন।[৮১] হিযাব বা পর্দা তাক্বওয়ার পরিচায়ক। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

অর্থ: "হে বনি আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি। তোমাদের দেহের আবরণ এবং সাজসজ্জার বস্তু হিসেবে এবং পরহেযগারির এটি সর্বোত্তম মাধ্যম।"[৮২]

মহানবি (সা.) আরও বলেন, তোমাদের স্ত্রীবর্গের মধ্যে উত্তম হলো তাঁরা যারা স্নেহপরায়ণ, অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী বিনম্র, সংবেদনশীল, কেননা তাঁরা আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো তারা যারা প্রকাশ্যে চলাফেরা করে ঘোড়ার মতো চটপটে এবং

৭৯ *প্রাগুক্ত*, ৩৩: ৫৯।

৮০ *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ১৭৭৩; গ্রন্থকার হাদিসটিকে সহিহ্ এবং হাসান বলে মত দিয়েছেন।

৮১ *সুনানে কুবরা বায়হাকি*, হাদিস নং ১৩৫৫৯।

৮২ *আল-কোরআন*, ৭: ২৬।

তারাই হলো মুনাফিক। তাদের মধ্যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে যদি কেউ কালো কাকের মতো হয়ে যায়।[৮৩]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

অর্থ: "বিশ্বাসী পুরুষদেরকে বলে দিন যে তাঁরা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে।"[৮৪]

অনুরূপভাবে নারীদের সম্পর্কে তিনি অপর আয়াতে বলেন: হে নবী! ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে অবনত করে।[৮৫]

অপর আয়াতে পুরুষদের উদ্দ্যেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা লজ্জাস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করো।[৮৬] এ বিষয়ে তিনি নারীদেরকেও সতর্ক করে বলেন, তাঁরা যেন তাঁদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।[৮৭]

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে ওড়না দিয়ে বক্ষস্থান ও ঘাড় ঢেকে রাখার কথা বলা হয়েছে তার উৎপত্তি মূলত মাথার উপর থেকে। অর্থাৎ মাথার উপর থেকে মুখমণ্ডল হয়ে ঘাড় ও বক্ষদেশ আবৃত করে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এ বিষয়টি খুব ভালোভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায়। যেমন: তিনি বলেন, একদল আরোহী আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন আমরা (স্ত্রীরা) রাসূল (সা.) এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। যখন তারা আমাদের নিকটবর্তী হলেন, তখন আমরা প্রত্যেকেই মাথার উপর থেকে জিলবাব নামিয়ে ফেললাম। যা মুখমণ্ডল হয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে দিল। যখন আরোহীরা ফিরে গেল, তখন আমরা আমাদের চেহারা অনাবৃত করলাম।[৮৮] জিলবাব হচ্ছে একটা বড় লম্বা পোশাক যে কোনো নারী এটা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতে পারে এবং এটা এমন একটা বৃহৎ বা লম্বা আবরণ হিসেবে পরিচিত; যা একজন নারী এটি তাঁর পোশাকের উপর রাখতে

৮৩ *সুনানে বায়হাকি*, হাদিস নং ১৩৪৭৮।
৮৪ *আল-কোরআন*, ২৪: ৩০।
৮৫ *প্রাগুক্ত*, ২৪: ৩১।
৮৬ *প্রাগুক্ত*, ২৪: ৩০।
৮৭ *প্রাগুক্ত*, ২৪: ৩১।
৮৮ ইমাম আহমদ ৬/৩০, *আবু দাউদ*, হাদিস নং ১৮৩৩, *ইবনে মাযাহ*, হাদিস নং ২৯৩৫ ।

পারে। আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে আদেশ করেছেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের চেহারার উপর হিযাব বা পর্দা টেনে নেয়। কারণ এটা দৃশ্যমান রাখলে খুব সহজেই নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখা যায়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন, এটাই তাঁদের জন্য ভালো হবে এবং তাঁদের চেনা খুব সহজ হতে হবে। তাই তাদের বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা সকল মুসলিম নারীর উপর হিযাবের আইনগত বাধ্যবাধকতা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাই এর প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব-তাৎপর্য, মান-মর্যাদা হ্রাস করা কিংবা এ প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও উদারনীতি অবলম্বন করা মোটেও উচিত হবে না। হিযাব বা পর্দা এমন একটা ফরজ ইবাদত; যা নারীর সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। অধিকন্তু এটি তাঁর চেহারা, হাতসমূহ ও সমস্ত শরীর সুরক্ষিত রাখবে।

মুসলিম নারীদের হিযাব বা পর্দা পালনের মধ্যে অনেক উপকারিতা নিহিত রয়েছে। যে সমাজের নারীরা পর্দায় থাকে সে সমাজ আশা করতে পারে একটি নিদাগ পবিত্র বিধৌত আলোকিত মা জাতির। যে জাতি সমাজকে উপহার দিবে একটি পরিচ্ছন্ন আলোকময় নতুন প্রজন্ম। যাদের পরশে সোনা হয়ে উঠবে সমাজ সভ্যতা ও দেশ। সভ্য সতী নারী যে সমাজে নেই সভ্য প্রজন্ম সে সমাজ পাবে কোথায়? তাছাড়া সভ্য প্রজন্ম ছাড়া কি কোন সমাজ সভ্য হতে পারে? [৮৯] পর্দা নারীদের পদ ও মর্যাদাকে সুদৃঢ় করে, সম্মান বাড়িয়ে দেয় এবং তাঁদের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে। এতে করে গোটা সমাজ অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পায়। আর এটি অনৈতিকতা, দুর্নীতি ও লাম্পট্যের সমস্ত পথকে রুদ্ধ করে দেয়।

৮৯ লেখকমণ্ডলী, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি./১৪৩০হি.), পৃ. ৩৯৪।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজ সংস্কারে মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ এর শিক্ষা আন্দোলন

১ম পরিচ্ছেদ

মিশরে শিক্ষা সংস্কার ও সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট

২য় পরিচ্ছেদ

আল-আযহার ও মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ এর সংস্কার আন্দোলন

৩য় পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান শিক্ষা চর্চায় মুহাম্মদ ‘আবদুহ্

প্রথম পরিচ্ছেদ
মিশরে শিক্ষা সংস্কার ও সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করেন। ফরাসিদের এই মিশর আক্রমণ কোনো অপরিকল্পিত বিষয় ছিল না। প্রাচ্যকে আয়ত্ত করে গোটা বিশ্বে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করাই ছিল নেপোলিয়নের মিশর দখলের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া ভারত উপমহাদেশে নব প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উক্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু লন্ডন থেকে বিচ্ছিন্ন করাই ছিল মিশর দখলের অন্যতম উদ্দেশ্য। মিশর দখল করার পরপরই নেপোলিয় মিশরের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার এবং লোকাচারের সাথে একাকার হয়ে যান। ফলে খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মিশরবাসীর হৃদয় জয় করে নেন। তিনি মিশরীয়দের স্ব স্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালনে উৎসাহ দান করেন। নেপোলিয়নের সকল পদক্ষেপ মিশরীয়দের মাঝে তার সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণার জন্ম দেয়।

নেপোলিয়নের মিশর আগমনের হলে ফরাসি সামরিক পদ্ধতি এবং শিক্ষার প্রতি মিশরে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সুশাসন, রাষ্ট্র গঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা, দেশের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও অগ্রগতির বিষয়ে মিশরীয় নাগরিকদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা দ্বারা তারা ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হন। নেপোলিয়ন তাঁর সুসজ্জিত নৌবহরে শুধু আগ্নেয়াস্ত্র ও সৈনিক নিয়ে আসেননি; ফ্রান্সের উদীয়মান শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণকে তিনি তাঁর সহচর হিসেবে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। ফলে রাজ্য জয়, বিদ্রোহ দমন এবং নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে সমান উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে মিশরে শুরু হয় নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারমূলক কর্মসূচিও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।[১] এসকল কর্মকাণ্ড অবলোকন করে মিশরীয়রা তাদের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠে।

১ মুসা আনসারী, *আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৭

ফরাসি বিপ্লব[২] এর অল্পকিছুকাল পরেই নেপোলিয়নের এ মিশর অভিযান মিশরীয়দেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । বিশেষ করে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা প্রবলভাবে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয় এবং মিশরীয়রা নূতনভাবে জাতীয়তাবাদী[৩] চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কেননা ১৮০১ সালে ইংরেজদের সাথে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির মাধ্যমে ফরাসি বাহিনী মিশর ত্যাগ করলেও এ এলাকার সাথে ফ্রান্সের একটি সংস্কৃতিক যোগাযোগ বজায় থাকে। নেপোলিয়ন কায়রোতে একটি বিজ্ঞান

---

২ **ফরাসি বিপ্লব (French Revolution):** এটি ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখ ছিলেন এ বিপ্লবের দার্শনিক অগ্রদূত। ধনিকশ্রেণি ছিল এ বিপ্লবের নায়ক এবং অত্যাচারিত কৃষকেরা ছিল মিত্রবাহিনী। ১৭৮৯ সালে রাজা ষোড়শ লুই প্যারিসে অভিজাত শ্রেণি, পুরোহিত ও মধ্যশ্রেণির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। প্রতিনিধিরা শাসনসংস্কার দাবি করলে ক্রুদ্ধ রাজা সম্মেলন নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু গণ-প্রতিনিধিরা রাজার নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে একটি গণপরিষদ গঠন করেন। ফলে ভীত রাজা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। অতঃপর রাজা তাঁর অনুগত বাহিনীকে প্যারিসে আনার চেষ্টা করলে ক্রুদ্ধ জনসাধারণ ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসের কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ও কারাগার দখল করে সমস্ত বন্দিকে মুক্ত করে দেয়। শুরু হয়ে যায় ফরাসি বিপ্লব। অবিলম্বে এ বিপ্লব সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটে। এদিকে গণপরিষদ ইতিহাস বিখ্যাত 'মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' রচনা করে। এতে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে নাকচ করে দেয়া হয়। ভার্সাইতে অবস্থানকারী রাজা এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলে ডান্টন বা দাঁতোঁ এর নেতৃত্বে জনগণ ভার্সাই আক্রমণ করে এবং রাজাকে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে। রাজা পুনরায় সামরিক শক্তি সংহত করতে উদ্যত হলে রাজাকে বন্দি করা হয়। ১৭৯২ সালে অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার রাজা বন্দি ফরাসি রাজাকে উদ্ধারের উদ্যোগ নেন। এমতাবস্থায় গণপরিষদ রাজা ষোড়শ লুইকে সিংহাসনচ্যুত করে জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং ফ্রান্সকে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে। ১৭৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে গণদাবির প্রেক্ষিতে গিলোটিনে রাজা ষোড়শ লুই এর শিরচ্ছেদ করা হয়। অতঃপর ক্ষমতাসীন গিরোঁদি (Girondins) দল বিপ্লব বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং জেকোবিঁরা (Jacobins) ক্ষমতা দখল করে নেয়। এরা সামন্তবাদের ধ্বংসাবশেষও নিশ্চিত করে দেয় এবং কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দেয়। রোবস্পেয়ার (Robspeare) এর নেতৃত্বে বিপ্লব পরিচালনার জন্য গঠিত হয় 'জননিরাপত্তা কমিটি'। এ সময় দলের দক্ষিণপন্থিরা সন্ত্রাসবাদের অবসান এবং ক্রুদ্ধরা (Enragers) আরও বেশি সন্ত্রাস দাবি করে। ক্রুদ্ধরা কোণঠাসা হয়ে পড়লে ১৭৯৪ সালে এর নায়ক হেবার্টকেও গিলোটিন শিরচ্ছেদ করা হয়। অন্যদিকে এপ্রিল মাসে চক্রান্তের অভিযোগে দাঁতোঁকেও (Danton) একইভাবে হত্যা করা হয়। এ সময় বিপ্লবের নায়ক রোবস্পেয়ার দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করলে তাঁকেও গিলোটিনে শিরচ্ছেদ করা হয়। এ সুযোগে ধনীদের সমর্থনে গিরোঁদরা পুনরায় ক্ষমতাদখল করে সর্বত্র শ্বেতসন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয় এবং রোবস্পেয়ারপন্থিদের পাইকারিভাবে হত্যা করতে থাকে। এ সময়ে বেবেউফ এর নেতৃত্বে ফ্রান্সের শ্রমিকরা শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে (১৭৯৬ খ্রি.)। এটাই বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রক্তের বন্যায় এ বিদ্রোহ ডুবে যায় এবং বোনাপার্ট ক্ষমতা দখল করেন। সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তিনি ফরাসি বিপ্লবের মূলবাণী মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তির পবিত্র অধিকার এর ধ্বনি ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। ১৮২২ সালে নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করে পরাজিত হন। ১৮১৫ সালে ওয়াটালুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র ইউরোপ থেকে অচিরেই সামন্তবাদের মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। [দ্র. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. পৃ. ২৭৬।]

৩ **জাতীয়তাবাদ:** জাতীয়তাবাদ বা Nationalism হচ্ছে নিজেকে কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত করা, সে জাতির ইতিহাস, ঐহিত্য, সংস্কৃতি, বিকাশ, অগ্রগতি, ভৌগলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতির ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, স্বকীয়তা রক্ষা ও বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে। আর এ চেতনায় যারা বিশ্বাসী তাদেরকেই জাতীয়তাবাদী বা Nationalist বলে। [দ্র. হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪।]

একাডেমি স্থাপন করেন। তার সময়ে ফরাসি ও ইউরোপীয় অধ্যাপকদের মিশরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়। মিশরের মেধাবী শিক্ষার্থীদের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও অস্ট্রেলিয়াসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। নেপোলিয়নের আগমনের ফলে মিশরের শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিন্তা-গবেষণা ও শিল্প-সভ্যতায় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়;যা ভবিষ্যতে মিশরকে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রের পথে আরও বহুদূর এগিয়ে দেয়।

ফরাসি দখলদারিত্ব থেকে মিশরকে মুক্ত করে ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ আলী পাশা[৪] মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিদ্বান ছিলেন না কিন্তু তার শাসনামলের শুরু থেকেই তিনি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তিনি শিক্ষা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিবিদদের তিনি মিশরে আমন্ত্রণ জানান। মিশর থেকেও বিভিন্ন শিক্ষা মিশন ইউরোপে প্রেরণ করেন। এই সময়ে ইতালি, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় যেহেতু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাই তিনি 'আরবি ও তুর্কি ভাষার মৌলিক গ্রন্থ সমূহ অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন । এমনকি সেই সময়ে তিনি মিশরে সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দেশের প্রতিরক্ষার জন্য পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী এবং নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিবিদদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দান করেন। আর যে সকল মিশরীয় ছাত্র বিদেশে পড়াশোনা করতো তাদেরকে তিনি দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রদান করেন।

এভাবে তিনি দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য,বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রতিরক্ষাসহ মিশরের সামগ্রিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নয়ন সাধন করেন। মোহাম্মদ আলী পাশা পাশ্চাত্যের অনুকরণে মিশরে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বহু

৪ Ibid, *Encyclopaedia Britannica,* p. 85; Hitty, *History,* পৃ. ৭২২-৭২৪; প্রাগুক্ত, *বাংলা বিশ্বকোষ*, পৃ. ৯৫-৯৬।

স্কুল-কলেজ, সামরিক ও কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮১৬ সালে তিনি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও ১৮২৭ সালে একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন । উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়াতে শিক্ষার্থী প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি হাজার হাজার মিশরীয় তরুণকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। শিক্ষিত এতরুণরা আধুনিক সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন ধারণা নিয়ে মিশরে ফিরে আসে। এদের এই প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা ধীরে ধীরে মিশরীয় সমাজে বিস্তার লাভ করে।[৫]

মোহাম্মদ আলী পাশা কর্তৃক ১৮১৬ সালে কন্সট্যান্টিপোলে এবং ১৮২২ সালে কায়রোতে 'আরবি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হলে মিশরের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় আরও কিছুটা উন্নয়ন ঘটে। এ দুটি ছাপাখানা হতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ হতে থাকে।[৬] মুহাম্মদ আলী পাশা সর্বপ্রথম ১৮২২ সালে মিশরের বুলাকে 'আরবি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিকাশে এ সকল ছাপাখানার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে ছাপাখানা স্থাপন, ভাষাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং অনুবাদকর্ম সম্পাদন ইত্যাদি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান মিশরকে ইউরোপের ন্যায় উন্নত না করলেও শিক্ষা পদ্ধতি, একাডেমিক শৃঙ্খলা, আধুনিকায়ন এবং বিশ্ব সামাজিকীকরণের পথে মিশরকে বহুদূর এগিয়ে নিয়েছিল। বিশেষ করে আধুনিক কালের নূতন বিশ্বব্যবস্থার সাথে মিশরকে একীভূত করতে এ প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বয়কের ভূমিকা রেখেছিল। ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে 'খেদিভিয়াল জার্নাল' নামে একটি সাময়িকী তুর্কি ও 'আরবি ভাষায় প্রকাশিত হয়। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট বিতরণের জন্য এর শতাধিক কপি ছাপা হতো। এ জার্নালের বিষয়বস্তু ছিল রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ডিক্রির বিবরণ এবং পাশা গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তাবলি। এর পরের বছর ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিশরিয়্যা'[৭] নামের আরও একটি জার্নাল প্রকাশ পায়। এতে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলির আরও বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হতো। এই সময়ে মুদ্রণ শিল্পের অনুবাদের ফলে আরবি ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা আরও উৎকর্ষতা লাভ করতে থাকে।

---

৫ এম এ কাউসার, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক)*, (ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি., ১ম সং.,পৃ. ৩২

৬ Joel car Michael,*TheShaping of the Arabs: Study in Ethnic Identity* (London: Allen & Unwin,1967), p. 287

৭ *Ibid,* P.J. Vatikiotis, *The History of Egypt*, P. 99

মিশরীয়দের মাতৃভাষা আরবিতে বিভিন্ন গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এই সময়ে মিশরে একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে উঠে; যারা মনে-প্রাণে সেক্যুলার এবং ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি ছিলো অনাগ্রহশীল।

মিশরের তৎকালীন শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী পাশা ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে সালে আল-আযহারে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করার লক্ষ্যে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বানদের একটি প্রতিনিধি দল প্যারিসে প্রেরণ করেন। যদিও মুহম্মদ 'আলীর আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা সফল হতে অনেক সময় গড়িয়েছে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম মনীষীগণ আল-আযহারের শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা সেখানে আধুনিক জ্ঞান ও গণিত চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অতঃপর মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মুসলিম উম্মার প্রয়োজন অনুযায়ি আল-আযহারে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। পরিশেষে মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল 'আবদ আল-নাসিরের আমলে আল-আযহারে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়। উল্লেখ্য যে. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে।[৮]

মোহাম্মদ আলী পাশার মৃত্যুর পর তাঁর নাতি ইসমাইল পাশা (১৮৬৩-১৮৭৪) ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তিনি বিদ্যালয় পরিষদ পুনর্জীবিত ও শক্তিশালী করেন। এ পরিষদটি পরবর্তীসময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়। সেই সময় ইসমাইল পাশা মিশরে গবেষণাগার, বিভিন্ন সমিতি, গ্রন্থাগার, একাডেমি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। আল-আযহারের[৯] শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার অনয়নের জন্য তিনি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমন: আল-আযহারের পাঠ্যসূচি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে শাইখ আল-মেহেদির নেতৃত্বে আল-আযহার সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়া হয়। মিশরের সামাজিক উন্নয়নে ইসমাইল পাশার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো; তিনি নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকরী পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। কেননা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মিশরে নারী শিক্ষার বিষয়টি ছিল

---

৮ যায়্যাত, তারীখ. পৃ. ৪২১-৪২৩; ময়দান, তারীখ, ৪/১৬-১৮; ফাখূরী, তারীখ. পৃ. ৯০৫-৯০৬। কাউকান, আ'লাম. পৃ. ২৩৪।

৯ আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২১-৪২৩; জুরযী যায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৮; হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০৫-৯০৬।

অপরিচিত। মোহাম্মদ আলী পাশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধাত্রীবিদ্যা বিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের নারী শিক্ষার্থীগণছিল সুদান ও ইথিওপিয়া থেকে আগত ভিনদেশী ছাত্রী। মিশরে ঐ সময়ে নারীরা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বহুদূরে। ধনী বা অভিজাত পরিবারের নারীদের গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হতো। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ইব্রাহিম পাশা তার স্ত্রী জাসেম আফেত হানুম এর মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টি 'সুফিয়া বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত ছিল। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভের কারণে মিশরসহ সমগ্র আরবে নারী শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি পায়; যা মিশরের সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ইব্রাহিম পাশার শাসনামলেই মিশরের পার্শ্ববর্তী দেশ সিরিয়া ও লেবাননে বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। এভাবে প্রতিনিয়ত মিশরের পুরনো সমাজ কাঠামো এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙতে থাকে, আর গড়তে থাকে ইউরোপীয়দের ছাঁচে নতুন ধারার জীবনযাত্রা ও সমাজ-সংস্কৃতি। শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে মিশরের সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। সূচিত হয় সমাজ জীবনের আধুনিক পরিপ্রেক্ষিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আল-আযহার ও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সংস্কার আন্দেলন

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর মধ্যকার শিক্ষা সংস্কার ভাবনা শুরু হয়েছিল তান্তার আহমাদিয়া মসজিদ এবং কায়রোর জামে আল-আযহার হতে। রক্ষণশীল সিলেবাসের সাথে বিশ্বমানের আধুনিক সিলেবাসের অসমতা এবং অতিমাত্রায় সংঘর্ষের ফলে অচল পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন ও পরিমার্জন আনতে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মনে-প্রাণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর জীবনের শুরুর দিকে এমন এক শিক্ষা পদ্ধতির মুখোমুখি হন যেখানে শিক্ষার্থীদের কোনোরূপ সমালোচনা, বিশ্লেষণ এবং উপলব্ধি ছাড়াই পাঠ্যপুস্তক পাঠদান করা হতো এবং পাঠ্যপুস্তকের ভাষ্য, মন্তব্যসমূহের টীকা-টিপ্পনী এবং টিকা-টিপ্পনীর উপর অধিকতর টিকা-টিপ্পনী পড়তে হতো।[১০] তিনি শ্রেণি পাঠদান, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির পদ্ধতিকরণ এবংপাশ্চাত্য শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত রীতির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাছাড়া উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং প্রাসঙ্গিক নীতি-নৈতিকতা সম্বলিত অনুশাসন, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় সাহিত্যকে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণে তিনি আগ্রহী ছিলেন। কারণ মুহাম্মদ 'আবদুহ্ জানতেন যে, মিশরীয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োজন ছিল; তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের সমাজকে অবশ্যই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে আধুনিক করে তুলতে হবে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বিশ্বাস করতেন যে, মিশরে বিপ্লবের চেয়ে বরং সংস্কারই বেশি প্রয়োজন। গুরু আফগানীর তুলনায় গভীর চিন্তাবিদ হওয়ায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিকায়ন ও স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত কোনো পথ নেই। তাই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ আল-আযহারসহ মিশরের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় জরুরি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর দৃষ্টিতে মিশরের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারা চলমান রয়েছে; যা মিশর জাতিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত করছে। আর এ ভিন্ন শিক্ষাধারা সমাজে প্রতিনিয়ত এক অনতিক্রম্য বৈষম্য ও অনৈক্য সৃষ্টি করে

---

১০ Amin, Osman.*MuhammadAbduh* (Washington DC: American Council of Learned Societies, 1953), p. 03

যাচ্ছে। যেমন: এক. এখনও রক্ষণশীল রীতিনীতিতে পরিচালিত ধর্মীয় স্কুল ও মাদ্রাসায় তরুণ মুসলিমরা স্বাধীন চিন্তাভাবনা থেকে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। দুই. ঔপনিবেশিক উদ্যোগের সমর্থক ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি স্কুলগুলোতে তরুণ মুসলিমরা দেশ ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তিন. সরকারি স্কুলগুলোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ; যেখানে প্রতিনিয়ত ইউরোপীয় স্কুলগুলোর অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণ করা হয়, আর এখানে কোনো ধর্মীয় শিক্ষাও দেয়া হয় না।[১১]

এ সকল প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আল-আযহারে শিক্ষা সংস্কার বাস্তবায়ন এবং পরিবর্তন আনয়নে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কৌশলগত বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। যেমন: তিনি গতানুগতিক মুখস্থ সর্বস্ব পুঁথিগত বিদ্যার বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। কেননা তাঁর নিজ শিক্ষাজীবনেই গতানুগতিক এ পদ্ধতিতে পাঠ্য মুখস্ত করে শেখার সাথে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা হয়। এ শিক্ষা পদ্ধতিতে যার জন্য পাঠ্যক্রম তৈরী করা হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা সাজানো হয় তাকে বোঝার জন্য কোনো সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়না। মিশরীয় শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে তাঁর এ সকল প্রতিশ্রুতিতে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন বদ্ধপরিকর। মিশরে ইউরোপীয় প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর এক চিঠিতে তিনি ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত মিশর সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত তৎকালীন শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম, টিউশন ফি, পঠিত বিষয় এবং শিক্ষাদানের উপাদনগুলির পুরো কাঠামোকে রূপান্তর করার একটা কার্যকর প্রচেষ্টা চালান। অধিকন্তু বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নত করার বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করেন এবং শিক্ষকদের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য জোর তাগিদ দেন। তিনি আল-আযহার বিশ্বদ্যিালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি মিশরে একটি শক্তিশালী উদার রাষ্ট্র গঠনে ব্রিটিশদের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন। তৎকালীন মিশরীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ছিল যে, মিশরীয় সরকার বারো মিলিয়ন পাউন্ডের আয়ের বাইরে শিক্ষার জন্য মাত্র দুই লাখ মিশরীয় পাউন্ড ব্যয় করে। এটি বিদ্যালয়ের ফি এমনভাবে বাড়িয়ে তোলে; যেখানে শিক্ষা এমন বিলাসবহুল হয়ে উঠে যা গুটি কয়েক ধনী ঘরের

---

১১ ক্যারেন আর্মস্ট্রং (অনুবাদ: শওকত হোসেন), *মৌলবাদের ইতিহাস* (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ২৩৫।

অলঙ্কারে পরিগণিত হয়। তৎকালীন মিশরে উচ্চ শিক্ষার জন্য কেবল তিন ধরনের স্কুল ছিল। যেমন: আইন, মেডিসিন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল। মানব জ্ঞানের অন্যান্য উপাদানগুলি মিশরীয়দের কাছে খুব পরিকল্পিতভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল; যার কিছুটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের নিকট হালকাভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। তৎকালীন সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনাগুলি ছিল নিম্নরূপ: প্রথমত এটি এমন মনে হচ্ছিল যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে এমনভাবে সহায়তা প্রদান করা; যেখানে কেবল পড়া এবং লেখার শিক্ষা দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, দেশে যতটা সম্ভব শিক্ষার বিস্তার হ্রাস করা। তৃতীয়ত, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাকে খুব সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ।[১২]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সংস্কার[১৩] নীতিগুলি সমাজের আযহারপন্থী 'উলামা কিংবা শাইখ শ্রেণির নিকট তেমনটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেনি। কারণ তাঁরা মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সংস্কার নীতির চরম বিরোধিতা করেছিল। এ সকল বিরূদ্ধবাদীরা হচ্ছে তরুণ ইফেন্দি এবং জনসংখ্যার ইউরোপীয় অংশ; যারা ছিলেন উঁচু স্তরের আইন পেশার সাথে যুক্ত। তাছাড়া উচ্চতর সরকারি বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণ এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা করে।[১৪] আল-আযহারে শিক্ষিত পেশাদারদের মধ্যে যারা পশ্চিমের কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকেই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর আধুনিক ধারণা ও সংস্কারনীতিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। আল-আযহার সংস্কারে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অবদান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয়। তাঁর

---

১২ Khoury, Nabil Abdo, *Islam and Modernization in the Middle East: Muhammad Abduh, An Ideology of Development*(ph.D.Thesis, State University of New York, Albany: 1976), P.170-172

১৩ **সংস্কার:** অবস্থিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বহাল রেখে তার কিছু কিছু দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডকে বলে সংস্কার (Reform)। যেমন: শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে বহাল রেখে প্রায়শ এ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার উদ্দেশ্যে সরকার স্বাস্থ্য, স্ব-কর্মসংস্থান, কুটির শিল্প ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক ইস্যুতে যেসব পদক্ষেপ নেয় বা আইন পাশ করে সেগুলোকেই বলে সংস্কার। বিপ্লববিরোধীরা মনে করেন যে, সংস্কারের মাধ্যমেই সমাজের দোষ-ত্রুটিসমূহ দূর করে সমাজকে সুন্দর করা সম্ভবপর। এরূপ মতবাদকে বলা হয় সংস্কারবাদ (Reformism)| অপরদিকে বিপ্লববাদীরা মনে করেন যে, মলম লাগিয়ে যেমন সিফিলিসের চিকিৎসা সম্ভপর নয়, তেমনি সংস্কারের মাধ্যমেও কোনো শোষণমূলক বা বৈষম্যমূলক সমাজ থেকে শোষণ বা বৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন যে, দেশি-বিদেশি শোষক শ্রেণি বস্তুত জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার জন্য, বিপ্লবী ধারাকে স্তিমিত করার জন্য এবং শোষণ ও বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্যই বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫।]

১৪ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *তারীখ আল-উসতায আল-ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: ১৯৩১ খ্রি.), ১ম খণ্ড,পৃ. ১৩৭।

চিন্তাধারা, লেখনী, বাগ্মীতা ও কর্মের মধ্যেই তা প্রস্ফুটিত। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অদম্য প্রচেষ্টা; যা তিনি আল-আযহার সংস্কারে, শিক্ষাদানে আর তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন সে পরিধির মধ্যেই তিনি তা উৎসর্গ করেছিলেন।[১৫]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ আল-আযহারকে গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী 'উলামা এবং বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে লালিত রক্ষণশীল উপাদানের প্রভাব থেকে উদারীকরণের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তাছাড়া তিনি ধর্মীয় পাঠ্যক্রম, বিচারিক ফতোয়া, প্রকাশনা এবং শিক্ষার মৌলিক পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এক নজিরবিহীন পুনর্জাগরণ কর্মসূচী উপস্থাপন করেন। তাঁর শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মিশরের সমাজ জীবনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে আধুনিক সময়ের সাথে সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে চলমান রাখা। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার একটি নিরাপদ সমাপ্তির মাধ্যমে মিশরের অভ্যন্তরে প্রকৃত সংস্কারের প্রত্যাশী ছিলেন। আর এ সংস্কারের প্রধান মাধ্যম হিসেবে তিনি শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর এ সংস্কার প্রচেষ্টা মিশরে পরিবর্তনের দ্বারকে আরও উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং এ পরিবর্তন উন্নয়নকে উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত করেছে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ প্রবর্তিত আধুনিক চিন্তাধারা সম্ভাব্য অনেক সংস্কারের জন্য নতুন পথ উন্মুক্ত করেছে, যা সাফল্যের সাথে সমাজের প্রতিটি স্তরকে প্রভাবিত করেছে। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর আহ্বান অনেক মহল থেকে সাড়া পেয়েছে এবং দেশীয় জীবন ধারাকে বহু দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর চিন্তাধারা জাতীয় চেতনা গঠনে এবং কার্যকর সামাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরীর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের পুর্নজাগরণ ও সংস্কারে গভীর অবদান রেখেছিল।[৯]

সর্বোপরি এ ধরনের প্রচেষ্টা মিশরের সামাজিক গোষ্ঠী ও দলগুলির শক্তিশালী বিকাশ ঘটায়; যা সমাজ বিপ্লবের আধুনিকায়নে মিশরকে আরও গতিশীল হিসেবে ধাবিত করে। ধর্মীয় কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে, সামাজিক সমস্যা নির্মূল করতে, নারী অধিকার সুরক্ষা, আধুনিক

---

১৫ Charles C. Adams, *Mohammad Abduh: the Reformer* (Moslem. World, xix, Jan. 1929), P. 207

নবজাগরণ[১৬] এবং 'আরবি ভাষার উন্নয়নে এ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সামাজিক উন্নয়নের এ সকল সূচক ছাড়াও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ত্বরান্বিতকরণ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ লাভ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। কেননা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, মিশরসহ গোটা বিশ্বের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন আনয়নের জন্য শুরুতেই আল-আযহার সংস্কারের বিকল্প কোনো পথ নেই। তাই তিনি আল-আযহার সংস্কারের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী ভিন্ন শিক্ষা ধারা, কল্যাণ গোষ্ঠী, কল্যাণমূলক সমাজ কাঠামো এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণা ও জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা-সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে এবং আল-আযহারের শিক্ষামূলক রূপরেখা ও পরিকল্পনায় সফল অগ্রগতির ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সূচিত দীর্ঘ শিক্ষা সংস্কার পরিক্রমায় আল-আযহারের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি ইজতিহাদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার, মুসলিম গবেষকদের শাণিত বৌদ্ধিক দক্ষতা

---

১৬ **নবজাগরণ:** Renaissance বা পুনরুজ্জীবন। প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত এই আন্দোলন সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সকল দিকে এক অভাবনীয় বিকাশের সূচনা করে। মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ নবজাগরণ বা রেনেঁসা আন্দোলন ছিল সামন্তবাদ ও তার অবশেষসমূহকে উচ্ছেদ করে তৎকালীন বিচারে প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশের এক সর্বব্যাপী আন্দোলন। মানব-ইতিহাসের এ বৃহত্তম সাংস্কৃতিক আন্দোলন কূপমণ্ডূকতার প্রাচীর ভেঙে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও চিন্তাকে মুক্তি প্রদান করে। রেনেঁসা প্রথম শুরু হয় ইতালিতে। পরে তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইতালির দান্তে, বোকাসিও, ম্যাকিয়াভেলি, ফ্রান্সের রেবেলাই, মন্টে, স্পেনের সেরভন্টিস, ইংল্যান্ডের চসার, স্যার টমাস মুর, ফ্রান্সিস বেকন, হল্যান্ডের ইরেসমাস প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকারদের সাহিত্যিক অবদান এবং র‍্যাফায়েল, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলা প্রমুখের শিল্পকর্ম ইত্যাদিই ছিল নবজগরণের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার। ১৪৪৩ সালে জার্মানিতে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন এ প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করে। রেনেঁসা প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত যুগান্তরকারী বিষয়সমূহ সংঘটিত হয়: ১. মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার, দিকনির্ণয় যন্ত্রের উদ্ভাবন, ডাঃ উইলিয়াম হার্ভে কর্তৃক দেহের রক্তসঞ্চালন পদ্ধতি উদঘাটন, কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার, ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার, ম্যাগিলান কর্তৃক পৃথিবী পরিভ্রমণের মাধ্যমে পৃথিবীর গোলাকৃতি প্রমাণিত হওয়াসহ বিভিন্ন আবিষ্কার বিশ্বপ্রকৃতি ও জাগতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মানুষের এ যাবৎকালীন লালিত চিন্তাধারাকেই আমূল পালটে দেয়। ফলে মানুষের চিন্তার দিগন্ত লাভ করে এক অভাবিতপূর্ব বিশালত্ব। ২. রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে আধুনিক জাতীয়তার উদ্ভব ঘটে এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তপ্রথার ধ্বংস ও পুঁজিবাদের বিকাশ সূচিত হয়। ৩. ধর্মের ক্ষেত্রে চার্চের সর্বব্যাপী প্রভাব ধ্বংস হয়, ব্যক্তি স্বাধীনতার উদ্ভব ঘটে এবং ধর্মের বিপুল সংস্কার সাধিত হয়। ৪. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আটলান্টিক মহাসাগর নয়া গুরুত্ব লাভ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে এবং পুঁজির দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। ৫. সকল দিক থেকে মধ্যযুগীয়তার অবসান ও আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। কালক্রমে এ নবজাগরণ বা রেনেঁসার ঢেউ ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিশ্বের সকল অঞ্চল ও সকল জাতিকেই কমবেশি স্পর্শ করে। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২]

ও নৈপুণ্য পুনরুদ্ধার এবং আধুনিককালে ইসলামী বিশ্ব দর্শনকে উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে তিনি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আঠারো ও উনিশ শতকে মুসলমানরা যখন পাশ্চাত্যের সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে; তখন থেকেই হঠাৎ করে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে পুরোপুরি পশ্চাদপদতা এবং দুর্বলতার উপলব্ধি ঘটে। এটি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক ধরণের বৌদ্ধিক সংকট তৈরি করেছিল।[১৭] মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মিশরীয় জীবন ধারার সকল দিকের সংস্কার সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি অনুভব করেছিলেন যে, এটি অর্জনের সঠিক উপায় হচ্ছে শিক্ষা।[১৮]

তিনি একটি ভালো ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে ছিলেন যা একটি শিশুর নৈতিকতা এবং বিজ্ঞান শিক্ষাকে জোরদার করবে; ফলে শিশুর যৌক্তিক দক্ষতা লালনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তাঁর নিবন্ধমালাতে তিনি ধনিক শ্রেণির বিলাসবহুল জীবন, দুর্নীতি ও কুসংস্কারের সমালোচনা করেছেন। তিনি অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি আল-আযহারের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারী সকলের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন। সর্বোপরি আল-আযহারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান; বিশেষ করে নিজ ধর্ম সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণে যুগে যুগে তারা অন্যায় শাসকদের দুঃশাসনের যাতাকলে প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হচ্ছে।

এক সময় আল-আযহার ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ইসলামী শিক্ষার এক অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। শত বছর ধরে আল-আযহার মিশরের শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। শহর ও গ্রাম জুড়ে

---

১৭ Aasia Yusuf, *Islam and Modrnity: Remembering the contributions of Muhammad Abduh (1849-1905)* Islam and Civilizational Renewal, vol. 3. No.2, p. 364

১৮ Muhammad Abduh, laws should change in Accordance with the conditions of Nations, quoted in charles kurzman, ed. Modernist Islam: 1840-1940, Oxford University press, 2002, p. 54

ছিল কুত্তাব[১৯] অর্থাৎ কোরআনি বিদ্যালয়। এগুলো আল-আযহারের সার্বিক দিকনির্দেশনা ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। এর অধিকাংশই বিভিন্ন মসজিদের সাথে যুক্ত ছিল। আর এ সকল বিদ্যালয়ে প্রাথমিক গণিত এবং পড়া-লেখার কলা-কৌশল শেখানো হতো। এগুলোর প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের পবিত্র কোরআনের হাফিয হিসেবে তৈরী করা । ১৭৯৮ সালে মিশর ইউরোপীয় আগ্রাসনের শিকার হয়; ফলে মিশরের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এর পরবর্তী আট দশকের মধ্যে মিশরের পুরনো সমাজ কাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং ইউরোপের ছাঁচে গড়া জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি এখানে গড়তে থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে এতো পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও মিশরের প্রধান বিদ্যাপীঠ আল-আযহার পূর্বের মতোই মধ্যযুগীয় সেকেলে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই পড়ে থাকে। ইউরোপের রেনেসাঁ কিংবা সংস্কার কোনোটির প্রভাবই আল-আযহারে পড়েনি। এ সময়ে বিভিন্ন লেখক, কবি ও সাহিত্যিকদের রচনাবলিতেও মিশরের শিক্ষা ব্যবস্থার পশ্চাদপদতার বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশিত হতো।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ আল-আযহারের শিক্ষা পদ্ধতিকে বিরক্তিকর, প্রাণহীন ও গোঁড়ামিপূর্ণ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং এর সংস্কার সাধনের জন্য উদ্যোগী হন। তিনি মনে করেন মুসলমানদের বর্তমান এ অবস্থাকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে; আর এজন্য তাঁদেরকে অজানা সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। আল-আযহারের শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশের ব্যাপারে একইভাবে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর শিষ্য; বিশ্ববিখ্যাত 'আরবি সাহিত্যিক ত্বাহা হোসাইনও দারুণভাবে অনীহা প্রকাশ করেন। আল-আযহারে ত্বাহা হোসাইন প্রায় আট বছর অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হন। যেমন: রাস্তা-ঘাট, আল-আযহারের আঙ্গিনা, হাদিস ও ফিক্হ এর অধ্যাপকদের গতানুগতিক ভাষণ, শ্রেণিকক্ষের নিয়মিত রুটিন ভিত্তিক পাঠদান, খাদ্য পরিবেশনে অনিয়ম এ সব কিছুই তাঁর কাছে অসুবিধা মনে হতো।[২০] যদিও মুফতি মুহম্মদ 'আবদুহ্ এর অন্যতম শিষ্য অধ্যাপক মারসফীর (মৃ. ১৩৪৯ হি./১৯৩১ খ্রি.) অনুসরণে ত্বাহা হোসাইন নিজেকে

---

১৯ কুত্তাব: মিশরের সনাতন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়েকে 'কুত্তাব' বলা হতো। সেখানে পবিত্র কোরআন মুখস্থসহ 'আরবি ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হতো। [মালুফ লুওয়াইস, *আল-মুনজিদ ফিআল-লুগাহ ওয়া আল-আ'লাম* (বৈরূত: আল-কাছুলিকিয়্যা, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৩১।]

২০ ড. ত্বাহা হোসাইন, *আল-আয়্যাম* (মিশর: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৪ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩।

গড়ে তোলেন।[২১] তথাপি ত্বাহা হোসাইন আল-আযহারে মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হন এবং তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনের জোর সমর্থক ছিলেন।[২২]

মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা আধুনিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতেন। আর অন্যদিকে অধ্যাপক মারসফী সনাতন পদ্ধতিতে সাহিত্য পাঠদান করতেন। তবে উভয়ই আল-আযহারের শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তাঁদের চিন্তধারা আল-আযহারের সকল ছাত্রের পক্ষে বুঝা সম্ভব হতোনা। ত্বাহা হোসাইন বলেন, তবে আমরা মুফতি মুহাম্মদ 'আব্দুহ্ এর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারমূলক পদক্ষেপের পূর্ণ সমর্থক ছিলাম। তাঁর দু'টি ক্লাসে ত্বাহা হোসাইনের যোগদান করার সুযোগ হয়।[২৩]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ রাজনৈতিক বিপ্লবকে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করে শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনকে গ্রহণ করেন এবং সর্বত্র ইসলামী শিক্ষা পুনরায় চালু করাকে তাঁর প্রধান কর্তব্য মনে করেন। পশ্চিমা শিক্ষা এবং বিজ্ঞানকে ইউরোপের সম্পদ ও শক্তির মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি মুসলমানদেরকে অহি ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় তিনি এটা মনে করতেন যে, আযহারের সংস্কার হলে ইসলামী শিক্ষার সংস্কার বহুগুণে ত্বরান্বিত হবে। তিনি আযহারের গতানুগতিক চিরায়ত শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠদান পদ্ধতিকে আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অনুপযোগী হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে আধুনিক যুগের উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধান প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি 'উলামাদের গঠনমূলক সমালোচনা করেন।

পশ্চিমে তৈরি ইসলামের সাথে আধুনিকতার সাংঘর্ষিক মডেলগুলো থেকে তিনি মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কেননা পশ্চিম কেন্দ্রিক জ্ঞানতাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্কের যে ঐতিহ্য ও ভাণ্ডার রয়েছে পবিত্র কোরআন কেন্দ্রিক এ

---

২১ *প্রাগুক্ত*, ১৯৭৩ খ্রি., ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২।

২২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

২৩ মুহাম্মদ ইউসুফ কাওকান,'*আলাম আল-নাছর ওয়া আল- শি'র ফিআল-'আছর আল-'আরাবি আল-হাদিস*(মাদ্রাজ: দার-আল-হাফিজা, ১৪৯৪হি./ ১৯৮৪ খ্রি.), ৩য় খণ্ড,পৃ. ২৩৪।

ঐতিহ্য ও ভাণ্ডার কোনো অংশেই কম নয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আধুনিকতার প্রকাশে পশ্চিমারা যে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র প্রকাশ করেছে; মুসলমানরা তা অনেকাংশেই পরিশীলিত উপায়ে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। এ দুই আধুনিকতা,ভাবনা ও বাস্তবতা প্রকৃত অর্থে এক নয়। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কখনও শিক্ষার ইউরোপীয় আদর্শের পক্ষপাতী নহেন। তিনি অনুভব করেন যে, মুসলমানদিগকে ইউরোপীয়দের ন্যায় অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হবে। তিনি ইসলামকে একটি বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করেন।[২৪]

তিনি ঔপনিবেশবাদ[২৫] ও সাম্রাজ্যবাদের[২৬] ঘোর বিরোধী হলেও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেননি। তিনি মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করেন। জ্ঞানার্জন, বিতরণ এবং ভিন্ন সংস্কৃতির কল্যাণকর দিকগুলি গ্রহণের বিষয়ে তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ একজন মুসলিম হিসেবে কখনও কোনো বিষয়ে উগ্রপন্থা কিংবা চরমপন্থা অবলম্বন করেননি। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং মিশরীয় যুব সমাজের মাঝে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভাবধারা প্রচার করেন।

১৮৯৫ সালে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মিশরের গ্রান্ড মুফতি (প্রধান মুফতি) এর পদ অলংকৃত করেন। একইভাবে তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটরের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মিশরের গ্রান্ড মুফতির পদ অলংকৃত করার পরপরই তিনি আল-আযহারের আধুনিকীকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আল-আযহারের ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকেই মুহাম্মদ আবদুহ্ এর স্বপ্ন ছিল আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিচালনায় আমূল সংস্কার সাধন করা এবং এটাকে মুসলিম বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার একটি সম্ভাবনা দেখা দেয়; যখন তিনি আল-আযহার

---

২৪ ইয়াহইয়া আরমাজানী (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত) *মধ্যপ্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২), ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ২৬৪।

২৫ *প্রাগুক্ত*, হারুনুর রশীদ, পৃ. ৯৬।

২৬ *প্রাগুক্ত*, হারুনুর রশীদ, পৃ. ৩৯৬।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির প্রধান সভ্য হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি সর্বপ্রথম কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তিনি তাঁদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেন এবং আবাসিক শিক্ষকদের জন্য যাবতীয় আবাসন সুবিধা সরবরাহ করেন। অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের জন্যও আবাসিক সুবিধা উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অধিকন্তু শিক্ষার্থীদের বিনা খরচে স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্র-শিক্ষকদের অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি পাঠাগার সংস্কারের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। এভাবে তিনি আল-আযহারের কর্মচারী ও ছাত্র-শিক্ষকসহ সকলের সহানভূতি অর্জন করেন।

এ সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচি ছাড়াও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ আল-আযহারের শিক্ষা কার্যক্রম, সিলেবাস ও ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন করেন। তিনি আল-আযহারের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ধর্ম ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মৌলিক বিষয়ের সংযোজন করেন। তিনি আল-আযহারকে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের চেষ্টা করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল-আযহারের শিক্ষা পদ্ধতিতে কাঙ্খিত মানের একটি সফল শিক্ষা সংস্কার বাস্তবায়ন সম্ভব হলে মুসলিম বিশ্বের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে; যা দেশে দেশে সমাজ পরিবর্তনের একটি কার্যকর ও শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করবে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ আল-আযহারকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-গবেষণা ও মুক্তবুদ্ধিবৃত্তি চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত করেন এবং শিক্ষা ও গবেষণার পরিধিকে আরও বিস্তৃত ও সুসংহত করেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণ করেন। যার ফলশ্রুতিতে আজকের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম বহুগূনে বৃদ্ধি পেয়ে মিশরের বিভিন্ন শহরে এর শাখা-প্রশাখা চালু করা হয়েছে। তাছাড়া এখানকার শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিজ্ঞান অনুষদ খোলা হয়েছে। উক্ত অনুষদের শিক্ষার্থীদের মৌলিক বিষয়ের পাশাপাশি ধর্ম বিষয়েও পাঠদান করা হয়। এভাবে নানা শিক্ষা পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ, কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি আল-আযহারের নিজস্ব পরিচিতি, স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা প্রকাশের মাধ্যমে একে একটি বিশ্বমানের বিদ্যাপীঠ

হিসেবে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের জন্য আন্তরিক কর্মতৎপরতা চালান। কিন্তু এক শ্রেণীর গোঁড়া ও সংকীর্ণমনা 'উলামাদের প্ররোচনায় মিশরের খেদিভ (গভর্নর) তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করেন এবং তাঁকে আল-আযহারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন । তাঁর জীবদ্দশায় আল-আযহারকে তিনি একটি স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের চেষ্টা করেন। যদিও তাঁর ইন্তেকালের পর ১৯০৮ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর অপূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়।

দুটি সভ্যতার মধ্যকার তীব্র বৈপরীত্য মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর হৃদয়কে প্রবলভাবে আলোড়িত করে যার একটি ক্ষয়িষ্ণু আর অন্যটি বিকাশমান। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা বিকাশের অন্তর্নিহিত কারণগুলি গভীর আগ্রহের সাথে অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ থেকে দেশে ফিরে আসার পর শীঘ্রই তিনি সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক বহুবিধ কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করেন।[২৭]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আল-আযহার তাঁর জীবনীশক্তি অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছিল এবং মুসলিম সমাজের পুনরুভ্যুত্থানে খুব কমই ভূমিকা রাখতে পারছিলো। তাই মধ্যযুগীয় গোঁড়া[২৮] মতবাদ সংক্রান্ত দর্শনের পুনঃবিকাশ রোধকল্পে সেখানে পাঠ্যসূচিকে সংকুচিত করা হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিতে প্রচলিত বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ; তাই যে কোনো সমালোচনা হতে মুক্ত হয়ে চূড়ান্তভাবে যৌক্তিক বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর আল-আযহারকে প্রতিষ্ঠিত লাভ করতে হবে; যা দর্শনশাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করবে; যা হবে পারিপার্শ্বিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সম্পর্কযুক্ত এবং প্রচলিত বিজ্ঞানের ধারণাকেও এর অধীন করা হবে। [২৯]

---

২৭ Aasia Yusuf, *Islam and Modrnity: Remembering the contributions of Muhammad Abduh (1849-1905)* Islam and Civilizational Renewal, vol. 3. No.2, p. 363

২৮ **গোঁড়া (Fanatic বা Dogmatic):** যে ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা যুক্তির কোনো ধার না ধেরে কোনো একটি চিন্তা বা বিশ্বাসকে অন্ধভাবে ও একগুঁয়েমির সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকে তাকেই বলে গোঁড়া। প্রধানত ধর্মের ক্ষেত্রে এরূপ গোঁড়া বা অন্ধবিশ্বাসীদের দেখা যায়, যারা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসের বিরোধী কোনো কিছুই বিবেচনা বা বরদাস্ত করতে রাজি হয় না। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও গোঁড়াদের অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। এমনকি বস্তুবাদী বলে কথিত সমাজতন্ত্রীদের মধ্যেও প্রচুর গোঁড়া বা অন্ধবিশ্বাসীর সাক্ষাৎ মেলে, যারা মুখে বিজ্ঞানের কথা বললেও, কার্যত তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মতোই অনড় ও অপরিবর্তনীয় বলে বিবেচনা করে। আর তারা তাদের বিরোধী কোনো যুক্তিই শুনতে বা গ্রহণ করতে রাজি হয় না। [হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬।]

২৯ Aasia Yusuf, *Ibid*,p. 360-361

এ সময়ে আল-আযহারে সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের সময় নির্ধারণে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা ছিল সীমিত। এমনকি পাটিগণিতের চর্চাও ছিল এখানে সীমিত; যা কেবল উত্তরাধিকারের হিসাব নির্ধারণে ব্যবহার হতো। ইতহিাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান কিংবা রসায়ন এখানে মোটেও শেখানো হতোনা; কারণ এ বিষয়গুলিকে নিছক পার্থিব বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আল-আযহারের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সেখানকার একজন গ্রাজুয়েট তাঁর অভিজ্ঞতায় বলেন, এটি ছিল এক অদৃশ্য পুনরাবৃত্তির জীবন, অধ্যয়নের বছরটি শুরু হওয়ার আগে থেকে পড়াশোনা শেষ হওয়া অবধি এখানে কোনো নতুন বিষয়ই ছিলনা। পুরো অধ্যয়নের এ সময়টা কেবল পুনরাবৃত্ত শব্দমালা এবং গতানুগতিক আলোচনা শোনাার এক একটি ঘটনামাত্র; যা আমার হৃদয়ে কোনো একতান জাগায়নি, আর আমার জ্ঞান অর্জনের ক্ষুধা নিবারণে কোনো স্বাদ কিংবা আনন্দও দেয়নি। আর না ছিল সেখানে বুদ্ধির কোনো খোরাক; আর কারও জ্ঞান ভান্ডারে নতুন কোনো জ্ঞানও যুক্ত হয়নি।[৩০]

মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে যুক্তি ও ওহির মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি প্রচলিত আইন ও ধর্মতাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তীয় সংস্কারের পক্ষালম্বন পূর্বক সর্বজনীন শিক্ষার আহ্বান জানান। যদিও প্রাথমিকভাবে আযহারে কেবল গতানুগতিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং কয়েক দশক ধরে মুসলিম মিশরে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার আবির্ভাব শুরু হয়েছিল। তাই তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা হতে ইসলামের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো বেছে নেয়ার চেয়ার চেষ্টা করেন এবং সেগুলোকে ইসলামের বিশ্বদর্শন ও মৌলিক নীতিমালার মধ্যে গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বারংবার খোঁজ করেন। মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ বিশ্বাস করতেন যে, পুরো জাতিকে পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে এক উচ্চতর সংস্কৃতি ও সভ্যতায় উন্নীত করার কাজটি কেবল ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমকে অনুকরণ করার উপর নির্ভর করেনা; বরঞ্চ মানুষের নৈতিক কর্মসূচি, ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও চিরায়ত মূল্যবোধ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

৩০ Taha Hussein, *The Days: His Autobiography in Three parts*(American University in Cairo Press, 1997), p. 1-2

রাখে। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার, দয়া প্রদর্শন এবং উদারতা ও বিশালত্বের গূণাবলী অর্জনের মধ্যেই জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত শিক্ষা নিহিত রয়েছে।[৩১]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় শিক্ষাদান ও শিক্ষা সংস্কার আন্দেলনে ব্যয় করেন। আর তাঁর এই শিক্ষা সংস্কার আন্দেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সংশোধন ও সামাজিক উন্নয়ন। তাই তিনি ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও সামাজিক গোঁড়ামি দূরীকরণের মাধ্যমে যৌক্তিকতার ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর এই সমাজ সংস্কার ও বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রধান হাতিয়ার ছিল শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর একটি উক্তি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যে, আমি পাশ্চাত্যে গিয়ে ইসলাম দেখেছি, কিন্তু কোনো মুসলিম দেখিনি। আমি প্রাচ্যে ফিরে মুসলিম দেখেছি, কিন্তু ইসলাম দেখিনি।[৩২]

৩১ Aasia Yusuf, *Ibid*, p.364

৩২ https://www.goodreads.com/quotes/859297-i-went-to-the-west-and-saw-islam-but-no

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিজ্ঞান শিক্ষা চর্চায় মুহাম্মদ ‘আবদুহ্

অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে মুসলিম সভ্যতা গৌরবের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানরা ছিল সর্বোন্নত জাতি। সেই সময় ধর্মের সংগে বিজ্ঞান চর্চার কোনো বিরোধ ঘটেনি। দ্বাদশ শতাব্দীতেও ইমাম গাজ্জালি[৩৩] (র.) বিজ্ঞান চর্চাকে মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয় শাখা মনে করেছেন এবং এই জ্ঞানকে ধর্ম বিরোধী হিসেবে আখ্যা দেননি। কারণ, বিজ্ঞান এমন কোনো তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি যা ধর্মের সাথে বিরোধপূর্ণ। অথচ ইসলাম ধর্মের পবিত্র কোরআনেও স্রষ্টার সৃষ্টিকে বিশেষভাবে জানার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করা হয়েছে,

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

অর্থ: তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যে সব রং-বেরং এর বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে।[৩৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ‘তায়ালা ঘোষণা করেনন,

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ: এবং আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।[৩৫]

বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামে কোনো বাধা নেই; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিজ্ঞান প্রদত্ত এমন কোনো দর্শন মেনে নিতে হবে যা মানবতার জন্য ইসলাম যে মহৎ আদর্শ দিয়েছে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করে। ইসলামের মূলনীতিকে মেনে নিয়ে মানুষ যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় অগ্রসর হয় তাহলে ওহি বা প্রত্যাদেশ নির্দেশিত এ বিজ্ঞান চর্চা মানব সভ্যতাকে আরও উচ্চ আসনে আসীন করবে। এজন্য বিজ্ঞানের চর্চায় মানুষ তখনই সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে;

---

৩৩ প্রাগুক্ত, আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ১১৯-১২৫।

৩৪ *আল-কোরআন:* ১৬: ১৩।

৩৫ *আল-কোরআন:* ৪৫: ১৩।

যখন সে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে মনুষত্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ সর্বোপরি উন্নত মানবিক গূনাবলি অর্জনের মাধ্যমে তা বিশ্ব মানবতার কল্যাণে প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে। আর বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তখনই মানুষ্যত্ব ও কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয় যখন এর ভিত্তি বা কেন্দ্রবিন্দু হয় সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ওহি বা প্রত্যাদেশ। সুতরাং ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই আল্লাহ প্রদত্ত। অথচ ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা কিংবা ইসলাম সম্পর্কে খণ্ডিত ধারণা পোষণকারীরা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়না। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর এ ধরনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত চিন্তা-দর্শন নিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্বত্র ছুটে গিয়েছেন এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও লেখনীতে তিনি তাঁর এ সম্পর্কিত দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

তের শতকের গোড়ার দিকে ধর্মতত্ত্ব চর্চার আধিক্য, আধ্যাত্মিকতা চর্চায় কুসংস্কার, নানা অলৌকিক উপাদানের প্রাধান্য, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার অভাব ইত্যাদি কারণে মুসলমানরা সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। অথচ মুসলমানদের রয়েছে দুনিয়া শাসন করার মত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ইসলামের দ্বিতীয় শতাব্দীত্তোর সময়টাতেও মুসলমানরা বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশের মাধ্যমে বিজ্ঞানকে বিকশিত করে। এ সময় তাঁরা ঘটনাবলির প্রকৃতি, কার্যকারণ, প্রাণীর সাথে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক, প্রকৃতির পরিবর্তন, বিকাশ এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি ও লক্ষ্য অধ্যয়ন ও গবেষণা করার একটি স্বাধীন উপায় উপলক্ষ্য ও পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তের শতকে মুসলমানদের এ পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ ছিলো তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বাদ দিয়ে কেবল ধর্ম চর্চায় মনোযোগী হয়ে উঠে। ফলে তাঁদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক চেতনা বলতে কিছু ছিলনা। একইভাবে ইসলাম বিশ্বব্যাপী সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যর্থ এবং উন্নয়নে অক্ষম এ ধরনের একটি মিথ্যা কালিমা ইসলামের সাথে লেপনের অপচেষ্টা অব্যাহত ছিল। এ প্রেক্ষাপট সৃষ্টির জন্য মুসলিম পণ্ডিতগণও তাঁদের দায় পুরোপুরি এড়াতে পারেননা। কেননা এ সময় খুব অল্প সংখ্যক পণ্ডিতই ছিলেন যারা ইসলামের সৌন্দর্য, আধুনিকতা, যৌক্তিকতা, উপযোগিতা ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা মানুষের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন। তাই ইসলামের সৌন্দর্য, সক্ষমতা, আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা নিয়ে মানুষের মধ্যে অসত্য সন্দেহ ও কৃত্রিম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ বিভ্রান্তি প্রতিনিয়ত মুসলমানদের মানসিক বলকে দুর্বল করার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

ইতিহাসের এ ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানগণ তাঁদের হৃত স্বাধীনতা, অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেতন হয়ে উঠে এবং আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধানে বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কেননা এই সময়ে মিশরসহ গোটা মুসলিম বিশ্বেই মুসলমানগণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখায় বিজ্ঞান নির্ভর পাশ্চাত্য শিক্ষিতরা সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো খুব সহজেই দখল করে নিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আধুনিক জ্ঞানী-গূণী, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা এক নতুন অভিজাত শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল; যারা সত্যিকার ইসলাম ও গণমানুষ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

আধুনিক কালে বিজ্ঞানের এই ব্যাপক প্রভাবকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মুহাম্মদ 'আবদুহ্ কোনোভাবেই হেয় করে দেখেননি কিংবা কৌশলে এড়িয়ে যায়নি। তিনি আধুনিক সমাজ উন্নয়নের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা পর্যালোচনা পূর্বক এটা খুব স্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করেন যে, বিজ্ঞানহীন ধর্ম মানুষকে অনুন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি আধুনিক কালকে বিজ্ঞানের প্রবল ধারা হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এটি এমন এক কাল যা আমাদের সাথে সভ্য জাতি-গোষ্ঠীর সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের অসাধারণ অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে সজাগ করে তুলছে; একইসাথে আমাদের অবস্থানকে নাড়িয়ে তুলছে। এভাবে তাদের সম্পদ আর আমাদের দারিদ্র্য, তাদের উন্নতি আর আমাদের অবনতি, তাদের শক্তি আর আমাদের দুর্বলতা, তাদের বিজয় আর আমাদের পরাজয় প্রতিনিয়ত সময়কে অতিক্রম করছে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মুসলমানদেরকে বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তিনি সব সময় বিশ্বাস করতেন যে, ইসলাম বিজ্ঞান ও আধুনিকতার সাথে মানানসই। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইসলাম স্বভাবতই যৌক্তিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্ম বিশ্বাস। প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষার সংস্কারে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, আধুনিক সমাজের সক্রিয় অংশ হয়ে উঠার জন্য মুসলমাদেরকে বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে এবং তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা শিখতে হবে। ধর্মকে বিজ্ঞানের মতোই যৌক্তিক হয়ে ওঠার জন্য মুসলমানদেরকে আরও বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে এবং তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ধর্মকে বিজ্ঞানের মতোই

যৌক্তিক ও বাস্তব হিসেবে উপস্থাপনের একটি জোরালো প্রয়াস মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়; যা বিংশ শতাব্দীর মুসলমানদের প্রবলভাবে আলোড়িত করে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর দৃষ্টিতে ইসলাম মানবের কল্যাণে সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা; যার মধ্যে বিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের শাখা মাত্র। এজন্য দেখা যায় যে, বিজ্ঞান বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই করার পর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়; কেননা বিজ্ঞানের একটি নিজস্ব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া রয়েছে। আর সে প্রক্রিয়াতেই বিজ্ঞান তার কাঙ্খিত সত্য প্রমাণে চেষ্টা চালায়। যদিও বিজ্ঞান কখনও কখনও তার কাঙ্খিত সত্য প্রমাণে ব্যর্থ হয়। অন্য দিকে ধর্ম কোনোরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরখ ছাড়াই পূর্ব থেকেই এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কিংবা সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে যা সত্যে প্রমাণিত হচ্ছে। আর বিজ্ঞানীরাও যখন ধর্ম প্রদত্ত কোনো পূর্ব সিদ্ধান্তের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায় দেখা যায় যে, এটি সত্য প্রমাণে সফল হয়। ইসলাম যে প্রমাণ দেয় বিজ্ঞানীরা তা খণ্ডন করতে ব্যর্থ হয়। এভাবে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান ও গবেষণা আর ইসলাম প্রদত্ত চিন্তা-চেতনা ও সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে একই উপসংহারে এসে পৌঁছায়। সুতরাং ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার এক গভীর অন্তমিল ও সাযুজ্য রয়েছে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানে বিমোহিত একজন ইসলামী পণ্ডিত। তিনি পবিত্র কোরআনেরও বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও তাফসিরের প্রত্যাশী ছিলেন, যা তাঁর তাফসির আল-মানারে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি পদার্থ বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় মুসলমানদের জীবন মানোন্নয়নে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন। তাই তিনি ইসলামের আদর্শকে বিজ্ঞানের এ যুগে প্রয়োগের জন্য আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার নতুন পন্থা এবং পাশ্চাত্য দর্শনের ক্রমবিকাশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সংকোচ ও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি সব সময় ইসলাম ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের মধ্যে মিলগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন এবং ইসলামের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক বুঝতে চাইতেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এ দীক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষক জামাল উদ্দীনআফগানীর নিকট থেকে। কারণ জামাল উদ্দীন আফগানী এ বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন যে, ইসলাম এবং বিজ্ঞান কেবল সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়; বরঞ্চ সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলামই হচ্ছে

বিজ্ঞানের সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু।[৩৬] মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিম জাতি ইউরোপ থেকে বিজ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত তাঁরা আর শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হতে পারবেনা; যেগুলি হচ্ছে তাঁদের মননও ক্রিয়াকলাপের ফলাফল। আর ইসলাম ত্যাগ না করেও মুসলিমরা এটি করতে পারে। কেননা ইসলাম সমস্ত কারণের ফলাফলকে গ্রহণ করতে শিখিয়েছে।[৩৭]

কোনো কোনো মুসলিম চিন্তাবিদগণ যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, সমসাময়িক চিন্তার সাথে ইসলামের কথিত অপরিবর্তনীয়তা মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। কিন্তু মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর বিপরীতে আধুনিক যুগে এসে ইসলামকে এর মূল রূপে বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত ধর্ম হিসেবে আরও সুদৃঢ়রূপে প্রাপ্তির কারণ হিসেবে বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফলকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন এবং অন্যান্য ধর্মীয় ব্যবস্থার চেয়ে বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে আরও দৃঢ় ঘনিষ্ঠতা খুঁজে পান। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ মনে করেন, ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার কোনো দ্বন্দ নেই; বরং ইসলাম বিজ্ঞানের মিত্র এবং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক গভীর সম্প্রীতি রয়েছে। ইসলামকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হলে বিজ্ঞানকে এ ধর্মের সাথে মানিয়ে নেয়া যায়। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ পবিত্র কোরআনের তাঁর ভাষ্যে প্রাকৃতিক ঘটনার সাথে কোরআনের সূত্রসহ আধুনিক যুগের নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।[৩৮]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে একটি আধুনিক নগর রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বিশ্বাস করতেন যে, জনগণ যদি একটি নগর রাষ্ট্রের জন্য প্রস্তুত হয় তবে তাদের জন্য একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রয়োজন রয়েছে। সে সময় ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলি কেবল ইসলামী পাঠ্যের উপর মনোনিবেশ করেছিল। মুহাম্মদ 'আবদুহ একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলেন যেখানে গণিত, ভাষা ও তুলনামূলক ধর্মের পাশাপাশি বিজ্ঞানকে প্রধান বিষয় হিসেবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল।[৩৯]

---

৩৬ Aasia Yusuf, *Ibid*, p. 363

৩৭ Elam Harder, *Muhammad 'Abduh (1849-1905*, Centre for Islamic Sciences, Canada, Accussed online on 23 May 2016; http://www. cis-ca.org/voices/a/abduh.htm.

৩৮ Aasia Yusuf, *Ibid*, p. 366

৩৯ আব্বাস মাহমুদ আল 'আক্কাদ, *'আবক্বারি আল-ইসলাহ্ ওয়া আল তা'লিম আল-ইমাম মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: দার আল-মিশরলি-আল-তিবাত, ১৯৬০), পৃ. ১৮৪।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ শিক্ষাকে সকল সংস্কার ও সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিশ্বাস করতেন। ১৮৮১ সালে 'জ্ঞানীদের ত্রুটি' শিরোনামে শিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সংস্কার সম্পর্কিত এক নিবন্ধে তিনি লিখেন যে, যে ব্যক্তি দেশের কল্যাণ কামনা করে সে যেন শিক্ষার সিদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর জন্য প্রচেষ্টা না চালায়, তাহলে সে যা চায় তার সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।[৪০] কেননা পশ্চিমা বিশ্বের সমৃদ্ধির জন্য উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞান চর্চা এবং সুষ্ঠু রাষ্ট্র পরিচালনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং তাদের শক্তি ও সম্পদের জন্য এগুলিই হচ্ছে মৌলিক অনুঘটক। তাই মুসলমানদের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলির চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্যক।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ আধুনিকতাবাদ ও প্রগতিবাদের যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতাকে স্বাগত জানাতে গিয়ে যুগকে এভাবে পর্যালোচনা করেন যে, তিনি অতীতের ইসলামী বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগের দিকে এবং ইউরোপীয় অন্ধকার যুগে মুসলমানদের উদীয়মান হওয়া বিদ্যাবত্তার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। তিনি আধুনিকতাবাদী 'আরবকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁরা অধুনিকতার সাথে মোটেও অপরিচিত নয় এবং তাঁদের কঠোর ও বিধি-নিষেধকারী ধর্ম ইসলাম এটাকে বর্জন করেনি; তবে এটিকে এমন এক দিক নির্দেশক নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা সাংস্কৃতিক অখণ্ডতাকে সুরক্ষা করে এবং নিরাপদ রাখে।[৪১] এভাবে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ইউরোপের উন্নতি সম্পর্কে নিজেকে ভালভাবে সচেতন রেখেছিলেন এবং সে সকল ধারণা গ্রহণ করেছিলেন; যা ইসলামী সমাজ উন্নয়নে সর্বাধিক অবদান রাখতে পারে।[৪২]

ইসলামে বিজ্ঞানকে সর্বদা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে; যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানের কোনো কোনো পণ্ডিত বিজ্ঞানকে সৃষ্টিকর্তার বিপরীতে দাঁড় করানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ অপচেষ্টা নিতান্তই নিষ্ফল প্রচেষ্টা। কেননা যুগ যত আধুনিকের

---

৪০ Oliver Scharbrodt, *Islam and the Baha'i Faith: A comparative study of Muhammad 'Abduh and 'Abdul Baha 'Abbas* (London: Routledge, 2007), P. 99

৪১ Hourani, *Arabic Thought*, 173; Yoav Di-Capua, Gatekeepers of the Arab past (Berkeley: university of California press, 2009), p.23; Muhammad al-Haddad, *Muhammad Abduh: Qira'a Jadida fi khitab all-Islah al-Dini* (Beirut: Dar al-Tali'ah lil -Tiba'ah wa-al-Nash, 2003, p. 56

৪২ Mark Sedwick, *Muhammad 'Abduh* (oxford: one world, 2010), p. 22

দিকে অগ্রসর হচ্ছে বিজ্ঞানের দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্ব ও সৃষ্টি রহস্য তত বেশি প্রমাণিত ও যৌক্তিক হয়ে উঠছে। ইসলামের ন্যায় বিজ্ঞানও যুক্তিবাদ, বাস্তবতা ও একতাকে প্রাধান্য দেয়।

জামাল উদ্দীন আফগানী এবং মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এমন একটি যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ও সংস্কারবাদী গোষ্ঠী গঠন করেন যেটি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত: সংস্কার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম ছিল। কারণ মুসলিম জাতি এ গোষ্ঠীর কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে এমন উদ্যম ও স্পৃহা দেখেছেন; যা তাঁদের মর্যাদা ও আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে নবজাগরণের জন্য তাঁদের সাথে প্রস্তুত হয়ে উঠার বিষয়টি ছিল অকল্পনীয় ।[৪৩]

ইসলাম সর্বদা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুসরণকে প্রণোদিত করেছে এবং পবিত্র কোরআনের প্রায় সাতশত পঞ্চাশটি আয়াত দ্বারা এটি সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াত মানুষকে চিন্তা ও গবেষণা করতে এবং পৃথিবী ও মহাজগত সম্পর্কে অন্বেষণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, অধ্যয়ন ও গবেষণা করাওএক ধরনের ইবাদত। ইসলামে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন সৃষ্টিকর্তার আদেশের আনুগত্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

আব্বাসী যুগে মুসলমানরা বিজ্ঞান চর্চা, বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং এর প্রসারে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল; যা বিশ্ব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অধিকন্তু, উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনামলে বাগদাদ ও আন্দালুস সংস্কৃতি ও সৃজনশীল বিজ্ঞান চর্চায় সমৃদ্ধি দেখেছিল; ফলে তৎকালীন বিশ্বের গতিশীল জীবন ব্যবস্থায় এক গভীর প্রভাব পড়েছিল। বিশেষ করে মধ্যযুগীয় মুসলিম বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ বিশ্ব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমন: আল-বিরুনি, আল-কিন্দি, আল-খাওয়ারিজমি, আল-রাজি, জাবির ইবন হাইয়ান, ইবন ইসহাক, আল-ফারাবি[৪৪], আল -মাসুদি, ইবন সিনা, আল-তাবারি, আবুল ওয়াফা, আল-কাসি, ইবন আল-

---

৪৩ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা, *আল-তাজদিদ ওয়া আল-তাজাদ্দুদ ওয়া আল-মুজাদ্দিদুন* (মিশর: ১৯৩১, আল-মানার, ৩য় খণ্ড, জুলাই ১৯৩১, পৃ. ৭৭০-৭৭৭।

৪৪ **আল-ফারাবি:** আল-ফারাবির (৮৭৩-৯৫০ খ্রি.) পুরো নাম হচ্ছে আবু নসর মুহাম্মদ আল-ফারাবি। দর্শনের ইতিহাসে তিনি আল-ফারাবী নামেই সুবিখ্যাত। ইসলামী দর্শনে আল-ফারাবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে মনে করা হয়। ফারাবি তাঁর জন্মস্থান ফারাবে প্রাথমিক শিক্ষার গ্রহণ করেন। পরে বাগদাদে গিয়ে গ্রিক ও 'আরবি ভাষা আয়ত্ত বরেন। ফলে তাঁর জন্য দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়। সঙ্গীত বিদ্যায়ও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইবন খাল্লিকান বলেন যে, আল-ফারাবি এ্যারিস্টটলের 'ডি অ্যানিমা' (আত্মা সম্পর্কীয় গ্রন্থ) দুইশত বার এবং ফিজিক্স (পদার্থ বিদ্যা) গ্রন্থ

হাইতাম, আলি ইবন ইসা আল-গাযালি ও উমর খৈয়ামসহ প্রমুখ পণ্ডিতদের গবেষণা ও কাজগুলি ছিল মৌলিক; যা বহু শতাব্দী ধরে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে প্রশংসার প্রধান বিষয় হিসেবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। এ সকল সৃজনশীল কর্ম রেনেসাঁর পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বে অপরিহার্য প্রভাব ফেলেছিল। তাই আধুনিক যুগে এসেও মুহাম্মদ 'আবদুহ্ উপলব্ধি করতেন যে, উন্নততর অবস্থান ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলমানদের উচিত বিজ্ঞানের সমালোচনামূলক ধারণাসমূহ পুনর্বিবেচনা করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে সকল শাখায় মুসলমানরা ইতোপূর্বে বিকাশ লাভ করেছিল মুসলমানদের সে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-উপাত্ত ও প্রায়োগিক দর্শনের সাথে পশ্চিমের বর্তমান বৈজ্ঞানিক দর্শন ও প্রায়োগিক দিকের বৈসাদৃশ্য ও সাযুজ্য নিরূপণ করা। অত:পর সার্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ পূর্বক বিজ্ঞানের এ বিকাশকে ইসলামের সাথে সংশ্লেষ করা।

বিজ্ঞানের বিকাশ অবশ্যই ইসলামের সত্যিকার চরিত্র ও এর সামগ্রিক শিক্ষার উপর হওয়া উচিত যা চিন্তা-চেতনা ও মননকে স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে মানুষের কল্যাণ ও মর্যাদার বিষয়কে সমুন্নত রাখবে এবং সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা হবে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসে পরিণত করা; তাহলেই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা হবে কল্যাণমুখী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অতীত ঐতিহ্য, অবস্থান ও দক্ষতা ফিরিয়ে আনতে মুসলমানদেরকে পূর্বের ইসলামী পণ্ডিতদের গতিময় ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব পুনঃদাবির মাধ্যমে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। আধুনিক বিশ্বে সভ্যতা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে মুসলিম জাতির অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যে বাস্তব সত্য উদভূত হচ্ছে তাকে সাধুবাদ জানানো উচিত। কেননা সত্যের সাথে সত্যের কোনো সংঘাত নেই; সত্য সর্বত্রই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কল্যাণকর।

চল্লিশ বার অধ্যয়ন করেন। আল-ফারাবি তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং তিনি বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আল-ফারাবি রচিত গ্রন্থের সংখ্যা এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি, তবে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা যে শতাধিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক হলো প্রাক্তন দার্শনিকদের রচনার ভাষ্য ও সমালোচনা গ্রন্থ এবং বাকিগুলো তাঁর মৌলিক রচনা। আল-ফারাবির সমধিক বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হচ্ছে উত্তম রাষ্ট্রের অধিবাসীদের ভ্রান্তি সম্পর্কিত গ্রন্থ। আল-ফারাবির মতে দর্শন হলো আদিবিজ্ঞান যা সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। তাঁর মতে দর্শনের জ্ঞান লাভ করাই হচ্ছে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। দর্শনই জীবন ও জগতের প্রকৃত জ্ঞান দান করে। তাঁর মতে দর্শনই একমাত্র বিষয় যা জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে অখণ্ড ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে পারে। [আব্দুল হাই,*পরিভাষাকোষ*, খ.১, পৃ. ৩৪-৩৫; করিম, *র্দশনকোষ*, পৃ. ২৪-২৬; আমিনুল ইসলাম, *ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, পৃ. ১৪৫-১৫৬]

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পদযাত্রা এবং মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর ন্যায় মুসলিম পণ্ডিতদের বিজ্ঞান চর্চার স্বীকৃতি এবং বিজ্ঞানকে কল্যাণের পক্ষে প্রয়োগের জন্য অবস্থান গ্রহণ; নিঃসন্দেহে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়কে বিজ্ঞান চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মুসলমানদের জীবনমান উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাছাড়া প্রযুক্তিগত অগ্রতির চিন্তা-দর্শন তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে উন্নয়নের গতি আনয়ন করে। পূর্বানুমানের উপর ভিত্তি করে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ যে যুক্তিবাদী দর্শনকে সমর্থন করেন তা হলো বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য বিরাজ করেনা এবং বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের ভিত্তিই যুক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। আর পবিত্র কোরআন মানুষকে তার যুক্তি ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।[৪৫]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর যৌক্তিক চিন্তাধারা প্রচারের সাথে সাথে মুসলমানদের জীবন পদ্ধতিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণকে গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করতেন এবং সৃজনশীলতা ও যুক্তিবাদকে সমর্থনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্মের একীভূতকরণকে তিনি উৎসাহিত করতেন। উগ্রবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিপরীতে বিজ্ঞানকে ধর্মের সাথে সামঞ্জস্য করার লড়াইয়ে তিনি সর্বজনীন ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে যারা বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই পশ্চিমা রীতিনীতি গ্রহণ করে এবং সন্দেহাতীতভাবে আধুনিকতাকে আত্তীকরণ করে এবং ধর্মের কোনোও যথাযথ বিচার-বিবেচনা না করেই বিজ্ঞান ও আধুনিকায়নকে দৃঢ়তার সাথে অনুসরণ করে চলেছে নিশ্চিতভাবে তাঁরা অন্ধ অনুকরণে নিমজ্জিত রয়েছে।[৪৬] তিনি সে সকল অন্ধ অনুসরণকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বিজ্ঞান ও ধর্মের অন্ধ অনুসরণকে নিরুৎসাহিত করতেন এবং তাঁর বিজ্ঞান সম্পর্কৃত চিন্তাধারা ছিল এরূপ, মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর যুক্তিবাদী তত্ত্বের মৌলিক ভিত ছিল মূলত তাওহিদের স্তম্ভ ও ধর্মের দৃঢ় ভিত্তি।আর তিনি এমন মূলনীতিতে অবিচল ছিলেন; যার দ্বারা তিনি ইসলামী বিজ্ঞানের পক্ষে জরুরীভাবে সর্বজনীন নৈতিকতা এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের নতুন মাত্রা তৈরী করতে সমর্থ হন। সর্বোপরি মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ইসলামী

---

৪৫ Livingston, John W., 1995, *Muhammad 'Abduh on Science*, The Muslim world, vol. 1xxxv, p. 3-4, July-october

৪৬ Gibb, H.A.R. 1928. Bulletin of the School of oriental Studies, (London: 1952), vol. iv, p. 758, Studies on the civilization of Islam. Princeton: Princeton University press.

বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক দর্শন গঠনের সংস্কৃতির উপর বিশেষ জোর দেন। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ জোর দিয়ে বলেন যে, উন্নয়নের মাধ্যমগুলি জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে।[৪৭] এভাবে তিনি বিজ্ঞানের সৃজনশীল ও যৌক্তিক দর্শনকে ইসলামী বিজ্ঞান-দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মুসলিম জাতির নিকট উপস্থাপন করেন। আর এ চেতনাকে স্পষ্টভাবে তাদের নিকট প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, বিজ্ঞান ধর্মের সাথে যমজের মতই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তিনি গবেষণার চেতনাকে উৎসাহিত করেন এবং যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে ধর্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, গবেষণার মাধ্যমেই এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হবে যে, ধর্ম হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রকৃত বন্ধু।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বিজ্ঞানের বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন; যা তিনি দৃঢ়তার সাথে তাঁর লেখনীতে ব্যক্ত করেন, "বিজ্ঞান হচ্ছে স্বাধীনতা ও প্রগতির মূল জীবন ধারা; বিজ্ঞান যখন তার শুদ্ধরূপে ধর্মের সাথে পরিণয় ঘটাবে তখন তা সমাজকে পরিপূর্ণতা দান করবে। স্বাধীনতা ছাড়া বিজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকতে পারেনা, যেমনি ন্যায়বিচার ছাড়া স্বাধীনতা ও অগ্রগতির অস্তিত্ব থাকতে পারেনা। স্বাধীনতা মানেই ন্যায় বিচার, যেভাবে বিজ্ঞান মানে স্বাধীনতা।[৪৮]

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ বরাবরই বিজ্ঞান ও ধর্মকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং উভয়ের মূল কারণকে যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই তিনি বিজ্ঞান ও পবিত্র কোরআনের যুক্তিকে মানুষের বাস্তব জীবনে প্রয়োগের আহ্বান জানান। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর বৈজ্ঞানিক চিন্তা দর্শন ছিল মূলত ইবন খালদূনের ন্যায় পণ্ডিতদের চিন্তা-দর্শনেরই প্রতিধ্বনিত অনুরণন; যা বিভিন্ন সময় আল-আহরামে প্রকাশিত তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা ইবন খালদূনের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, ন্যায় বিচারই হচ্ছে একমাত্র মাটি যেখানে বিজ্ঞান শেকড় গড়তে পারে এবং বিজ্ঞান বলতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে বোঝায়।

'দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানের আহ্বান' শীর্ষক নিবন্ধে যারা যুক্তি ও বিজ্ঞান শেখাতে অনীহা প্রকাশ করেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্ সে সকল মুসলমানের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এ জাতীয়

---

৪৭ মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, *আল-'আমাল আল-কামিলাহ্ লি আল-ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: দার আল-সুরক্ব, ১৯৯৩ খ্রি.), ৩য় খণ্ড , পৃ. ২১।

৪৮ Abduh, *Al-Ahram,* 1880, Livingston, John W., 1995. Muhammad Abduh on science, The Muslim world, vol. 1xxxv, p. 3-4, July oct.

বিষয়গুলির প্রতি যদি আমাদের মনোভাব এমন হয় তাহলে আমি সেটা ভেবে ভয় পাচ্ছি যে, আমাদের আধুনিক যুগে যে নতুন বিজ্ঞানগুলি প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়তা, সুখ-শান্তি, সম্পদ এবং শক্তির ভিত্তি হয়ে উঠছে তা আমরা কীভাবে বিবেচনা করব। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের নিজস্ব লোকদের নেতৃত্ব অনুসরণ করে এ বিষয়গুলি যথাযথভাবে অর্জন করতে হবে; যারা ঐ বিজ্ঞানগুলির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এবং তা উপেক্ষা করার বিপদ সম্পর্কে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত সচেতন করে থাকবে।"[৪৯]

যুক্তিবাদ নির্ভর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভাবিত আধুনিক কাল যখন মানুষকে যুক্তির বাঁকে ও কল্যাণের মোহে ফেলে অনৈসলামিক ও ধর্মহীন আধুনিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে ঠিক তখনই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ইসলামের সময়োপযোগী ও যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষের নিকট ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযোগিতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, ইসলাম সবসময়ই আধুনিক, বিজ্ঞানময় ও কল্যাণকর। কেননা ওহি নির্ভর ইসলাম সর্বদাই মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রতিটি বিষয়ে এমনসব সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে যা যুগে যুগে বারংবারই কালোত্তীর্ণ আদর্শ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যতো বেশি উৎকর্ষ লাভ করছে ইসলামের চিরায়ত বিশ্বাস নির্ভর বিষয়গুলি মানুষের নিকট ততো বেশি সুস্পষ্ট ও অকাট্যরূপে কালজয়ী আদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছে।

কোনো বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা শেষে এর ফলাফলটি যখন ইসলামের হাজার বছরের পূর্বতন সিদ্ধান্তের সাথে সাযুজ্য হয় তখন চূড়ান্তভাবে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে আদৌ কোনো বিরোধ নেই। অধিকন্তু এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলাম কোনো ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই যে সিদ্ধান্তটি নির্ভাবনায় বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিয়েছে আজ বিজ্ঞান তা খুব ভাবনা- চিন্তা নিয়ে গবেষণা করে যুক্তিবাদের উপর তা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য। এজন্যই মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ইসলামের বিশ্বাসের বিষয়গুলির মধ্যে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত কার্যকারণ খোঁজে বেড়াতেন; যাতে করে বিশ্বাসের

৪৯ মুহাম্মদ 'ইমারাহ্, *আল-'আমাল আল-কামিলাহ্ লি আল-ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: দার আল-সুরুক্ব, ১৯৯৩ খ্রি.), ৩য় খণ্ড , পৃ. ২৩।

উপর অনাস্থাশীল অবিশ্বাসীদের নিকট যুক্তির নিরিখে ইসলামকে একটি বিজ্ঞানের ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। ইসলাম কখনোই তার আধুনিকতাকে হারায়নি; বরঞ্চ যুগে যুগে সময়ের প্রত্যাশিত দাবি পূর্ণতার মাধ্যমে এবং মানুষের শান্তি ও কল্যাণ বিধানের মাধ্যমে এর আধুনিকতাকে আরও আধুনিকতর, গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিবাদী করে তুলেছে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন সময়ের এক সাহসী ব্যক্তিত্ব। একাধারে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিজীবী ও আধ্যাত্মিক মানুষ। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্জাগরণ ছাড়া রাজনৈতিক সমাধান সফল হতে পারেনা। তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের ভেতর দৃষ্টিভঙ্গিগত অনৈক্য বা অমিল। ফলে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের বিষয়গুলো কেবল বৈরিতার আশংকা হিসেবেই নয় বরং ইসলামী জীবনব্যবস্থা; আধুনিকতা ও উন্নয়নের উপযোগি নয় এ ধরনের অবান্তর বদ্ধমূল ধারণা কোনো কোনো অমুসলিম ও ইসলাম বিদ্বেষীদের মনে সৃষ্টি হয়েছে। শুধু অমুসলিমই নয় কোনো কোনো মুসলিমও এ ধরনের ধারণা পোষণ করে থাকে। এ জাতীয় বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা কেবল অমুসলিমদের মনোতুষ্টি ও শক্তির কারণই নয়; বরঞ্চ তা মুসলমানদেরকেও মানসিকভাবে দুর্বল করে তুলে। উপরন্তু ইসলামের আধুনিক স্বরূপ ও সৌন্দর্য বিকাশে তা এক বড় ধরনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহার

মুসলিম মনীষার স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁদের শ্রেষ্ঠতম একজন। তিনি ছিলেন ইসলামী আধুনিকতার বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম রূপকার। তিনি সমকালীন যুগ-জিজ্ঞাসা ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সাথে ইসলামের উপযোগিতা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। তিনি ইসলামকে মানুষের নিকট প্রগতি, উন্নতি, যুক্তি ও বিজ্ঞানের ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি এ ধর্মকে একটি শক্তিশালী নীতি সম্বলিত ধর্ম হিসেবে মানুষের নিকট তুলে ধরেন। তাছাড়া এ সকল বৈশিষ্ট্যকে তিনি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এর অতীত শক্তির উৎস হিসেবে নির্দেশ করেন।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ অতীতের প্রশ্নাতীত গুণকীর্তন ও অন্ধ অনুকরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন; একইসাথে সমকালীন প্রেক্ষাপটের আলোকে ইসলামকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তার কথা জোরালোভাবে অনুভব করেন। বিশেষ করে আইন, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের একটি শক্তিশালী ভিত রচনার প্রানান্তকর চেষ্টা তিনি অব্যাহত রাখেন। সর্বোপরি তিনি মুসলমানদের নিকট ইসলামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগ-সমস্যার যুগোপযোগী ইসলামী সমাধানের সঠিক পথ ও পদ্ধতি তুলে ধরেন। ধর্মকে বিজ্ঞানের মতোই যৌক্তিক হয়ে উঠার একটা বিশ্বাস তিনি মুসলমানদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর সংস্কারধর্মী রচনাবলি ও আধুনিক চিন্তাধারা মুসলমানদের মনের রাজ্যে ও চিন্তার দুয়ারে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং অনগ্রসর মুসলিম জাতিকে ইসলামের অনুসরণীয় পন্থায় অগ্রগতি, উন্নতি ও প্রগতির চূড়ায় আরোহণের দিকনির্দেশনা দিয়েছিল। এজন্যই তাঁকে 'ইসলামী আধুনিকতার জনক' বলা হয়।

আধুনিকতার নতুন চ্যালেঞ্জ মোকালোয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের পুনর্গঠন ও পুনর্বিবেচনারর বিষয়ে তিনি 'উলামাদের উদাত্ত আহ্বান জানান এবং ইসলামের জন্য আধুনিক চ্যালেঞ্জ উপলব্ধি করতে তিনি জনগণকে সাহায্য করেন। তিনি মুসলমানদের বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুক্তি ও মর্যাদা লাভের কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজকে একেবারে শুণ্য থেকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই মুসলমানরা তাঁদের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব আবার ফিরে পাবে।

উপন্যাস ও ছোট গল্পের ভিত রচনায় যারা মিশরে সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁদের অন্যতম। তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও স্বকীয়তা ও আধুনিক মনোভঙ্গি তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই বৈশিষ্ট্যময় করে রেখেছে। 'আরবি সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগের সময়ে শিল্প-বিবর্তনের ফলে নতুন ধরনের গদ্যরীতি 'আরবি সাহিত্যের আশ্রয় নেয়। এ কারণেই 'আরবি সাহিত্যে রচিত হতে থাকে সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গিকের ছোট গল্প। যা ইতিপূর্বে 'আরবি সাহিত্যে কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে 'আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আধুনিকতার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। মূলত প্রাচীন সাহিত্যের সাথে এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো মিল নেই। আধুনিক গদ্যে কেবল রূপ ও বাহ্যিক আকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেনি, বরং তার বিষয়বস্তুতেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে আধুনিক গদ্যসাহিত্য পাশ্চাত্য প্রবণতার অভিনব সাজে সজ্জিত ও অলংকৃত হয় এবং 'আরবি ভাষাকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। আধুনিক যুগের পূর্বে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও সাংবাদিকতার কলা-কৌশল 'আরবি সাহিত্যে ছিল না। আধুনিক যুগ এ সকল কলা-কৌশলের 'আরবি ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করে। 'আরবগণ ফরাসি, ইংরেজি ও গ্রিক ভাষা হতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনেক উপরকণ নিজেদের ভাষায় সংযোজন করে। নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্দীপনার সাথে 'আরবদের সাহিত্য উপাদান হিসেবে গুরুত্ব পায়।

এ সময় 'আরব জাতীয়তা ও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার নিদর্শনাবলি 'আরবি সাহিত্যের সবক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করে। শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন একজন বাস্তববাদী লেখক। মুহাম্মদ 'আব্দুহ সাহিত্যকে ইসলামের রংয়ে রঞ্জিত করেন। 'আবদুহ্ তাঁর সাহিত্যে মিশরীয় সামাজিক জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তাঁর রচনায় আধুনিকতার ছাপ লক্ষণীয়। তিনি ধ্যান-ধারনার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নতুনত্বের প্রয়াসী বলে প্রমাণিত হয়েছেন। সমাজের বহুমুখী ও বিচিত্রধর্মী সর্ম্পকের রূপ বিশেষভাবে ও বিশদররূপে তিনি তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত করেন। তাঁর লেখায় মিশরীয় সমাজের বাস্তব রূপ ফুটে উঠে যা বাঙালী সমাজের কোনো কোনো চিত্রের সাথে তুলনীয়।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তৎকালীন মিশরের সামাজিক অবস্থা তুলে ধরার পাশাপাশি মিশরের পারিপার্শ্বিক চিত্র বস্তুনিষ্ঠভাবে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তাঁর লেখনীতে মিশরের রাজনৈতিক জীবন থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। ধর্ম ও রাজনীতির বিকাশ সমাজ-সংস্কৃতিতে কী প্রভাব ফেলে এবং ভবিষ্যতে কী

ধরনরে সুদূর প্রসারী ফলাফল বয়ে আনতে পারে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ তাঁর সাহিত্যে এ বিষয়গুলি তুলে ধরার প্রয়াস পান। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত সমাজে নারীরা তাদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ ক্ষেত্রে সমাজে নারীদের অবস্থান এবং মুসলিম নারী অধিকারের যে আওয়াজ তাঁর লেখনীতে উচ্চারিত হয়েছে আধুনিক 'আরবি সাহিত্যে তা ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। তাঁর লেখনীতে বহু নারীর কণ্ঠস্বরকে তিনি তাঁর কলমের সাহায্যে তুলে ধরেন। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি কার্যকারী ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হন। তাঁই সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন একজন সার্থক সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি শুধু গ্রন্থই রচনা করেননি বরং বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতাসমৃদ্ধ প্রবন্ধও পাঠকের নিকট তুলে ধরেন। সমাজের সাধারণ শ্রেণি, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও শোষিতদের নিয়েই তাঁর লেখনী। সাধারণত সমাজের সকল মানুষের অনুভূতি, নৈতিক মান, উত্থান-পতন ইত্যাদি বাস্তব ও সার্থকভাবে তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে; যা তাঁর দক্ষ হাতের নিখুঁত শিল্পে সাহিত্যে উপস্থাপিত হয়েছে। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর সাহিত্যে যে জীবনবোধ ফুটে উঠেছে তা বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন। 'আবদুহ্ ইউরোপীয় সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মিশরসহ সমগ্র 'আরববাসীকে তা পাঠ করতে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর মতে, উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করতে হলে মুসলিম জাতিকে মানব সভ্যতার ইতিহাস ও তাঁর ক্রমবিকাশের ধারা বিস্তারিত জানতে হবে। 'আবদুহ্ এর দৃষ্টিতে, মুসলমানদের নিজ সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সভ্যতা ও ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুধাবন করতে হলে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা ও শিল্প-সাহিত্য জানা প্রয়োজন। 'আবদুহ্ এর সাথে 'আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তথাপি তিনি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা ও শিল্প-সাহিত্য জানা ও শেখার প্রয়োজনীয়তা আনুভব করতেন। কেননা ভাষা ও সংস্কৃতি একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত। মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর পর্যবেক্ষণে সংস্কৃতি হলো, জনসাধারণের জীবনাচার ও চিন্তাধারার সে পদ্ধতিসমূহ যা দ্বারা ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ও সমাজের অবকাঠামো গড়ে উঠে। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতা ও ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে পুনঃ সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ইসলাম ও আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতির ইতিবাচক বন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

'আরবি গদ্যরীতির নবরূপায়নে মুহাম্মদ 'আবদুহ্ এর অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আধুনিক 'আরবি গদ্যসাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারে তাঁর রচনা শিল্প সমর্থিত এবং নতুন নতুন চিন্তা ভাবনায় অবহিত। ভাষার প্রাঞ্জলতা ছাড়াও তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সাথে

সমাজ জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেসব বিষয়ই প্রাণবন্ত করে তাঁর লেখনীতে উপস্থাপন করেন। আধুনিক 'আরবি সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় তাঁর দক্ষ হস্তে 'আরবি সাহিত্য নিঃসন্দেহে আরও এক ধাপ উন্নতি লাভ করে।

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ছিলেন আধুনিক যুগে মুসলিম জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষাব্রতী, আইনজ্ঞ ও মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন সার্থক সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি সাহিত্যকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর রচনাবলি ও চিন্তাধারা মিশরসহ গোটা মুসলিম বিশ্বকে জাগরণ, মুক্তি ও উন্নয়নের পথ দেখাতে শুরু করেছিল। পশ্চিমা শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞানকে ইউরোপের সম্পদ ও শক্তির মাপকাঠি মনে করে তিনি মিশরসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। ফলে এ মহান পণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক মিশরীয় জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে এখনও অমর হয়ে আছেন। এজন্যই তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার লর্ড ক্রোমার তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, 'আবদুহ্ এর দেশপ্রেম ছিল সন্দেহের উর্ধ্বে। তাঁর চিন্তা-দর্শন আধুনিক মুসলিম বিশ্বেও তাঁকে একজন প্রগতিশীল মানুষ, প্রকৃত দেশপ্রেমিক, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং প্রথাবিরোধী ও যুক্তিবাদের মহান প্রবর্তক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

‘আরবি, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও ফারসি গ্রন্থাবলি

আল-কোরআন আল-কারীম		
অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	:	*আধুনিক মুসলিম বিশ্ব* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, আগস্ট ২০১০ খ্রি.)
অমলেন্দু দে	:	*বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*(কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭ খ্রি.)
আইজাক আসিমভ	:	মিশরের ইতিহাস, অনুবাদ, দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন (ঢাকা: ২০১৬ খ্রি.)
আ.ত.ম মুসলেহ উদ্দীন	:	আরবি সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৯ খৃ.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ
আমিনুল ইসলাম	;	*মুসলিম দর্শন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ খ্রি.)
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল-বুখারী	:	*সহিহ্ আল-বুখারী* (বৈরূত: দারু ইবন কাসির, ১৯৮৭ খ্রি.)
আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ	:	*মুসলিম শরীফ*, সম্পাদনা ও অনুবাদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০১০ খ্রি.)
আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আল-তিরমিযি	:	*তিরমিযি* (বৈরূত: দার আল-এহ্ইয়ায়ি আল-তুরাস আল-‘আরাবি, ১৯৫৪ খ্রি.)
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ আল-কাযবীনী ইবন মাজাহ	:	*ইবনে মাজাহ* (বৈরূত : দার আল-ফিক্‌র, ১৯৯৩ খ্রি.)
আবি আবদিল্লাহ ইবন আল-হাকিম	:	*আল-মুসতাদরাক* (বৈরূত: দার-আল-কুতুব আল-‘ইলমিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.)
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল-বুখারী	:	*আল-আদাব আল-মুফরাদ*, অনুবাদ: আবদুলালাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.)

আব্দুর রহমান আল-জাবরাতি	:	‘আজায়িব আল-আসার (কায়রো: তা.বি.)
আব্বাস মাহমুদ আল ‘আক্কাদ	:	‘আবক্বারি আল ইসলাহ্ ওয়া আল তা‘লিম আল-ইমাম মুহাম্মদ ‘আবদুহ্ (কায়রো: দারু মিসর আল-তিবাত, ১৯৬০)
আবদুল হক দিহলভী	:	*আল মুকাদ্দামাতু লি মিশকাত আল-মাসাবীহ্* (ইন্ডিয়া: দিল্লি, রাশিদিয়া কুতুবখানা, তা.বি.
আহমাদ ইবন আল-হুসাইন বায়হাকি	:	*সুনানে বায়হাকি* (মাক্কা মুকাররমা: মাকবাতু দার আল-বায, ১৯৯৪ খ্রি.)
আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল	:	*মুসনাদে আহমদ* (কায়রো: দার আল-হাদিস, ১৯৯৫ খ্রি.)
আহমাদ আমিন	:	*যু‘আমা আল- ইসলাহ ফি আল-‘আছরিল হাদিছ*, দার আল-কিতাব আল-‘আরাবি (বৈরুত: ১৯৪৮ খ্রি.)
আহমদ হাফেজ ‘আওজ	:	ফাতহু মিশর আল-হাদীস, আও নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফী মিশর (কায়রো: ১৯২৫ খ্রি.)
আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত	:	*তা’রীখ আল-আদাব আল-‘আরাবি* (বৈরুত: দার আল-মা‘রিফাহ, ১৯৯৫ খ্রি.)
ইমাম আহমদ	:	*আবু দাউদ*
ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত)	:	*মধ্যপ্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.)
ইসমা‘ঈল সাবরী	:	*দীওয়ান*, সম্পাদনা আয-যায়ন, (কায়রো: লাজনাতুত তালীফ, ১৯৩৮ খ্রি./১৩৫৭ হি.)।
‘উমার আল-দাসূকী	:	*ফি আল-আদাব আল-হাদিস* (কায়রো: দার আল-ফিকর, ৮ম সংস্করণ তা.বি.)
এম একাউসার	:	*মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক)* (ঢাকা: ২০১২ খ্রি., বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী)

ক্যারেন আর্মস্ট্রং (অনুবাদ: শওকত হোসেন)	:	*মৌলবাদের ইতিহাস* (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.)
জন এল, এসপাসিতো (অনুবাদ: শওকত হোসেন)	:	*দ্য ইসলামিক থ্রেট মিথ অর রিয়েলিটি?* (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.)
জহর সেন	:	*দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস* (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৬ খ্রি.)
জুরযী যায়দান	:	*তারীখু আদাব আল-লুগাত আল-'আরাবিয়্যাহ* (মিশর: দার আল-হিলাল, ১৯৯৩ খ্রি.)
ড. আব্দুল হামীদ সিন্দ আল-জুন্দী	:	*হাফিয ইব্রাহীম শা'ইরুন নীল* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৮ খ্রি.)
ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসাইন	:	*আল-আদাব আল-হাদিছ* (রিয়াদ: ১৯৯৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড
ড. শাওকী দায়ফ	:	*ফি আল-নাকদ আল-আদাবি* (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬২ খ্রি.)
ড. সাইয়্যিদ হামীদ আল-নাসসাজ ও সহযোগীবৃন্দ	:	*আল-আদাব আল-'আরাবি আল-হাদিস* (মিশর: ওযারাত আল-তারবিয়্যাহ্ ওয়া আল-তা'লীম, ১৯৯৭ খ্রি.)
ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল	:	*ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন* (ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮১ খ্রি.)
ড. ত্বাহা হোসাইন	:	*আল-আয়্যাম* (মিশর: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৪ খ্রি.)
ত্বাহির আল ত্বানাহী	:	*মুযাক্কারাতু আল-ইমাম মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: দার আল-হিলাল, ১৯৯৩ খ্রি.)
মুহাম্মদ 'আবদুহ্	:	*আল-ইসলাম ওয়া-আল-নাসরানিয়্যাহ্ মা'আল 'ইলম ওয়া আল- মাদানিয়্যাহ্* (বৈরূত: ১৯৮৩ খ্রি.)
মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ও মুহাম্মদ রাশিদরিদা	:	*তাফসির আল-কোরআন আল-হাকিম* (মিশর: দার আল-মানার, ১৩৬৬ হি.)

মুহাম্মদ 'আবদুহ্ (মুহাম্মদ 'ইমারাহ সম্পাদিত)	:	*আল-'আমাল আল-কামিলাহ্ লি আল-ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো: দার-আল-সুরক্, ১৯৯৩ খ্রি.)
মুহাম্মদ 'আবদুহ্	:	*রিসালাতুত তাওহীদ* (বৈরূত: দার-আল-সুরক্ব, ১৪১৪ হি.)
মুহাম্মদ 'আবদুহ্	:	*শারহু নাহজ আল-বালাগাহ্* (বৈরূত: দার-আল-সুরক, ১৮৮৭ খ্রি.)
মুহাম্মদ 'আবদুহ ('আরবি অনু.), মূল: জামাল উদ্দীন আফগানী	:	*রিসালাতুর রদ্দি আলাদ্-দাহরইন* (বৈরূত: দার আল-মা'আরিফ আল-হুকমিয়্যা, ১৪৩৮ হি.)
মুহাম্মদ ইউসুফ কাওকান	:	*'আলাম আল-নাছ্র ওয়া আল- শি'র ফি আল-'আছর আল-'আরাবি আল-হাদিস* (মাদ্রাজ: দার-আল-হাফিজা, ১৪৯৪ হি./ ১৯৮৪ খ্রি.)
মুহাম্মদ 'আবদুহ্ (রাশিদ রিদা সম্পাদিত)	:	তাফসির আল-মানার (কায়রো: ১৯৬০ খ্রি.)
মুহাম্মদ রাশিদ রিদা	:	আল-তাজদিদ ওয়া আল-তাজাদ্দুদ ওয়াআল-মুজাদ্দিদুন (মিশর: আল-মানার, ১৯৩১)
মুহাম্মদ রাশিদ রিদা	:	*তারীখ আল-উসতায আল- ইমাম আল-শাইখ মুহাম্মদ 'আবদুহ্* (কায়রো : ১৯৩১ খ্রি.)
মুহাম্মদ রাশিদ রিদা	:	*তাফসির আল-কোরআন আল-হাকিম* (মিশর : দার আল-মানার, ১৩৬৬ হি.)
মোহাম্মদ গোলাম রসুল	:	*মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.)
মোহাম্মদ সা'দাত আলী	:	*জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমান* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮ খ্রি.)
মুসা আনসারী	:	*আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮ খ্রি.)
শাকিব আরসালান	:	*হাদির আল-'আলাম আল-ইসলামী*, ১ম খণ্ড, (কায়রো: ১৯৬৩ হি.)

হাফিজ ইব্রাহীম	:	*দিওয়ানু হাফিজ ইব্রাহীম* (কায়রো: দার আল-কুতুব আল-মিশরীয়্যাহ্, ১৯৩৭ খ্রি.)
হুসাইন ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবুল ফযল	:	*মাকামাতু বাদিউয যামান আল-হামযানী* (বৈরূত : দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৪২৬ হি.)
হান্না আল-ফাখূরী	:	*তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরূত: ১৯৯১খ্রি.)
হান্না আল-ফাখূরী	:	*আল-জা'মি ফী তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবি আল-হাদিছ*, (বৈরূত: দার আল-জীল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.)
হারুনুর রশীদ	:	রাজনীতিকোষ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি.)
শাইখুল হাদীস মাওলনা তফাজ্জল হোছাইন (ড. হোছাইন মুজতবা এ এইচ এম. সম্পাদিত)	:	*হযরত মুহাম্মদ (সা.): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* (ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.)
Ahmed Sufia	:	*Muslim Community in Bengal 1884-1912* (Dacca: Dacca University, 1974)
Allen Roger	:	Writings of Members of the Nazh Circle, *Journal of the America Research centre in Egypt*, Issue-8, Year-1970
Amin, Osman	:	*Muhammad Abduh* (Washington DC: American Council of Learned Societies, 1953)
Aasia Yusuf	:	*"Islam and Modrnity: Remembering the Contributions of Muhammad Abduh (1849-1905)"* Islam and Civilizational Renewal, vol. 3. No.2

Aasia Yusuf	:	Muhammad Abduh, laws should change in Accordance with the conditions of Nations, quoted in charleskurzman, ed. Modernist Islam: 1840-1940, Oxford University press, 2002
Aswita Taizir	:	*Muhammad Abduh and the Reformation of Islamic law* (Canada: 1994)
Charles C. Adams	:	*Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muhammad 'Abduh* (London: Oxford University Press, 1933)
Cromer Lord	:	*Modern Egypt*, Volume II (London: Macmillan and Co. Ltd, 1908)
Eliezer Tauber	:	*The Emergence of the Arab Movements* (London: Frank Cass and Co. Ltd. 1993)
Elshakry, Marwa	:	*Reading Darwin in Arabic, 1860-1950* (The University of Chicago press, Chicago: USA, 1st published 2013)
Ervand Abrahamian	:	*Iran between two Revolutions* (Princeton: princeton University press, 1982)
Gates, Jean Key	:	*Introduction to Librarianship* (University of California: Mc Graw-Hill,1976)

Gibb, H.A.R.	:	Bulletin of the School of oriental Studies, (London: 1952), vol. iv, p. 758, Studies on the civilization of Islam. Princeton: princeton University press.)
Gilchrist, R. N	:	*Principles of political Science*(Madras: Orient Longmans, 1962)
Haddad, Yvonne Y.	:	Pioneers of Islamic Revival. Edited by ‘Ali Rahnema, Muhammad ‘Abduh: pioneer of Islamic Reform (London : Zed, 1994)
Hans Kohan	:	*Nationalism: Its meaning and History* (Toronto: D. Van Nostrand co. INC, 1955)
Hafiz Habibur Rahman	:	*Political Science and Government*(Dacca: Ideal publication, 1967)
Hourani, Albert	:	Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age* (Great Britain: Oxford University Press, 1962)
Jamal Mohammad Ahad	:	*The intellectual origin of Egyptian nationalism*(London: 1966)
Joel car Michael	:	*The Shaping of the Arabs: Study in Ethnic Identity* (London: Allen & Unwin,1967)

Khoury, Nabil Abdo	:	*Islam and Modernization in the Middle East: Muhammad Abduh, An Ideology of Development* (ph.D.Thesis, State University of New York, Albany: 1976)
Kurzman, Charles(ed.)	:	*Modernist Islam, 1840-1940: A source book* (Oxford : Oxford University Press, 2002 AD
Keddie, N	:	An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani (Berkeley: University of California Press,1983
Kedourie, Elie	:	*Afghani and 'Abduh: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam* (London: Frank Cass, 1997)
Laski, Harold Joseph	:	*A Grammar of Politics (London*: George Allen and Unwin Ltd. 1967)
Leslie Lipson	:	*The Great issues of Politics* (NewYork: Prentice Hall INC. 1954)
Leila Ahmed	:	*Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (London: 1992)

MacIver, R. M	:	*Modern State* (London: Oxford University press, 1966)
Mahdi Ismat	:	*Modern Arabic Literature,* (Hyderabad: Rabi publishers,1983 AD)
Mark Sedwick	:	*Muhammad 'Abduh* (oxford: one world, 2010)
Matthee, R.	:	'Jamal al-Din al-Afghani and the Egyptian National Debate' in: International Journal of Middle East Studies, vol. 21, 1989
Moosa, Matti	:	*The Origins of Modern Arabic Fiction* (London: Lynne Rienner publishers, 2nd edition, 1997)
Muhammad Abduh	:	Translated by Ishaq Musaad and Kenneth Cragg, George Allen and Unwin, *The theology Unity* (London: 1966)
Muhammad al-Haddad	:	Muhammad Abduh: Qira'a Jadida fi khitab all-Islah al-Dini (Beirut: Dar al-Tali'ahlil -Tiba'ahwa-al Nash, 2003)
Nasr Abu Zayd	:	*Reformation of Islamic thought*, Amsterdam University press, Amsterdam: 2006
Nikki R. Keddie	:	*Sayyid Jamal ad-Din al-afgani: A political Biography* (Berkeley: University of California press, 1972)

Oliver Scharbrodt	:	*Islam and the Baha'i Faith: A comparative study of Muhammad 'Abduh and 'Abdul Baha 'Abbas* (London: Routledge, 2007)
P.K. Hitti	:	History of the Arabs (London: 1970), 10th Edition
PJ Vatikitis	:	The History of Egypt (London: 1980), 2nd Edition.
P.J. Vatikiotis	:	*The History of Egypt* (Great Britain : The Johns Hopking University Press, 1980), 2nd edition
Richard W. Cottam	:	*Nationalism in Iran* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1967)
Sanyal Usha	:	*Deoband Islam and politics in British India* (Bombay: Oxford University press, 1996)
Sharif M. M.	:	*A History of Muslim Philosophy*, ed., vol II, rep (Delhi: Low Price Publications, 1995)
Taha Hussein	:	*The Days: His Autobiography in Three parts*, American University in Cairo Press, 1997
Vali Nasr	:	*The Sunni Revival: How Conflicts within Islam will shape the future* (New York: Norton, 2006)

Voll, John Obert	:	*Islam: Continuity and Change the Modern World* (Boulder, Co: West View Press, 1982)
Wilfrid Scawen Blunt	:	*Secret History of the English Occupation of Egypt* (London: Unwin, 1907)

পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, প্রবন্ধ ও সাময়িকী

আল-ওক্বায়ি'উ আল-মিশরিয়্যাহ্	:	কায়রো: ২৮ নভেম্বর, ১৮৮১ খ্রি.
আল 'উরওয়াতু আল-উসকা মুহাম্মদ 'আবদুহ্ ও জামালউদ্দীন আফগানী সম্পাদিত	:	কায়রো: দার আল-'আরাব, ১৯৯৩ খ্রি.
মাসিক মোহাম্মদী	:	অধ্যাপক মুহ: মনসুর উদ্দিন, জামাল উদ্দীন আফগানী, ৩৯ বর্ষ ১৩ ও ১৪ সংখ্যা কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ বাংলা।
Al-Ahram Editor, Abduh	:	1880, Livingston, John W., 1995. "Muhammad Abduh on science, The Muslim world, vol. 1xxxv, p. 3-4, July oct.
Livingston, John W., 1995	:	Muhammad 'Abduh on Science, The Muslim world, vol. 1xxxv, p. 3-4, July-October

অভিধান, বিশ্বকোষ ও অন্যান্য

ইবরাহীম মাদকূর	:	আল-মুজামূল ওয়াসীত (দিলি- : কুতুবখানা হোসাইনিয়া, দেওবন্দ, তা.বি.)
ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান	:	*আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.)।

মালুফ লুওয়াইস	:	*আল-মুনজিদ ফি আল-লুগাহ ওয়া আল-আ'লাম* (বৈরূত: আল-কাছুলিকিয়্যা, ২০০৯ খ্রি.)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	:	*ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.) ৩য় খণ্ড।
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	:	*ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	:	*ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি.) ৫ম খণ্ড।
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	:	*ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), ১১শ খণ্ড।
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	:	*ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.) ১৫শ খণ্ড।
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	:	*ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি.) ১৬শ খণ্ড।
বাংলা বিশ্বকোষ	:	১ম সংস্করণ (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৭৬ খ্রি.), খ.৪
Encyclopedia of Britannica	:	VII, 85.
E. J. Brill's	:	*First Encyclopedia of Islam,* Volume VI, Leiden: The Netherland, 1987
Hafiz Ibrahim	:	*Encyclopaedia of Islam,* new edition, vol. iii

Website

dig-eg-gaz.github.io/post/will-abduh/		
https://www.goodreads.com/quotes/859297-i-went-to-the-west and-saw-islam-but-no		
Al-Ahram Weeklyonline.11 May 1881. Web 14 Aug. 2008. <http://weekly.ahram.org.eg12001/529/bo1.html>		
Jamal Al-din al-Afgani, Jewish Virtual Library, www.jewishvirtuallibrary.org/jamal-al-din-al-afgani		
Abduh, al-Shaykh Mohammad	:	*Al-Kuttab al-'Ilmiyyah wa Ghayruha* [scientific Books and others] Al-Ahram. Al-Ahram Weeklyonline.11 May 1881. Web 14 Aug. 2008. <http://weekly.ahram.org.eg12001/529/bo1.htm>
Elam Harder	:	Muhammad 'Abduh (1849-1905)' Centre for Islamic Sciences, Canada, Accussed online on 23 May 2016; http://www. cis-ca.org/voices/a/abduh.htm.

- :: -